উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই 12B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, ২০২০)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল- 'কোর কোর্স', 'ইলেকটিভ কোর্স', 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স' 'স্কিল এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স' 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স' এবং 'ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম পস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি

উপাচার্য

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

চতুর্বার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম

(Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) &

Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম (NBG)

কোর্স: বাংলা স্নাতক পাঠক্রম (মেজর কোর্স)

কোর্সের শিরোনাম: বাংলা ভাষার ইতিহাস ও ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয়

কোর্স কোড: 5CC-BG-02

প্রথম মুদ্রণ : মার্চ, 2025

বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the University Grants Commission-Distance Education Bureau

F:\Avik\Netaji\2025 New\5CC-BG-02 (CC-BG-02) E-Copy 5CC-BT-02 22.03.25

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
চতুর্বার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম

(Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম (NBG)

কোর্স: বাংলা স্নাতক পাঠক্রম (মেজর কোর্স)

কোর্সের শিরোনাম: বাংলা ভাষার ইতিহাস ও ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয়

কোর্স কোড: **5CC-BG-02**

মডিউল : ১,২,৩,৪

Module : 1,2,3,4

কোর্স বাংলা স্নাতক পাঠক্রম (মেজর)	কোর্স লেখক **Course Writer**	কোর্স সম্পাদনা **Course Editor**
মডিউল : ১ Module : 1	**ড. অনামিকা দাস** সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	**অধ্যাপক দিলীপকুমার নাহা** অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ বারাসাত গভর্ণমেন্ট কলেজ
মডিউল : ২ Module : 2		
মডিউল : ৩ Module : 3	**গীতশ্রী সরকার** সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	
মডিউল : ৪ Module : 4		

ফরম্যাট এডিটিং: গীতশ্রী সরকার, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক-বাংলা বিষয় সমিতি

ড. শক্তিনাথ ঝা, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ কলেজ, মুর্শিদাবাদ

ড. নীহারকান্তি মণ্ডল, সহযোগী অধ্যাপক, মুরলীধর গার্লস কলেজ, কলিকাতা

ড. চিত্রিতা ব্যানার্জি, সহযোগী অধ্যাপিকা, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ, কলিকাতা

আব্দুল কাফি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ড. অনামিকা দাস, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

F:\Avik\Netaji\2025 New\5CC-BG-02 (CC-BG-02) E-Copy 5CC-BT-02 22.03.25

আমন্ত্রিত সদস্য

ড. প্রাপ্তি চক্রবর্তী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
সায়নদীপ ব্যানার্জী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গীতশ্রী সরকার, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ উপকরণের সমুদায় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যাতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনো রকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

অন্যন্যা মিত্র
নিবন্ধক (অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত)

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক বাংলা পাঠক্রম (NBG)

বাংলা ভাষার ইতিহাস ও ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয়

কোর কোর্স : 5CC-BG-02

মডিউল: ১,২,৩,৪ Module: 1,2,3,4

মডিউল: ১ ভারতীয় আর্যভাষা ও বাংলা ভাষার উদ্ভব

একক ১	ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন (ক)	9
একক ২	ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন (খ)	24
একক ৩	নব্য ভারতীয় আর্যভাষা	35
একক ৪	বাংলা ভাষার উদ্ভব	51

মডিউল: ২ প্রাচীন বাংলা ভাষা

একক ৫	বাংলা ভাষার বিবর্তন	57
একক ৬	প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষা (ক)	63
একক ৭	প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষা (খ)	68

মডিউল: ৩ মধ্য ও আধুনিক বাংলা ভাষা

একক ৮	মধ্যযুগের বাংলা ভাষা (ক)	77
একক ৯	মধ্যযুগের বাংলা ভাষা (খ)	83
একক ১০	আধুনিক বাংলা ভাষা: প্রথম পর্ব	90
একক ১১	আধুনিক বাংলা ভাষা: দ্বিতীয় পর্ব	90

মডিউল: ৪ বাংলা ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয়

একক ১২	বাংলা উপভাষা	105
একক ১৩	বাংলা উপভাষার পরিচয় (ক)	118
একক ১৪	বাংলা উপভাষার পরিচয় (খ)	124
একক ১৫	বাংলা উপভাষার পরিচয় (গ)	129
একক ১৬	সাধু ও চলিত ভাষা	133
একক ১৭ ও ১৮	বাংলা শব্দভাণ্ডার	139

মডিউল : ১

ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন (ক), ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন (খ), নব্য ভারতীয় আর্যভাষা, বাংলা ভাষার উদ্ভব

একক ১ ❑ ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন (ক)

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ ভাষার উৎপত্তি

১.৪ পৃথিবীর ভাষাবংশ

১.৫ ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব ও যুগবিভাগ

১.৬ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা

১.৭ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্য

১.৮ বৈদিক ও সংস্কৃত-র তুলনা

১.৯ সারসংক্ষেপ

১.১০ অনুশীলনী

১.১ উদ্দেশ্য

সমগ্র পৃথিবী জুড়ে মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করছে। ভাষা মানব সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি। ভাষা আমাদের প্রকাশ মাধ্যম, সংযোগ মাধ্যম। ধ্বনি-বর্ণ-শব্দ-বাক্য জুড়েই তৈরি হয় বাচন। পৃথিবীর বিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন ভাষার জন্ম হয়েছে। একদিকে যেমন বহু ভাষার জন্ম হচ্ছে তেমনই প্রতিনিয়ত বেশ কিছু ভাষার মৃত্যু ঘটছে। ব্যবহারের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে একের পর এক ভাষা। স্বভাবতই আমাদের প্রশ্ন জাগে এই ভাষার জন্ম হল কোথা থেকে। ভাষা সদাই চলমান, পরিবর্তনশীল একটি উপাদান। আমরা এই এককে ভাষার পরিবর্তন বা বিবর্তনের ধারার স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করব।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাবংশের জন্ম, তাদের প্রসার, বৈশিষ্ট্য, বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের আওতাধীন। এই একক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাবংশের জন্ম, প্রাপ্তিস্থান, ঐতিহাসিক নিদর্শন, বিভিন্ন ভাষাবংশের অন্তর্গত ভাষার বৈশিষ্ট্য এবং বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

এই এককটি পাঠ করলে ভারতীয় আর্যভাষা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানলাভ করতে পারবে। পৃথিবীর ভাষাবংশগুলির নাম, তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব কীভাবে হল এবং সেই সূত্রে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিবিধ বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে।

১.২ প্রস্তাবনা

আলোচ্য পাঠক্রমে 'ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন' বিষয়ে আলোচনার জন্য মোট দুটি একক নির্ধারিত। এই প্রথম এককে আমরা মূলত প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। প্রসঙ্গত এসেছে পৃথিবীর মোট বারোটি ভাষাবংশ, ভারতীয় আর্যভাষার কালভিত্তিক যুগবিভাজন। আলোচনার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব উদাহরণ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিকদের পারস্পরিক মতবিরোধের দিকগুলিও উঠে এসেছে। সারণি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথম বন্ধনীতে সেই সারণিটির উৎস চিহ্নিত করা আছে।

আমরা বর্তমান এককে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের ধারায় ভাষার উৎপত্তি এবং বারোটি প্রধান ভাষাবংশ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই ভাষাবংশগুলির উৎপত্তিস্থল, প্রসার, প্রধান ভাষা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ পেয়েছে এই এককে। ভারতীয় আর্যভাষার বিস্তার আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সময়কাল, সাহিত্যিক নির্দশন, ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, অন্বয়তাত্ত্বিক) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পাণিনির হাত ধরে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ তৈরি হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের মধ্যদেশের (দিল্লি, মিরাট, মথুরা অঞ্চলের ভাষারীতি) শিক্ষিত মানুষের মুখের ভাষা এবং উদীচ্যের (উত্তর-পশ্চিম ভারত) কিছু উপাদানের মিশ্রণে ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত তৈরি হয়। প্রাচীন আর্যভাষার পরবর্তী পর্যায়ে ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতির প্রচলন হয়। বৈদিক সংস্কৃত এবং ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য সম্পর্কিত আলোচনাও প্রকাশ পেয়েছে এই অংশে। এই একক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা সম্পর্কে বোধ তৈরি হবে।

১.৩ ভাষার উৎপত্তি

মানুষ অহরহ কথা বলে চলেছে। কিন্তু আমরা কি ভাবার চেষ্টা করেছি যে এই ভাষার জন্ম কোথা থেকে? কবে থেকে মানুষ ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করল? মানুষ প্রত্যহ, অবিরত বিভিন্ন ধ্বনি উচ্চারণ করে চলেছে। বিভিন্ন ধ্বনি জুড়ে শব্দ, শব্দ জুড়ে বাক্য, আর এই বাক্য জুড়েই তৈরি হয় বাচন। মানব সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় যেমন সমাজ, অর্থনীতি, শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে; তেমনই নানা স্তর বদলের মধ্যে দিয়ে আজকের ভাষার জন্ম হয়েছে। বিভিন্ন ভাষাবংশ, তার শাখা-প্রশাখা থেকে ধীরে ধীরে আজকের আধুনিক মানুষ ব্যবহৃত বিভিন্ন ভাষার উদ্ভব ঘটেছে।

এখন প্রশ্ন, ভাষা বলতে আমরা কী বুঝি? ভাষা কি কেবল ধ্বনি, বর্ণ, শব্দের সমাহার? একথা ঠিকই—ধ্বনি, শব্দ, বাক্য এগুলো সবই ভাষার প্রকাশ মাধ্যম বা মূর্ত ধারণা। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে ভাষা যোগাযোগের মাধ্যম এবং এই ভাষাই মানুষকে সমগ্র প্রাণীজগৎ থেকে আলাদা করে রেখেছে। তাই বলাই যায় ধ্বনি, শব্দ, বাক্যের সম্মিলিত রূপই একমাত্র প্রকাশ মাধ্যম নয়। এর পাশাপাশি বিভিন্ন

অঙ্গভঙ্গি (হাত নাড়া, ভুরু নাচানো, বিরক্তি প্রকাশ), ইঙ্গিত, ছবি এই সবই প্রকাশ মাধ্যম। এই আকার-ইঙ্গিত, মুখভঙ্গির মাধ্যমে এক ধরনের ভাব বিনিময় ঘটে কিন্তু তাকে আমরা ভাষা বলব না, একে বলা হয় প্রায় ভাষা বা para language। বাগযন্ত্রের মাধ্যমে উচ্চারিত অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টি হল ভাষা। প্রাচীন মানুষ যখন ধ্বনি বা শব্দের ব্যবহার জানত না তখনও আকার-ইঙ্গিতে, গুহাচিত্রের মাধ্যমে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করেছে। এই যোগাযোগ মাধ্যম বা কমিউনিকেশন মানুষের মধ্যে সংযোগ তৈরিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভাষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, স্বরূপ আলোচনার পূর্বে আমরা ভাষার ইতিহাস, তার বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

ভাষার জন্ম প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতামত প্রচলিত। বহু ধর্মগ্রন্থ ভাষার জন্মের সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্বকে মিলিয়ে পড়তে চেয়েছে। পরবর্তীতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবর্তনবাদের সাপেক্ষে ভাষার পরিবর্তনকে পড়তে চেয়েছেন একাংশ। আমরা এই অংশে ভাষাতত্ত্ব এবং বিজ্ঞানকে মিলিয়ে পড়ার চেষ্টা করব। একেই আমরা ভাষাবিজ্ঞান বলি। বহুবিধ মাত্রার ভিত্তিতে ভাষাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভাষাবিজ্ঞান আলোচনার বিভিন্ন ভাগগুলি যেমন—ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান, তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, সমাজভাষাবিজ্ঞান, মনোভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদি।

পৃথিবীতে যেমন অসংখ্য মানুষ, তেমনি তার ভাষাও অসংখ্য। বিভিন্ন ভাষার মধ্যে ধ্বনিগত বা রূপগত সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য, গঠনগত বা প্রকারগত ভিন্নতা, অঞ্চলভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে ভাষাকে অনেকগুলি শাখায় ভাগ করা হয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানীরা পাঁচ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে এই বিভাজন করেছেন। যেমন—

- প্ররূপতাত্ত্বিক (Typological)
- ঐতিহাসিক বা বংশানুগত (Historical)
- ভৌগোলিক (Geographical)
- জাতিগত (Racial)
- শব্দসংখ্যাতাত্ত্বিক (Lexico statistics)

বর্তমানে মূলত ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে বিভিন্ন ভাষাবংশ, তাদের বিভিন্ন শাখা-উপশাখা, তাদের প্রাপ্তিস্থান, প্রাচীন নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করব। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান এবং তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ধারায় পৃথিবীর ভাষাগুলিকে অনেকগুলি শ্রেণিতে ভাগ হয়েছে। একটি রূপতত্ত্বগত শ্রেণিবিভাগ, অন্যটি বংশানুগত শ্রেণিবিভাগ। আমরা বর্তমান আলোচনায় বংশানুগত শ্রেণিবিভাজন অনুসারে ভাষার উৎস, তাদের বিভাজনের ধারাটি বোঝার চেষ্টা করব। বংশানুগত শ্রেণি অনুসারে ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা, রাশিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাকে কতকগুলি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশের অন্তর্গত ইন্দো-ইরানীয় গোষ্ঠীর একটি অংশ ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। আবার এশিয়া অঞ্চলে ইন্দো-ইরানীয় ছাড়াও দ্রাবিড়, ভোট-চীনীয়, অস্ট্রো-এশিয়াটিক প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাবংশের অন্তর্গত ভাষার প্রাধান্যও লক্ষণীয়। যেমন ইউরোপে ব্যবহৃত ভাষার বেশিরভাগই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত। আমরা এই শ্রেণিবিভাজনগুলি সম্পর্কেই বিস্তারিত আলোচনা করব।

১.৪ পৃথিবীর ভাষাবংশ

পৃথিবীর প্রায় চার হাজার ভাষা কয়েকটি আদি উৎস থেকে জন্মলাভ করেছে। সেই আদি উৎসগুলিকে বলা হয় ভাষাবংশ। ভাষাতাত্ত্বিকরা মূলত বারোটি প্রধান ভাষাবংশের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল— (১) ইন্দো-ইউরোপীয়, (২) সেমীয়-হামীয়, (৩) বান্টু, (৪) ফিন্নো-উগ্রীয় বা উরালীয়, (৫) তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু বা আল্‌তাইক্‌, (৬) ককেশীয়, (৭) দ্রাবিড়, (৮) অস্ট্রিক, (৯) ভোট-চীনীয় বা চীনা-তিব্বতীয়, (১০) উত্তরপূর্ব সীমান্তীয় বা প্রাচীন এশীয়, (১১) এস্‌কিমো এবং (১২) আমেরিকার আদিম জনজাতির ভাষা।

(১) ইন্দো-ইউরোপীয়: পৃথিবীর ভাষাবংশের মধ্যে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষাবংশ। কারণ এই ভাষাবংশ থেকেই অনেক আধুনিক ভাষার জন্ম। এই বংশের আদি পীঠস্থান বিষয়ে নানা মত থাকলেও দুটি মত-ই প্রধান। কেউ বলেন, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষীদের আদি বাসস্থান ছিল মধ্য-ইউরোপ। অন্য মতে, দক্ষিণ রাশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশ। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী মূল আর্যজাতি পরবর্তীকালে প্রধানত ভারতবর্ষ ও ইউরোপের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং মূল আর্যভাষা বা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে দশটি প্রাচীন শাখার জন্ম হয়। সেগুলি হল— ইন্দো-ইরানীয়, বাল্টোস্লাভিক, আল্‌বানীয়, আর্মেনীয়, গ্রিক, ইটালিক, জার্মানিক বা টিউটনিক, কেলটিক, তোখারীয় এবং হিত্তীয়।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অন্তর্গত ভাষাগুলিকে প্রধানত দুটি শাখায় ভাগ করা যায়। যথা—সত্‌ম এবং কেন্তুম।

- সত্‌ম গোষ্ঠীর অন্তর্গত চারটি ভাষাগোষ্ঠী—ইন্দো-ইরানীয়, বাল্‌তো-স্লাবিক, আলবানীয়, আর্মেনীয়।
- কেন্তুম গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষাগুলি—গ্রিক, ইতালিক, কেলতিক, টিউটনিক/জার্মানিক, তোখারীয়, হিত্তীয়।
- সত্‌ম শাখার ভাষাগুলিতে পুরকণ্ঠ্যধ্বনি শিসধ্বনিতে পরিণত হয়। কেন্তুম শাখার অন্তর্গত ভাষায় পুরকণ্ঠ্যধ্বনি স্নিগ্ধতালব্য ধ্বনি বা কণ্ঠ্যধ্বনিতে পরিণত হয়।

(i) ইন্দো-ইরানীয়: এই শাখা দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে ইরানে ও ভারতবর্ষে প্রবেশ করে।

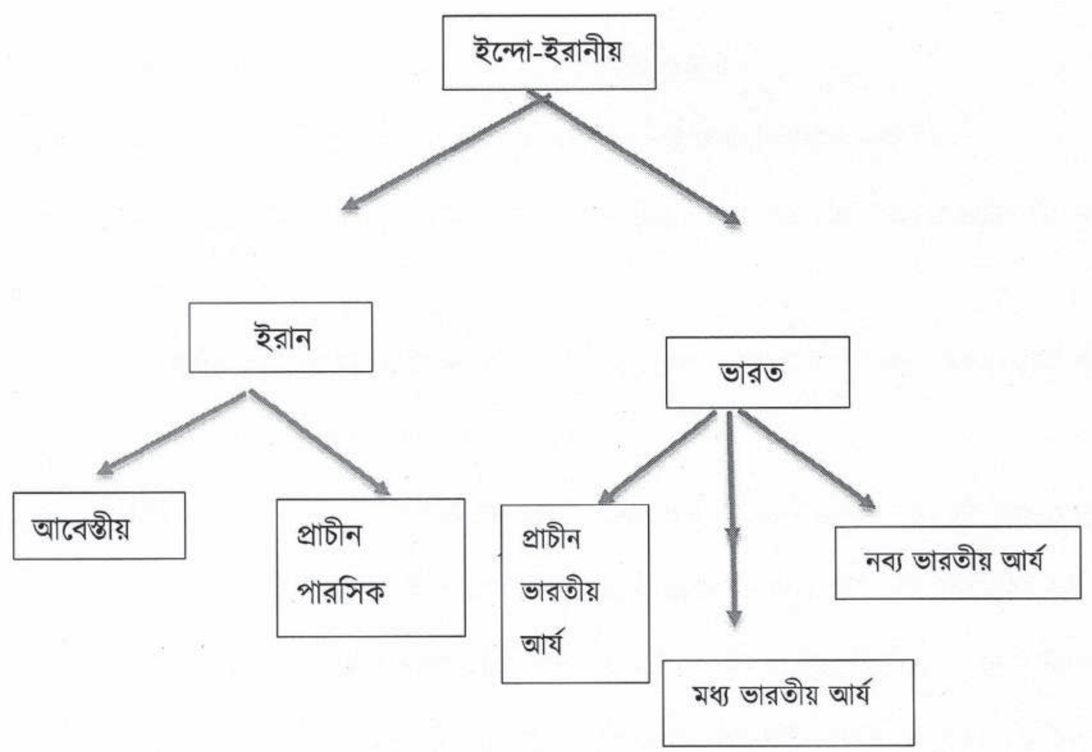

ক) আবেস্তীয় ভাষার নির্দশন: পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ 'জেন্দ-আবেস্তা'র ভাষা আবেস্তীয় ভাষার প্রাচীন নির্দশন। এই ভাষার নিদর্শন খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে প্রাপ্ত। অনেক ভাষাবিজ্ঞানী একে ইরানীয় আর্য নামেও অভিহিত করেছেন।

খ) প্রাচীন পারসিক ভাষার নির্দশন: মধ্যযুগের পহ্লবী থেকে আগত ফারসি, পশ্‌তো বেলুচি এই ভাষাগোষ্ঠীর নিদর্শন বহন করছে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এই ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই ভাষার প্রাচীন নিদর্শন দারায়ুশ-এর শিলালিপি। অনেক ভাষাবিজ্ঞানীরা একে দরদীয় আর্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ভারতে আগত ভাষাবংশের শাখা ও তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব।

(ii) বাল্‌তো-স্লাবিক: এই ভাষাগোষ্ঠীর দুটি শাখা বালতিক আর স্লাবিক।

বালতিক শাখার প্রধান ভাষা— লিথুয়ানিয়াম।

এই শাখার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক নিদর্শন— নবম শতাব্দীর বাইবেল।

স্লাবিক শাখার প্রধান ভাষা—রাশিয়ান, বুলগেরিয়ান প্রভৃতি।

(iii) আলবানীয়: অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব উপকূলে এই ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়।

আলবানীয় ভাষার নিদর্শন ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে পাওয়া যায়। এই ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন ষোড়শ শতাব্দীর বাইবেল।

(iv) আর্মেনীয়: এই ভাষার প্রাপ্তিস্থান এশিয়া মাইনর প্রদেশের আর্মেনিয়া অঞ্চল। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে এই ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়।

(v) গ্রিক: কেন্তুম শাখার প্রাচীন নিদর্শন গ্রিক গোষ্ঠীর ভাষা। ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই ভাষার প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে গ্রিস, এশিয়া মাইনরের প্রাচীন উপকূল, সাইপ্রাস দ্বীপ জুড়ে এই ভাষার ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়েছিল। ক্রীট দ্বীপে প্রাপ্ত প্রত্নলেখ এই ভাষার প্রাচীন নির্দশন। এছাড়া বিখ্যাত মহাকাব্য 'ইলিয়াড', 'ওডিসি'র ভাষা গ্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত একটি উপভাষার নির্দশন। এই উপভাষাটির নাম Aelo-lonic।

(vi) ইতালিক: প্রাচীন ইতালির লাতিউস প্রদেশের ভাষা লাতিন এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম প্রাচীন ভাষা। এছাড়াও ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ, পর্তুগিজ ইতালিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

এই ভাষার প্রাচীন নিদর্শন মেলে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে। প্রাচীন ইতালিক ভাষার তিনটি উপভাষা—ওস্কান, উম্ব্রিয়ান, লাতিন।

(vii) কেলতিক: এই ভাষা আয়ারল্যান্ড অঞ্চলে ব্যবহৃত হত।

এই ভাষাগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য একটি ভাষা—আইরিশ।

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রত্নলেখ এই ভাষার প্রাচীন নিদর্শন। ইতালিক এবং কেলতিক ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সাদৃশ্য সম্পর্কে অনেক পণ্ডিতই আলোচনা করেছেন।

(viii) তোখারীয়: চীনের তুর্কিস্তান অঞ্চলে এই ভাষা ব্যবহার লক্ষ করা যায়। আধুনিক ভাষায় এই শাখার কোন নিদর্শন পাওয়া না গেলেও সপ্তম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে রচিত পুথি ও প্রত্নলেখ ভাষাগোষ্ঠীর প্রাচীন নিদর্শন।

(ix) হিত্তীয়: এশিয়া মাইনরের কাপদোকিয়া প্রদেশে এই ভাষা-র নিদর্শন দেখতে পাওয়া গিয়েছে। বর্তমান ভাষায় হিত্তীয় শাখার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

খ্রিস্টপূর্ব বিংশ থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে এই ভাষার প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়। ভাষাবিজ্ঞানীদের একাংশের মতে এই ভাষার জন্ম ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে নয়, স্থানীয় কোনো ভাষাগোষ্ঠী থেকে।

(x) জার্মানিক : এই ভাষার তিনটি আঞ্চলিক রূপ দেখতে পাওয়া যায়। উত্তর জার্মানিক, পূর্ব জার্মানিক, পশ্চিম জার্মানিক।

- উত্তর জার্মানিক: প্রাপ্তিস্থান সুইডেন, আইসল্যান্ড। ভাষা সুইডিশ।
- পূর্ব জার্মানিক: আধুনিক ভাষায় কোন নিদর্শন নেই।
- পশ্চিম জার্মানিক: প্রাপ্তিস্থান ইংল্যান্ড, জার্মানি, হল্যান্ড। এই অঞ্চলে প্রাপ্তভাষা— ইংলিশ, জার্মান এবং ওলন্দাজ।

জার্মানি ভাষা পরিবর্তনে চারটি সূত্রের কথা জানতে পারা যায়। সেগুলি হল— গ্রীমের সূত্র, গ্রাসম্যানের সূত্র, ভার্নারের সূত্র, কেলিৎসের সূত্র।

(২) সেমীয়-হামীয়: এই ভাষাবংশের দুটি প্রধান শাখা— সেমীয় ও হামীয়। সেমীয় উপশাখার প্রাচীনতম নিদর্শন বাণমুখ লিপিতে-খোদাই-করা প্রত্নলেখে পাওয়া গেছে আনুমানিক খৃঃ পূর্ব ২৫০০ অব্দে। এই উপশাখার দুটি উল্লেখযোগ্য ভাষা হিব্রু ও আরবি। হামীয় শাখার একমাত্র ভাষা মিশরীয় এখন লুপ্ত। বর্তমানে মিশরেও আরবি ভাষা প্রচলিত।

(৩) বান্টু: মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার প্রায় সব ভাষাই বান্টু বংশের অন্তর্গত। যেমন— সোয়াহিলি, কাফির, জুল ইত্যাদি।

(৪) ফিন্নো-উগ্রীয়: এই ভাষাবংশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ফিনল্যান্ডের ভাষা ফিন্নীয় ও হাঙ্গেরীর ভাষা হাঙ্গেরীয়।

(৫) তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু: এই ভাষাবংশের মূলত তিনটি শাখা— তুর্ক-তাতার, মোঙ্গল ও মাঞ্চু। এই ভাষাবংশের প্রধান ভাষা হল তুর্ক শাখার অন্তর্গত তুরস্কের ভাষা তুর্কী ও ওস্‌মালি।

(৬) ককেশীয়: এই বংশের উল্লেখযোগ্য ভাষা হল জর্জিয়ার ভাষা জর্জীয়।

(৭) দ্রাবিড়: এই বংশের ভাষা মূলত দক্ষিণ ভারতেই প্রচলিত। মুখ্য ভাষাগুলি হল— তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম, কন্নড়, টুলু বা টুড়ু এবং ব্রাহুই।

(৮) অস্ট্রিক: এই ভাষাবংশে দুই শাখা—অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও অস্ট্রোনেশীয়। অস্ট্রো-এশিয়াটিক শাখার প্রধান ভাষা হল শবর, সাঁওতালি, খাসী, মুণ্ডারী, নিকোবরী। এগুলি আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা ইত্যাদি স্থানের প্রচলিত ভাষা। অস্ট্রোনেশীয় শাখার ভাষা মালয়, যবদ্বীপীয়-মালয় ও যবদ্বীপে প্রচলিত।

(৯) ভোট-চীনীয়: এই বংশের তিন শাখা: চীনীয়, থাই ও ভোট-বর্মী। চীনা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ভাষা। দ্বিতীয় শাখার ভাষা শ্যামী বা সিয়ামী। তৃতীয় শাখার ভাষা তিব্বতের ভাষা তিব্বতী, ব্রহ্মদেশের ভাষা বর্মী এবং ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে প্রচলিত বোড়ো, নাগা প্রভৃতি ভাষা।

(১০) উত্তরপূর্ব সীমান্তীয়: এই বংশের প্রধান ভাষা চুক্‌চী এশিয়ার উত্তরপূর্ব সীমান্তে প্রচলিত।

(১১) এস্‌কিমো: উত্তরমেরুর সীমান্ত দেশগুলোতে গ্রিনল্যান্ড থেকে আলেউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ অবধি ভূভাগে এস্‌কিমো বংশের ভাষা বলা হয়।

(১২) আমেরিকার আদিম জনজাতির ভাষা: আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের লুপ্তপ্রায় ভাষাগুলি আটটি প্রধান বংশে পড়ে— আল্‌গোঙ্কীয়ান, আথাবাস্‌কান্‌, ইরোকোয়ীয়ান, মুস্‌কোজীয়ান, সিওউয়ান্‌, পিমান্‌, শোশোনীয়ান্‌ এবং নাহুয়াট্‌লান্‌। একমাত্র নাহুয়াট্‌লান্‌ বংশের ভাষা আট্‌জেক কিছুটা সমৃদ্ধিলাভ করেছিল।

১.৫ ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব ও যুগবিভাগ

পৃথিবীর ভাষাবংশগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হল ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য ভাষাবংশ। 'আর্য' এখানে কোনো জাতি নয়— ভাষা। ম্যাক্সমূলার বলেছেন, "Aryan, in scientific language, is utterly inapplicable to race. It means language and nothing but language..." (Max Miiller, Friedrich : 'Collected Works', New Impression, 1898, Vol. X, p. 90.)

সুতরাং, ইন্দো-ইউরোপীয়দের আদিভাষা অর্থে 'আর্য' শব্দটি গ্রহণযোগ্য। বর্তমানে অবশ্য 'আর্য' শব্দের অর্থবিস্তারের ফলে 'আর্য' শব্দে জাতিকেও বোঝানো হয়। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী জাতির যে-একটি শাখা ভারত ও ইরানে চলে আসে, যাকে আমরা ইন্দো-ইরানীয় বলি, শুধু সেই শাখার লোকেরাই প্রথমে নিজেদের 'আর্য' বলে অভিহিত করতেন। পরে অর্থবিস্তার ঘটায়, সমগ্র ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের সব শাখার জাতিকেই 'আর্য' নামে অভিহিত করা হয়। সুকুমার সেনের মতে ইন্দো-ইরানীয় শাখার মানুষ নিজেদের 'অর্য' বা 'আর্য' বলে গর্ববোধ করত। অনেক ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে আর্য কথার অর্থ বিদেশি। আর্য কথার বুৎপত্তিগত অর্থ ঋ + ন্যৎ— আর্য, 'ঋ' অর্থাৎ গমন করা।

মূল ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্যভাষায় লিখিত কোনো গ্রন্থ বা প্রত্নলিপি পাওয়া যায়নি। তাই এই ভাষার আদিরূপ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। এই মূল ভাষা থেকে জাত প্রাচীন ভাষা বৈদিক সংস্কৃত, আবেস্তীয়, গ্রিক, ল্যাটিন ইত্যাদির তুলনামূলক আলোচনা করে মূল ভাষার একটি অনুমান-গঠিত রূপ তৈরি করা হয়েছে।

মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী আর্যজাতির একটি শাখা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। একেই আমরা বলি ভারতীয় আর্যভাষা বা Indo-Aryan বা Indic Language। আনুমানিক ১৫০০ খৃ. পূর্বাব্দে ভারতে এই আর্যভাষার অনুপ্রবেশ ঘটে। আর্যরা অসংখ্য ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে প্রথমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে উপনিবিষ্ট হয়। পরে পূর্ব পাঞ্জাব, মধ্যদেশ ও উত্তরাপথের প্রাচ্য অঞ্চলে আর্যভাষার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতে অনুপ্রবেশের কাল থেকে আজ পর্যন্ত হিসেব করলে, এই আর্যভাষার বিস্তৃতিকাল প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর। এই সুদীর্ঘ বছরের ভাষা-ইতিহাসকে তিনটি প্রধান যুগে ভাগ করা হয়—

(১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য (Old Indo-Aryan = OIA)

(২) মধ্য ভারতীয় আর্য (Middle Indo-Aryan = MIA)

(৩) নব্য ভারতীয় আর্য (New Indo-Aryan = NIA)

ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন যুগের কালগত সীমা, যুগগত নাম ও নিদর্শন নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপিত করা যায়। ডঃ রামেশ্বর শ'-এর 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' গ্রন্থ [তৃতীয় সং., ৮ অগ্রহায়ণ, ১৪০৩, আনন্দ, পৃ. ৫৪৫] অনুসরণে এই সারণি প্রস্তুত হয়েছে।

যুগ	কালগত সীমা	যুগগত নাম	নিদর্শন
(১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য (OIA)	আনুমানিক ১৫০০ খ্রিঃপূঃ থেকে ৬০০ খ্রিঃপূঃ	বৈদিক ভাষা বা বৈদিক সংস্কৃত ভাষা	বেদ, মূলত ঋগ্বেদের সংহিতা অংশ (মন্ত্র)
(২) মধ্য ভারতীয় আর্য (MIA)	আনুমানিক ৬০০ খ্রিঃপূঃ থেকে ৯০০ খ্রিঃ	প্রাকৃত ভাষা, পালি ভাষা ক্ল্যাসিকাল বা লৌকিক সংস্কৃত ভাষা	অশোকের শিলালিপি, সংস্কৃত নাটকে নারী ও নিম্নশ্রেণীর পুরুষ চরিত্রের সংলাপ, প্রাকৃত ও পালি ভাষায় রচিত যথাক্রমে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ, প্রাকৃতে রচিত মহাকাব্য, সাহিত্য গ্রন্থ ইত্যাদি, কালিদাস প্রমুখ সাহিত্যিকদের সংস্কৃত কাব্য-নাটক ইত্যাদি।
(৩) নব্য ভারতীয় আর্য (NIA)	আনুমানিক ৯০০ খ্রি: থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত	বাংলা, হিন্দি, অবধি, মারাঠি, পাঞ্জাবি ইত্যাদি।	আধুনিক ভারতীয় আর্যদের মুখের ভাষা ও সাহিত্য।

ভারতীয় আর্যভাষার যুগবিভাগ

১.৬ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার আনুমানিক বিস্তৃতি হল ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। এই যুগের ভারতীয় আর্যভাষার মূল নিদর্শন পাওয়া যায় হিন্দুদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ 'বেদ'-এ। অর্থাৎ বৈদিক ভাষাই হল ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম সাহিত্যিক রূপ। বৈদিক সাহিত্য মূলত তিনটি স্তরে বিভক্ত— বেদ বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক উপনিষদ। 'বেদ' বলতে বোঝায় 'ত্রয়ী' অর্থাৎ তিন যজ্ঞীয় বেদ

(ঋক্, সাম, যজুঃ) এবং অযজ্ঞীয় অথর্ববেদ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে আছে নানা যজ্ঞকর্মের বিবরণ এবং কিছু প্রাচীন উপাখ্যান। ব্রাহ্মণ-এরই পরিশিষ্ট হল আরণ্যক-উপনিষদ। ঋক্ ও সাম বেদ পদ্যে, অন্যান্য বেদ গদ্য-পদ্য মিশ্রিত এবং ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক-উপনিষদ প্রধানত গদ্যে লেখা।

ড. পরেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, বেদোত্তর বা প্রাক্-সংস্কৃত যুগের কালসীমা আনুমানিক খ্রিঃপূঃ ৮০০-৩০০ অব্দ। সাহিত্যসম্ভার ও রচনার ক্রমবিন্যাসে সেটি এইরকম—

(ক) 'ব্রাহ্মণ' জাতীয় গ্রন্থাবলি (আনুমানিক খ্রিঃপূঃ ৮০০-৫০০)

(খ) বিভিন্ন আরণ্যক ও উপনিষদ (খ্রিঃপূঃ ৭০০-৫০০)

(গ) 'সূত্র' জাতীয় রচনাসম্ভার (খ্রিঃপূঃ ৫০০-৩০০)

এই সময়ে বেদপাঠের সহায়ক হিসেবে আরও বিশেষ শ্রেণির রচনার সৃষ্টি হয়েছিল, যা সামগ্রিকভাবে 'বেদাঙ্গ' বা 'সূত্রসাহিত্য' হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে। যদিও বেদাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত রচনা সূত্রাকারে গ্রথিত নয়। বেদাঙ্গ ষড়মূলক— 'শিক্ষা' বা ধ্বনিতত্ত্ব (Phonetics), কল্প (Ritual), ব্যাকরণ (Grammar), নিরুক্ত (Etymology), ছন্দঃ (Metrics) এবং জ্যোতিষ (Astronomy)।

১.৭ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্য

(ক) ধ্বনিতাত্ত্বিক:

১) ঋ, ঋৃ, ঌ, এ, ঐ-সহ সমস্ত স্বরধ্বনি এবং শ্, ষ্, স্,-সহ সমস্ত ব্যঞ্জনধ্বনিই প্রচলিত ছিল।

২) স্বরাঘাতের স্থানপরিবর্তনের ফলে শব্দের অন্তর্গত স্বরধ্বনির বিশেষ ক্রমানুসারে গুণগত পরিবর্তন হত। পরিবর্তনের তিনটি ক্রম— গুণ বা স্বরধ্বনির অবিকৃতি (√স্বপ্ > 'স্বপ্ন'), বৃদ্ধি বা স্বরধ্বনির দীর্ঘিকরণ (√স্বপ্ > 'স্বাপ'), এবং সম্প্রসারণ বা স্বরধ্বনি ক্ষীণ হওয়ার ফলে শব্দমধ্যস্থ ঋ, র্, ব ধ্বনির স্থানে যথাক্রমে র্, ই, উ-এর আগমন (√স্বপ্ > 'সুপ্ত'—'ব' লুপ্ত হয়ে 'উ'-এর আগমন)।

৩) সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মধ্যে সন্ধিযোগ্য স্থানে প্রায় সর্বত্র সন্ধি অপরিহার্য ছিল।

৪) স্বরাঘাতের প্রচলন ছিল। বৈদিক স্বর ছিল তিন প্রকার— উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত।

৫) যুক্তব্যঞ্জনের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার প্রচলিত ছিল। যেমন ক্র, ক্ল, ক্ত, ক্তৃ, ক্ষ্ম, র্ম, র্দ্ধ ইত্যাদি।

(খ) রূপতাত্ত্বিক:

১) মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় তিনটি বচন প্রচলিত ছিল— একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন। বচনভেদে ধাতুরূপ ও শব্দরূপের পার্থক্য ঘটত।

২) কারক ছিল আটটি— কর্তৃ, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ এবং সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদ।

৩) লিঙ্গ ছিল তিন প্রকার— পুং, স্ত্রী এবং ক্লীব। লিঙ্গভেদে শব্দরূপ পৃথক হলেও ক্রিয়ারূপ পৃথক হত না।

৪) শব্দরূপের চেয়ে ক্রিয়ারূপের বৈচিত্র্য অনেক বেশি ছিল। কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যে ক্রিয়ার রূপ হত পৃথক।

৫) ক্রিয়ারূপ ছিল দু'প্রকার— পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ। ধাতু তিন ভাগে বিভক্ত ছিল— পরস্মৈপদী, আত্মনেপদী ও উভয়পদী।

৬) ক্রিয়ার কাল ছিল পাঁচ প্রকার— লট্ (Present), লঙ্ (Imperfect), লৃট (Future), লিট্ (Perfect) এবং লুঙ্ (Arrist)। লঙ্, লুঙ্ ও লিট্ ছিল অতীতকালের প্রকারভেদ।

৭) ক্রিয়ার পাঁচটি ভাব ছিল— অভিপ্রায়, নির্বন্ধ, নির্দেশক, সম্ভাবক এবং অনুজ্ঞা।

৮) উপসর্গ ছিল কুড়িটি— প্র, পরা, অপ, সম, অনু, অব, নির্, দুর্, অভি, বি, অধি, সু, উৎ, অতি, নি, প্রতি, পরি, অপি, উপ, আ।

৯) কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে নতুন শব্দ গঠনে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা ছিল অদ্বিতীয়। √বৃৎ + শানচ্ = বর্তমান।

১০) বৈদিক ধাতুর সঙ্গে ত্বা, ত্বায় ইত্যাদি প্রত্যয় যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া (Gerund) তৈরি করা হত। √পা + ত্বা = পীত্বা।

১১) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় বিশেষণ ব্যবহারে প্রবণতা অনেক বেশি লক্ষ করা যায়। বিশেষ্যের বচন ও লিঙ্গ অনুসারে বিশেষণ পদ গঠন করা হত।

১২) এই পর্যায়ে ছন্দ পদ্ধতি বৃত্তিমূলক। স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদে, সুরাঘাতের ওপর নির্ভর করে অজস্র ছন্দ তৈরি হয়েছিল।

(গ) অন্বয়তাত্ত্বিক:

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় কর্তৃ, কর্ম প্রভৃতি কারকের এবং ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপের বিভক্তিচিহ্ন সুনির্দিষ্ট ছিল। ফলে বাক্যের মধ্যে ওই পদগুলি যেস্থানেই বসুক না কেন, তাকে সহজেই চিহ্নিত করা যেত। অর্থাৎ, বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির অবস্থান পরিবর্তন করলেও বাক্যের অর্থ সেক্ষেত্রে বিপর্যস্ত হত না।

১.৮ বৈদিক ও সংস্কৃতের তুলনা

প্রাচীনকালের বৈদিক ভাষা ছিল মূলত বৃহত্তর জনসাধারণের মৌখিক জীবন্ত ভাষার ওপর প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তীকালে অঞ্চলবিশেষে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের ভাষার ওপর প্রতিষ্ঠিত সাধুভাষা ছিল ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত। মৌখিক ভাষার তুলনায় তা কৃত্রিম ভাষা। ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত যখন সাহিত্যের ভাষারূপে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা

লাভ করে, তখন বৃহত্তর জনসাধারণের মুখের ভাষা ছিল প্রাকৃত ভাষা। জনসাধারণের এই জীবন্ত ভাষাস্রোত থেকে ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত যত বিচ্ছিন্ন হয়েছে, ততই তা ব্যাকরণের নিগড়ে বাঁধা পড়ে কৃত্রিমতর হয়ে গেছে এবং শেষপর্যন্ত তা মৃত ভাষায় পরিণত হয়েছে।

পাণিনির পূর্বে প্রাচীন আর্যভাষার কথনের তিনটি মতান্তরে, চারটি ছাঁদ পাওয়া যায়।

- প্রাচ্য: পূর্বভারতের অযোধ্যা ও উত্তর ভারতের পূর্বাঞ্চল, বিহার অঞ্চলের কথনরীতি
- উদীচ্য: উত্তর-পশ্চিম ভারত ও উত্তর পাঞ্জাব অঞ্চলের কথনরীতি
- মধ্যদেশীয়: পশ্চিম ভারতের মধ্যদেশ যেমন দিল্লি, মিরাট, মথুরা অঞ্চলের ভাষারীতি
- দাক্ষিণাত্য: মহারাষ্ট্র অঞ্চলের কথন রীতি

পাণিনি ছিলেন উদীচ্যের মানুষ। তাঁর হাতে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ তৈরি হয়। তিনি মধ্যদেশের শিক্ষিত মানুষদের মুখের কথাকে আদর্শ ভাষারূপে গ্রহণ করেন। মধ্যদেশের শিক্ষিত মানুষদের মুখের কথা এবং উদীচ্যের কথনরীতির কিছু উপাদানের মিশ্রণেই ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত তৈরি হয়।

উভয় ভাষার পার্থক্যের মূল সূত্রগুলি হল—

১। বহু বৈদিক শব্দ ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতে হয় সম্পূর্ণ লুপ্ত, নতুবা, অর্থান্তরিত।

২। বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য ব্যাপকভাবে দীর্ঘ সমাসের প্রয়োগ।

৩। ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতে সম্ভাব্যক্ষেত্রে সন্ধি ছিল বাধ্যতামূলক। কিন্তু বৈদিক সন্ধি এতখানি বাধ্যতামূলক ছিল না।

৪। স্বরাঘাতের পরিবর্তে শ্বাসাঘাতের আবির্ভাব ঘটে।

৫। ক্রিয়ারূপে ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতের তুলনায় বৈদিক সংস্কৃতে বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য অনেক বেশি ছিল।

৬। ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতে ক্রিয়ার ভাব সম্পর্কিত বৈচিত্র্য হ্রাস পায়। পাঁচটি-র পরিবর্তে ক্রিয়ার ভাবের সংখ্যা দাঁড়ায় তিনটি।

৭। ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতে কিছু নতুন ধাতু ও বহু শব্দ এল যা ভারতের অনার্য ভাষা থেকে গৃহীত। সেগুলো বৈদিক ভাষায় ছিল না।

৮। বেদের স্বরের সংগীতময়তা পরবর্তী যুগে সংস্কৃতে বিলোপিত হয়।

৯। বৈদিক দন্ত্যবর্ণ পরে মূর্ধন্য বর্ণে পরিণত হয়। যেমন—ভন থেকে ভণ।

১০। বৈদিক যুগের (ঋকবেদে) ‘ল’ ধ্বনি বিরল কিন্তু পরবর্তীতে ‘র’—‘ল’ ধ্বনিতে পরিণত হয়।

১১। বৈদিক যুগের ভাষায় শব্দরূপে বৈচিত্র্য এবং প্রাচুর্য অনেক বেশি পরিমাণে লক্ষণীয়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, বৈদিক ভাষার ব্যাকরণগত বৈচিত্র্য, রূপ-প্রাচুর্য এবং পদবিন্যাস ছিল মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মতো বিস্তৃত এবং বিশদ। কিন্তু ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতে তা অনেক সীমিত ও সংকীর্ণ।

১.৯ সারসংক্ষেপ

এই এককটিতে পৃথিবীর ভাষাবংশের বিস্তার, বিবর্তনের ধারা, ভাষাবংশগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। ইন্দো-ইউরোপীয়, সেমীয়-হোমীয়, বান্টু, ফিন্নো-উগ্রীয়, তুর্ক-মঙ্গল-মাঞ্চু, ককেশীয়, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, ভোট-চীনীয়, উত্তর-পূর্ব সীমান্তীয়, এস্‌কিমো, আমেরিকার আদিম জনজাতির ভাষার প্রাপ্তিস্থল, বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে আলোচনা এই অংশে লক্ষণীয়।

ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব, বিকাশ বিস্তার বিবর্তন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা তুলে ধরা হয়েছে এই এককে। এই এককে নির্দিষ্টভাবে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে শিক্ষার্থীর। পরিশেষে বৈদিক ও ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা সাপেক্ষে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার পরিবর্তনের স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

পৃথিবীর ভাষাবংশ, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ, ভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্গত প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য বর্তমান এককের আলোচ্য বিষয়।

১.১০ অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী:

১. পৃথিবীর প্রধান ভাষাবংশের সংখ্যা আনুমানিকভাবে কত?

২. পৃথিবীর প্রধান ভাষাবংশগুলির নাম লিখুন।

৩. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে মোট ক'টি শাখার উদ্ভব ঘটে? সেগুলি কী কী?

৪. সেমীয়-হামীয় ভাষাবংশের দুটি উল্লেখযোগ্য ভাষার নাম লিখুন।

৫. জর্জীয় ভাষা কোন্ ভাষাবংশের অন্তর্গত?

৬. ভোট-চীনীয় ভাষাবংশের কয়টি শাখা ও কী কী?

৭. আমেরিকার আদিম জনজাতির দুটি ভাষাবংশের নামোল্লেখ করুন।

৮. প্রাচীন, মধ্য ও নব্য ভারতীয় আর্যভাষার একটি করে সাহিত্যিক নিদর্শনের উল্লেখ করুন।

৯. বৈদিক স্বর কয় প্রকার ও কী কী?

১০. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় স্বরধ্বনির দীর্ঘিকরণের একটি উদাহরণ দিন।

১১. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ক্রিয়ার কাল কয় প্রকার ছিল ও কী কী?

১২. ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার ভাগগুলি উল্লেখ করুন।

১৩. সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে ভাষাকে মিলিয়ে পড়া যায় কি? ভাষাবিজ্ঞানের এই আলোচনার ধারাটি কী নামে পরিচিত?

১৪. মনস্তত্ত্বের সঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানকে মিলিয়ে পড়া যায় কি? ভাষাবিজ্ঞানের এই আলোচনার ধারাটি কী নামে পরিচিত?

১৫. আমেরিকার আদিম জনজাতির ভাষাগুলির মধ্যে কোন্ ভাষাবংশ খানিক সমৃদ্ধিলাভ করেছিল?

১৬. গ্রিক ভাষা কোন্ ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত? গ্রিক ভাষাবংশের উদাহরণ দিন।

১৭. বালতো-স্লাবিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত দুটি শাখা এবং তাদের সাহিত্যিক নিদর্শন উল্লেখ করুন।

১৮. প্রাচীন আর্যভাষার কথনছাঁদ কতগুলি ও কী কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী:

১. পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাবংশগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভাষাবংশটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২. ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা করুন।

৩. ‘আর্য’ বলতে কী বোঝেন?

৪. ভারতীয় আর্যভাষার কালভিত্তিক বিভাজনটি সাহিত্যিক নিদর্শনসহ আলোচনা করুন।

৫. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বলতে কী বোঝানো হয়?

৬. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৭. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে লিখুন।

৮. বৈদিক সাহিত্য কয়টি স্তরে বিভক্ত ও কী কী?

৯. ‘প্রাকৃত’ বলতে কোন স্তরের ভারতীয় আর্যভাষাকে বোঝায়? এর বিস্তৃতিকাল উল্লেখ করুন।

১০. বেদোত্তর বা প্রাক্-সংস্কৃত যুগের কালসীমা উল্লেখ করে এই সময়ের সাহিত্য-নিদর্শনের নামোল্লেখ করুন।

১১. কার হাত ধরে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ তৈরি হয়? ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃত ভাষা নির্মাণে কোন্ কোন্ উপাদানকে মান্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল?

১২. আর্যভাষার ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

রচনাধর্মী:

১. পৃথিবীর ভাষাবংশগুলি সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করুন।

২. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৩. বৈদিক ভাষা ও ধ্রুপদী সংস্কৃত—এ দুটিকে কি আপনি অভিন্ন মনে করেন? আপনার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি সাজান।

৪. পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাবংশগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের গুরুত্বের দিকগুলি স্পষ্ট করুন।

৫. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের আনুমানিক প্রাচীন ভৌগোলিক অবস্থান, সময়কাল ও উপভাষা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। এই ভাষাবংশের যে-শাখা থেকে ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব হয়েছে, প্রসঙ্গত তারও পরিচয় দিন।

৬. ভারতীয় আর্যভাষার কালানুক্রমিক বিবর্তন, স্তরবিভাগ ও প্রাপ্ত ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৭. মোট কতগুলি শাখা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অন্তর্গত? এই প্রতিটি শাখার প্রাপ্তিস্থান, নিদর্শন ও ভাষাবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

একক ২ ❑ ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন (খ)

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ মধ্যভারতীয় আর্যভাষা

২.৪ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্তরবিভাজন

২.৫ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্য

২.৬ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন

২.৭ সারসংক্ষেপ

২.৮ অনুশীলনী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যস্তর অর্থাৎ মধ্যভারতীয় আর্যভাষা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবহিত হতে পারবে। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব, স্তরবিভাজন, বিবিধ বৈশিষ্ট্য, নানা সাহিত্যিক নিদর্শনের সঙ্গে তারা পরিচিত হয়ে উঠবে।

২.২ প্রস্তাবনা

'ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তন' বিষয়ক এই দ্বিতীয় এককটি মূলত মধ্যভারতীয় আর্যভাষার আলোচনার জন্য নির্ধারিত। এই এককে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার নানা স্তরবিভাজনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিকদের ভিন্ন মতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক এবং অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণযোগে আলোচিত হয়েছে। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাহিত্যিক নিদর্শনকে কীভাবে চিহ্নিত করা যায়, সেটিও এখানে উল্লিখিত হয়েছে।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষাকে প্রধানত তিনটি স্তরে (আদি, মধ্য, অন্ত্য) বিভক্ত করা হয়। এই বিভাজন প্রসঙ্গে বেশকিছু মতপার্থক্য লক্ষ করা যায়। এই এককে তিন-স্তরীয় মধ্যভারতীয় আর্যভাষার প্রাপ্তিস্থান, নিদর্শনের স্বরূপ প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা কতগুলি সারণির সাহায্য নিয়েছি। এই একক মধ্যভারতীয় আর্যভাষা সম্পর্কে শিক্ষার্থীর সম্যক ধারণা তৈরিতে সাহায্য করবে। মধ্যভারতীয় আর্যভাষা মূলত তিনটি স্তরে বিভক্ত। আমরা এই তিনটি স্তরের সময়সীমা, প্রাপ্তিস্থান এবং সাহিত্যিক নিদর্শনের সারণি তুলে ধরলাম।

২.৩ মধ্যভারতীয় আর্যভাষা

ভারতীয় আর্যভাষা প্রাচীন পর্ব শেষে মধ্য পর্বে প্রবেশ করেছে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে। খ্রিস্টীয় ১১ শতক পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। প্রায় দেড় হাজার বছর ব্যাপী ভারতীয় আর্যভাষার এই মধ্যস্তর মধ্যভারতীয় আর্যভাষা বা Middle Indo-Aryan (MIA) নামে অভিহিত। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার যুগগত সাধারণ নামকরণ যদি হয়ে থাকে বৈদিক সংস্কৃত, তবে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার যুগগত সাধারণ নামকরণ করা যেতে পারে প্রাকৃতভাষা। যদিও, প্রাচীন ভারতীয় আর্যস্তরকে শুধু 'সংস্কৃত' আখ্যা দিলে যে-ব্যাপ্তি বা কালগত দোষ ঘটে, মধ্যভারতীয় আর্যভাষার পর্বকে কেবল 'প্রাকৃত' বললে সেই একই দোষ হবে। ভারতীয় আর্যভাষার ক্ষেত্রে 'প্রকৃতি' বা মূল উপাদান (primeval element) অর্থাৎ বৈদিক সংস্কৃত ভাষা থেকে যার জন্ম, তা-ই হল প্রাকৃত। আসলে 'প্রাকৃত' এই অভিধাটি ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যস্তরের একটি উপস্তরের সূচক।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাসের প্রাণপুরুষ যদি হন পাণিনি, তবে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা পর্বের প্রধান হোতা হলেন বুদ্ধদেব। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন পুরোহিততন্ত্রশাসিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতের পরিবর্তে প্রাকৃতজনোচিত ভাষাই জনগণগ্রাহ্য হয়ে উঠল। অশোকের অনুশাসনে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা, বহির্ভারতীয় আঞ্চলিক উপভাষায় রচিত ধর্মগ্রন্থের ভাষা (খোটানী ধম্মপদ) এর স্বাক্ষরবাহী। এর পাশাপাশি ধর্মীয় বিপ্লব ও তার প্রসারের কারণে পালি (হীনযানীদের আদর্শ সাধুভাষা), বৌদ্ধ মিশ্র সংস্কৃত (মহাযানীদের আদর্শ সাধুভাষা), অর্ধমাগধী (জৈনদের আদর্শ সাধুভাষা) ইত্যাদির উদ্ভব ঘটে। ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের ফলে পূর্বী উপভাষার প্রভাব বিস্তৃত হয়। ধ্রুপদী সংস্কৃতের ওপরে বিশেষত শব্দাবলি ও বাক্যরীতিঘটিত প্রাকৃত প্রভাবে অশুদ্ধ সংস্কৃত রচনা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া লিপি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে ভাষা-বিবর্তনের ইতিহাসে নতুন মাত্রা সংযোজিত হল।

২.৪ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্তরবিভাজন

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার প্রধানত তিনটি স্তর— প্রাচীন, মধ্য এবং অন্ত্য। প্রতিটি স্তরের আনুমানিক স্থিতিকাল নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ডঃ রামেশ্বর শ' এবং ডঃ সুকুমার সেন-এর মতে, প্রাচীন বা প্রথম স্তরের মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্থিতিপর্ব খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী। দ্বিতীয় বা মধ্য স্তরের কালব্যাপ্তি খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী। আর, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত শেষ বা অন্ত্য স্তরের স্থিতিকাল।

সারণি ১

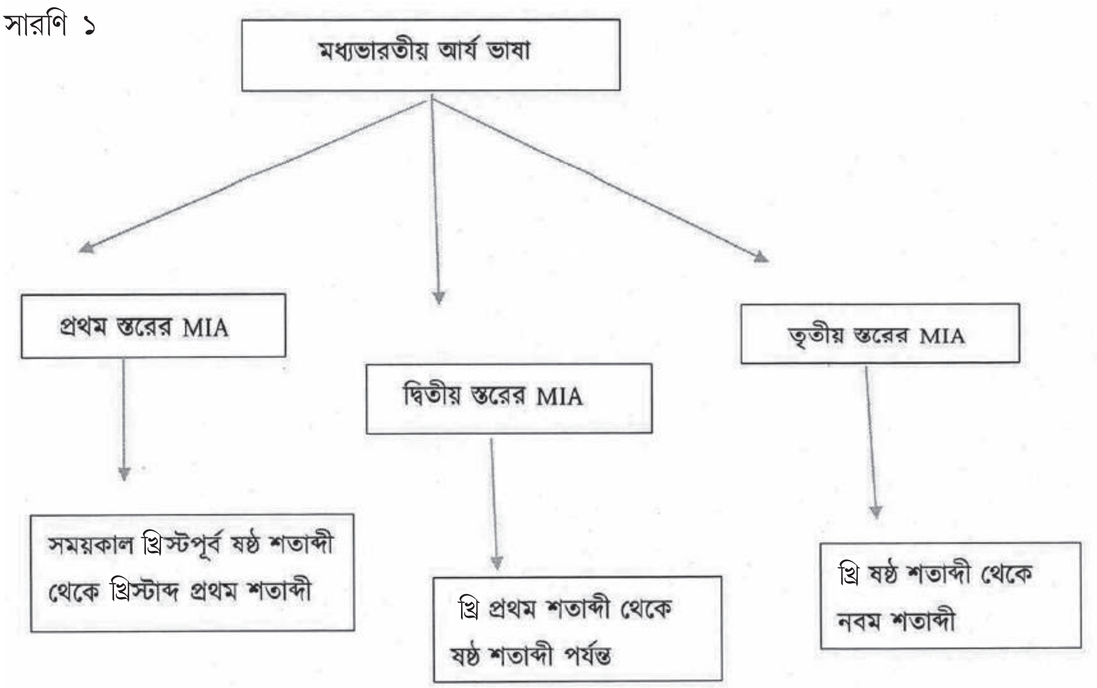
মধ্যভারতীয় আর্য ভাষা
প্রথম স্তরের MIA
দ্বিতীয় স্তরের MIA
তৃতীয় স্তরের MIA
সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টাব্দ প্রথম শতাব্দী
খ্রি প্রথম শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত
খ্রি ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে নবম শতাব্দী

সারণি ২

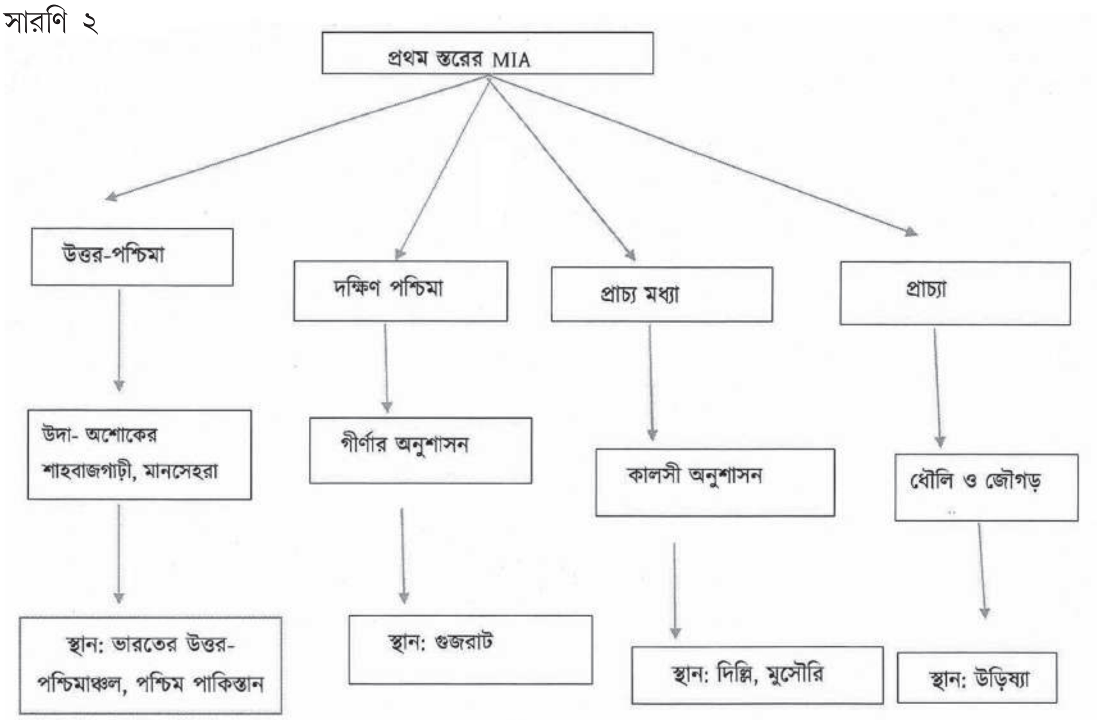
প্রথম স্তরের MIA
উত্তর-পশ্চিমা
দক্ষিণ পশ্চিমা
প্রাচ্য মধ্য
প্রাচ্য
উদা- অশোকের শাহবাজগাঢ়ী, মানসেহরা
গীর্ণার অনুশাসন
কালসী অনুশাসন
ধৌলি ও জৌগড়
স্থান: ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, পশ্চিম পাকিস্তান
স্থান: গুজরাট
স্থান: দিল্লি, মুসৌরি
স্থান: উড়িষ্যা

সারণি ৩

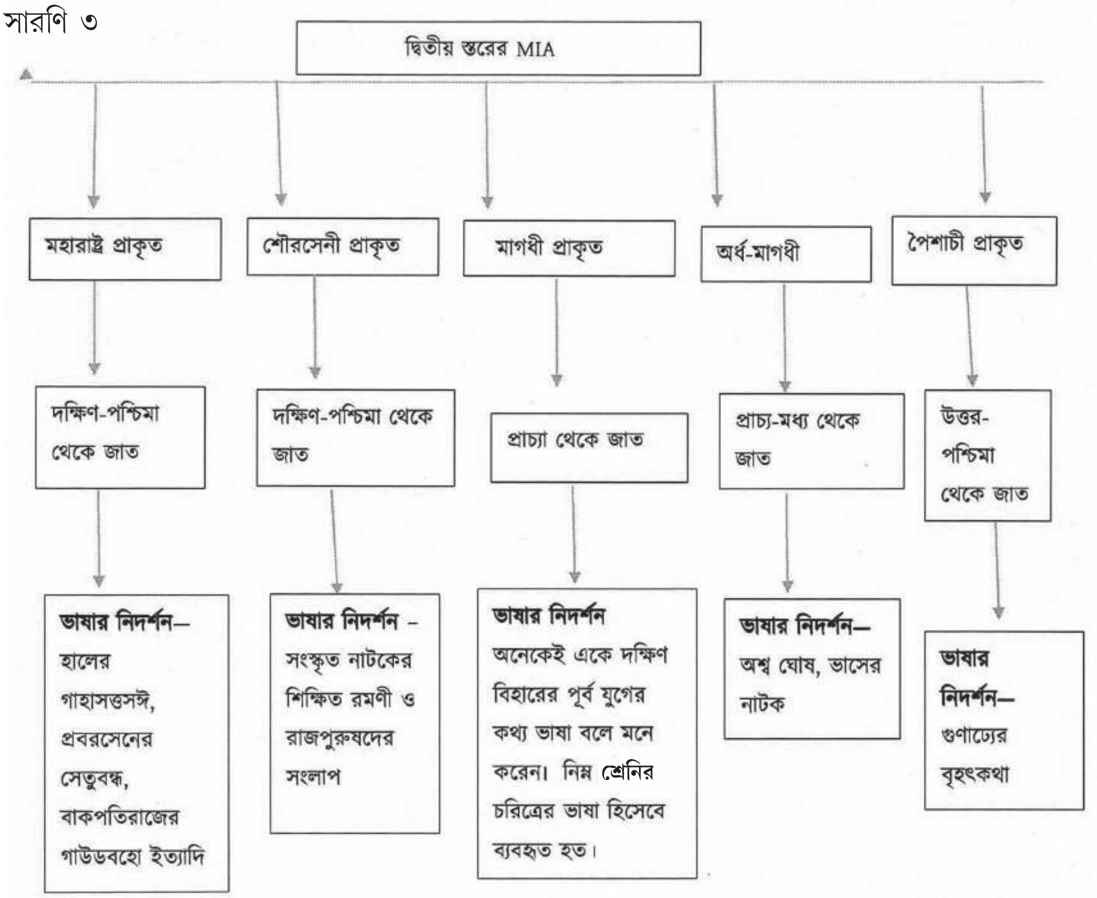
দ্বিতীয় স্তরের MIA
মহারাষ্ট্র প্রাকৃত
শৌরসেনী প্রাকৃত
মাগধী প্রাকৃত
অর্ধ-মাগধী
পৈশাচী প্রাকৃত
দক্ষিণ-পশ্চিমা থেকে জাত
দক্ষিণ-পশ্চিমা থেকে জাত
প্রাচ্যা থেকে জাত
প্রাচ্য-মধ্য থেকে জাত
উত্তর-পশ্চিমা থেকে জাত
ভাষার নিদর্শন— হালের গাহাসত্তসঈ, প্রবরসেনের সেতুবন্ধ, বাকপতিরাজের গাউডবহো ইত্যাদি
ভাষার নিদর্শন – সংস্কৃত নাটকের শিক্ষিত রমণী ও রাজপুরুষদের সংলাপ
ভাষার নিদর্শন অনেকেই একে দক্ষিণ বিহারের পূর্ব যুগের কথ্য ভাষা বলে মনে করেন। নিম্ন শ্রেনির চরিত্রের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হত।
ভাষার নিদর্শন— অশ্ব ঘোষ, ভাসের নাটক
ভাষার নিদর্শন— গুণাঢ্যের বৃহৎকথা

সারণি ৪

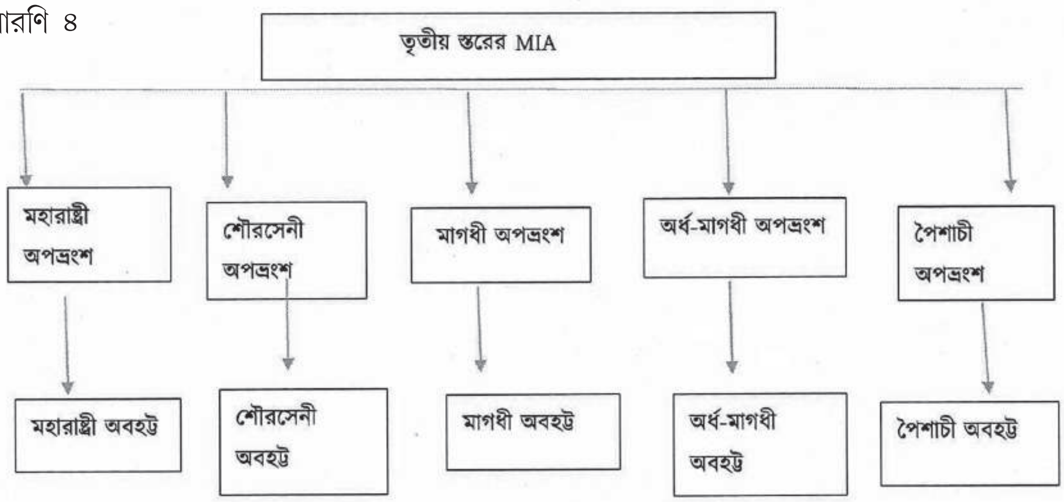
তৃতীয় স্তরের MIA
মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ
শৌরসেনী অপভ্রংশ
মাগধী অপভ্রংশ
অর্ধ-মাগধী অপভ্রংশ
পৈশাচী অপভ্রংশ
মহারাষ্ট্রী অবহট্ট
শৌরসেনী অবহট্ট
মাগধী অবহট্ট
অর্ধ-মাগধী অবহট্ট
পৈশাচী অবহট্ট

কিন্তু ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার তিনটি-র পরিবর্তে চারটি স্তরে মধ্যভারতীয় আর্যভাষাকে বিভক্ত করেছেন। তিনি প্রাচীন বা আদি এবং মধ্য উপস্তরের মাঝখানে একটি যুগকে 'ক্রান্তিপর্ব' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন—

(১) আদি উপস্তর → স্থিতিকাল: খ্রিঃ পূর্ব ৬০০ - খ্রিঃ পূর্ব ২০০ অব্দ

(২) ক্রান্তিপর্ব → স্থিতিকাল: খ্রিঃ পূর্ব ২০০ - খ্রিঃ ২০০ অব্দ

(৩) মধ্য উপস্তর → স্থিতিকাল: খ্রিঃ ২০০ - খ্রিঃ ৬০০ অব্দ

(৪) অন্ত্য উপস্তর → স্থিতিকাল: খ্রিঃ ৬০০ - খ্রিঃ ১০০০ অব্দ।

২.৫ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্য

(ক) ধ্বনিতাত্ত্বিক:

১) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার দু'টি অর্ধব্যঞ্জনধ্বনি 'ঋ' ও 'ঌ' মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় আর থাকল না। 'ঌ'-কার অনেক আগে বৈদিক সংস্কৃতেরই শেষদিকে লোপ পেতে শুরু করেছিল। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় তা একেবারেই বিলুপ্ত হল। 'ঋ'-কার এক-এক রকম প্রাকৃতে এক-এক রকম ধ্বনিতে পরিণত হল—

ঋ > অ/ই/উ/এ (মৃগ > মগ, মিগ, মুগ)

ঋ > র/রি/রু (বৃক্ষ > ব্রচ্ছ, ব্রুচ্ছ, ঋষি > রিসি)

২) 'ঐ' এবং 'ঔ'—এই দুটি যৌগিক স্বরধ্বনি একক স্বর—যথাক্রমে 'এ' এবং 'ও'-তে পরিবর্তিত হল।

ঔ > ও (ঔষধানি > ওসধানি)

৩) 'অয়' এবং 'অব' সংকোচনের ফলে যথাক্রমে 'এ' এবং 'ও' স্বরধ্বনিতে পরিণত হল। অয় > এ (পূজয়তি > পূজেতি), অব > ও (ভবতি > ভোদি)

৪) পদান্তে-স্থিত অনুস্বারের (ম্ > ং) পূর্ববর্তী এবং যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর, হ্রস্বস্বরে রূপান্তরিত হল।

যেমন— কান্তাম্ > কন্তং, দীর্ঘ > দিগ্‌ঘ।

৫) পদান্তে 'অ'-কারের পরে অবস্থিত বিসর্গ (ঃ) লোপ পেয়েছে এবং সেই বিসর্গের পূর্ববর্তী 'অ'-কার কখনো ও-কারে, কখনো এ-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন : জনঃ > জন > জনো/জনে। 'অ'-কার ছাড়া অন্য স্বরের পরবর্তী বিসর্গ শুধু লোপ পেয়েছে।

যেমন—পুত্রাঃ > পুত্তা।

৬) পদের অন্ত্য অনুস্বার সাধারণত রক্ষিত হয়েছে।

যেমন—নরম্ > নরং।

৭) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি শিস্ধ্বনির (শ্, ষ, স্) পরিবর্তে একটি মাত্র শিস্ধ্বনির প্রচলন ছিল মধ্যভারতীয় আর্যভাষায়—কোনো প্রাকৃতে 'শ্', কোনো প্রাকৃতে 'ষ্'।

৮) মধ্যভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় স্তরে দেখা যায়, দুই স্বরের মধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জন অল্পপ্রাণ ধ্বনি হলে লোপ পেয়েছে এবং সেই স্থানে পরে কখনো কখনো 'য়'-শ্রুতি বা 'ব'-শ্রুতি হয়েছে। যেমন—সকল > সঅল > সয়ল। ধ্বনিটি মহাপ্রাণ হলে তা 'হ'-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন—মুখ > মুহ।

৯) ঋ, র্, ষ্ ধ্বনির পরবর্তী দন্ত্যধ্বনি (ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্) পরিবর্তিত হয়ে মূর্ধণ্যধ্বনির রূপ (ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্) লাভ করেছে।

যেমন—কৃত > কট।

১০) সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে কেবল 'ক্ষ' (ক্ + ষ্)-এর পরিবর্তন হয়েছে স্বতন্ত্র ধারায়। সেটি কখনো হয়েছে 'ক্খ', কখনোবা 'চ্ছ'।

যেমন—বৃক্ষ > লুক্খ/রুচ্ছ।

(খ) রূপতাত্ত্বিক:

১) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় শব্দের অন্তে স্থিত ধ্বনির পার্থক্য অনুসারে শব্দরূপ পৃথক হত। কিন্তু মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় সাধারণত 'আ'-কারান্ত, 'ই'-কারান্ত ও 'উ'-কারান্ত শব্দ ছাড়া বাকি সব শব্দের রূপ 'অ'-কারান্ত।

২) মধ্যভারতীয় আর্যভাষার দ্বিবচন লোপ পাওয়ার ফলে শব্দরূপে শুধু একবচন ও বহুবচনের রূপভেদ রইল। দ্বিবচনের স্থানে বহুবচনের রূপ ব্যবহৃত হত।

যেমন—'দ্বৌ-ময়ূরৌ'-এর স্থানে হল 'দ্বৌ মোরা'।

৩) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিশেষ্য ও সর্বনামের শব্দরূপ পৃথক হত। মধ্যভারতীয় আর্যভাষার কোথাও কোথাও বিশেষ্যের শব্দরূপ, সর্বনামের শব্দরূপের মতো হতে দেখা যায়।

৪) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় বহুবচনে প্রায়ই প্রথমা ও দ্বিতীয়ার স্বরান্ত শব্দের রূপ পুংলিঙ্গে পৃথক ছিল। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় এই পার্থক্য প্রায়ই লুপ্ত হতে দেখা যায়।

৫) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় তৃতীয়ার বহুবচনের বিভক্তি ছিল 'ভিস্'। ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে মধ্যভারতীয় আর্যে এটি হল 'হি'।

৬) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ক্রিয়ারূপে আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ— দুই প্রকারভেদ ছিল। মধ্য-ভারতীয় আর্যে আত্মনেপদ লোপ পেল। প্রায় সর্বক্ষেত্রে শুধু পরস্মৈপদের ব্যবহার প্রচলিত হল।

৭) শব্দরূপের পাশাপাশি ক্রিয়ারূপেও প্রাচীন ভারতীয় আর্যের দ্বিবচন, মধ্যভারতীয় আর্যে লোপ পেল। সেইস্থানে বহুবচনের রূপই ব্যবহৃত হত।

৮) প্রাচীন ভারতীয় আর্যে ক্রিয়ার পাঁচটি ভাব-এর মধ্যে অভিপ্রায় ও নির্বন্ধ ভাব লোপ পেয়ে মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় তার সংখ্যা দাঁড়াল তিন— নির্দেশক, অনুজ্ঞা, সম্ভাবক।

৯) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ক্রিয়ার কাল ছিল পাঁচটি। এর মধ্যে লঙ্, লুঙ্ ও লিট্ ছিল অতীত কালেরই প্রকারভেদ। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় ওই তিন প্রকার অতীতের মধ্যে লিট্ একেবারেই লোপ পেল। আর লঙ্ ও লুঙ্ মিলে একটি রূপ লাভ করল।

১০) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় -ত্বা, -ত্বায় ইত্যাদি প্রত্যয়যোগে বহু বিচিত্র অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ সৃষ্টি করা হত। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় অসমাপিকার এত বৈচিত্র্য আর থাকল না।

১১) ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতে নিষ্ঠা প্রত্যয় যোগ (-ক্ত, ক্তবতু) করে ক্রিয়ার যে-রূপ রচিত হত (√গম্ + ত = গত), তা অতীতকালের সমাপিকা ক্রিয়া অর্থে ব্যবহৃত হত। এই রীতি মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় ব্যাপকভাবে অনুসৃত হতে থাকে।

(গ) অন্বয়তাত্ত্বিক:

১) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় প্রত্যেক কারকের বিভক্তি সুনির্দিষ্ট ছিল। ফলে বাক্যে পদবিন্যাসের বাঁধা-ধরা নিয়মের অপরিহার্যতা ছিল না। কিন্তু মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় অনেক বিভক্তিচিহ্ন লোপ পেল। ফলে বাক্যের মধ্যে শব্দের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থানের ওপরে বাক্যে তাদের ভূমিকা ও পদ-পরিচয় অনেকখানি নির্ভর করত। অর্থাৎ মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় বাক্যে পদবিন্যাসক্রমের নিয়মের গুরুত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হল।

২) কোনো কোনো বিভক্তি লোপ পাওয়ার ফলে বিভক্তির অর্থে কিছু কিছু স্বতন্ত্র শব্দ ও প্রত্যয়ের ব্যবহার প্রচলিত হল এবং অনুসর্গের প্রচলন হল।

২.৬ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার প্রথম স্তরের প্রধান ভাষা হল অশোকের শিলালিপির প্রাকৃত। এছাড়া খ্রিঃ পূর্ব শতাব্দীর অন্যান্য প্রত্নলিপির ভাষা, হীনযান-পন্থী বৌদ্ধদের ব্যবহৃত মিশ্র সংস্কৃত বা বৌদ্ধ সংস্কৃত এবং পালি ভাষাও এর অন্তর্ভুক্ত। প্রথম স্তরের প্রাকৃত ভাষার আঞ্চলিক রূপ বা উপভাষাগুলি হল—

উত্তর-পশ্চিমা: এই প্রাকৃতের নিদর্শন পাওয়া যায় পশ্চিম পাকিস্তানে-প্রাপ্ত অশোকের শাহ্‌বাজ্‌গঢ়ী ও মান্‌সেহ্‌রা অনুশাসনে।

দক্ষিণ-পশ্চিমা: গুজরাটের জুনাগড়ে প্রাপ্ত অশোকের গীর্ণার অনুশাসনে এই প্রাকৃতের নিদর্শন পাওয়া যায়।

প্রাচ্যা: এই প্রাকৃতের নিদর্শন আছে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের কাছে ধৌলী গ্রামে প্রাপ্ত অনুশাসনে।

প্রাচ্যা-মধ্যা: এই প্রাকৃতের নিদর্শন পাওয়া গেছে মুসৌরী থেকে যোলো মাইল দূরে অবস্থিত কাল্‌সী গ্রামে প্রাপ্ত অশোকের একটি অনুশাসনে।

অশোকের অনুশাসনের সমসাময়িক একটি লেখ নিতান্ত ক্ষুদ্র হলেও ভাষার ইতিহাসে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হল **'সুতনুকা' প্রত্নলেখ**। উত্তরপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত রামগড় পাহাড়ের ওপরে যোগীমারা গুহায় খোদিত তিনছত্র প্রত্নলিপিটি প্রথম শব্দ 'শুতনুকা' থেকে সুতনুকা প্রত্নলেখ নামে চিহ্নিত হয়েছে। এই অনুশাসনের ভাষা প্রাচ্যা।

খারবেল অনুশাসন: উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের কাছে উদয়গিরি পাহাড়ের হাথিগুম্ফা ছাদের তলদেশে কলিঙ্গরাজ খারবেলের অনুশাসন উৎকীর্ণ আছে। এর ভাষা ঠিক প্রাচ্যা নয়— কতকটা দক্ষিণ-পশ্চিমার মতো। অশোকের গীর্ণার অনুশাসনের, বিশেষ করে পালি ভাষার সঙ্গে খারবেল অনুশাসনের ভাষার খুব মিল আছে।

পালি: দক্ষিণ-পশ্চিমা ও প্রাচ্য-মধ্যার সংমিশ্রণে উদ্ভুত মধ্যভারতীয় সাধু ভাষা থেকে পালি ভাষার উৎপত্তি। এটি সম্পূর্ণ ধর্মসাহিত্যের ভাষা। পালি ভাষা মূলত দক্ষিণ ভারতেই অনুশীলিত হতে থাকে। এই অঞ্চলে পালি ব্যবহারকারী হীনযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায় বাস করত। পরে, পালি-র চর্চা অবলুপ্ত হতে হতে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ ছেড়ে সিংহলে চলে যায়।

বৌদ্ধ-সংস্কৃত: উত্তর ভারতের বৌদ্ধ সম্প্রদায় পালি ব্যবহার করতেন না। তাঁরা সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্র ভাষায় গ্রন্থরচনা করতেন। এ ভাষার উৎপত্তি কথ্য সংস্কৃত ভাষা থেকে। সেই ভাষাকে এখন বলা হয় বৌদ্ধ বা মিশ্র সংস্কৃত। কুষাণ সম্রাটদের কোনো কোনো অনুশাসনে এই ভাষা দেখা যায়।

দ্বিতীয় স্তরের মধ্যভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শনগুলি হল—

নিয়া প্রাকৃত: চীনীয় তুর্কিস্তানের অন্তর্গত প্রাচীন শান্‌শান্‌ রাজ্যের সীমান্তে 'নিয়া' নামক স্থানের বালিস্তূপ থেকে প্রাপ্ত প্রধানত খরোষ্ঠীতে এবং কিছু কিছু ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা প্রত্নলেখগুলির ভাষা এখন নিয়া প্রাকৃত নামে পরিচিত।

সাহিত্যিক প্রাকৃত: সাহিত্যিক প্রাকৃত মূলত পাঁচ ভাগে বিভক্ত— মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, মাগধী ও পৈশাচী। সমসাময়িক কথ্য ভাষার সঙ্গে এগুলির বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অন্ত্যস্তরের নিদর্শনস্বরূপ পাই—

অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ: বিশুদ্ধ সংস্কৃতের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যে-লোকভাষা গড়ে উঠেছিল, পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে তাকে 'অপভ্রংশ' বলেছেন। তিনিই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন এবং তাঁর ব্যবহৃত এই শব্দটি এখন তৃতীয় স্তরের মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ অভিধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক সাহিত্যিক প্রাকৃতের কথ্যভিত্তি থেকে যেমন সেই শ্রেনির অপভ্রংশের জন্ম হল, তেমনি প্রত্যেক অপভ্রংশের পরবর্তী পরিণতি হল সেই শ্রেনির অবহট্‌ঠ বা অপভ্রষ্ট। যেমন—

শৌরসেনী প্রাকৃত > শৌরসেনী অপভ্রংশ > শৌরসেনী অবহট্‌ঠ

মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত > মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ > মহারাষ্ট্রী অবহট্‌ঠ

অর্ধমাগধী প্রাকৃত > অর্ধমাগধী অপভ্রংশ > অর্ধমাগধী অবহট্‌ঠ

মাগধী প্রাকৃত > মাগধী অপভ্রংশ > মাগধী অবহট্‌ঠ

পৈশাচী প্রাকৃত > পৈশাচী অপভ্রংশ > পৈশাচী অবহট্‌ঠ।

অপভ্রংশ হল মধ্যভারতীয় আর্যভাষার তৃতীয় স্তর। আর অবহট্‌ঠ হল এই তৃতীয় স্তরের শেষ ধাপ। কথ্যভাষা হিসেবে অবহট্‌ঠের স্থিতিকাল হল আনুমানিক খৃ. ৮ম থেকে ১০ম শতাব্দী। এই পর্বের শেষ দিকে বিভিন্ন শ্রেনির অবহট্‌ঠ থেকে নানা নব্যভারতীয় আর্যভাষা যেমন— বাংলা, হিন্দি, অবধি, মারাঠি, পাঞ্জাবি ইত্যাদির জন্ম হতে থাকে।

২.৭ সারসংক্ষেপ

এই এককে মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার স্তরবিন্যাস, ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উদাহরণ সহযোগে আলোচিত হয়েছে। মধ্যভারতীয় আর্যভাষা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষে ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচিত হয়েছে। সারণির সাহায্যে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন পর্যায়ের প্রাপ্তিস্থান, সাহিত্যিক নিদর্শন উদাহরণ সহযোগে প্রকাশ করা হয়েছে। এই একক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী মধ্যভারতীয় আর্যভাষা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।

২.৮ অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী:

১. মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সূচনাপর্ব কোন্‌টি?

২. মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় শিস্‌ধ্বনির সংখ্যা ক'টি?

৩. প্রাকৃত ভাষার আঞ্চলিক রূপ বা উপভাষাগুলি কী কী?

৪. দক্ষিণ-পশ্চিমা প্রাকৃতের সাহিত্যিক নিদর্শন কোথায় পাওয়া যায়?

৫. সাহিত্যিক প্রাকৃত কয়টি ভাগে বিভক্ত ছিল? সেগুলি কী কী?

৬. অবহট্‌ঠ—মধ্যভারতীয় আর্যভাষার কোন্ স্তরের নিদর্শন?

৭. পতঞ্জলির মতে অপভ্রংশ কাকে বলে?

৮. অপভ্রংশ মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার কোন স্তরের নিদর্শন?

৯. বৌদ্ধ সংস্কৃতভাষা কাকে বলে? এই ভাষার একটি উদাহরণ দিন।

১০. মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় ক্রিয়ার ভাব কয়প্রকার ও কী কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী:

১. মধ্যভারতীয় আর্যভাষার যুগবিভাজন দেখান।

২. মধ্যভারতীয় আর্যভাষার কয়েকটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

৩. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা ও মধ্যভারতীয় আর্যভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য নিরূপণ করুন।

৪. মধ্যভারতীয় আর্যভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৫. প্রাচীন ভারতীয় ও মধ্যভারতীয় আর্যভাষা রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে কোথায় আলাদা?

৬. মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করুন। প্রসঙ্গত, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার তুলনায় মধ্যভারতীয় আর্যভাষার অন্বয়তাত্ত্বিক গঠনের পার্থক্য উল্লেখ করুন।

৭. 'সুতনুকা' প্রত্নলেখের পরিচয় দিন।

৮. টীকা লিখুন: অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ।

৯. মধ্যভারতীয় আর্যভাষার 'ঋ' কার ধ্বনি ব্যবহারের স্বরূপ আলোচনা করুন।

১০. মধ্যভারতীয় আর্যভাষার আঞ্চলিক রূপ কয়প্রকার ও কী কী? প্রতিটি বিভাগের অন্তত একটি করে নিদর্শনের উদাহরণ দিন।

রচনাধর্মী:

১. মধ্যভারতীয় আর্যভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিশদে আলোচনা করুন।

২. মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাহিত্যিক নিদর্শনগুলির উল্লেখ করুন।

৩. প্রাচীন ভারতীয় ও মধ্যভারতীয় আর্যভাষার ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্যগুলি ব্যাখ্যা করুন।

৪. মধ্যভারতীয় আর্যভাষাকে কয়টি স্তরে ভাগ করা যায় ও কী কী? মধ্যভারতীয় আর্যভাষার যুগবিভাজনের ধারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

একক ৩ ❑ নব্যভারতীয় আর্যভাষা

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ নব্যভারতীয় আর্যভাষা কী

৩.৪ নব্যভারতীয় আর্যভাষার বর্গীকরণ

৩.৫ নব্যভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্য

৩.৬ ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনের ধারা

৩.৭ ভারতীয় আর্যভাষায় দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক গোষ্ঠীর প্রভাব

৩.৮ সারসংক্ষেপ

৩.৯ অনুশীলনী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ভারতীয় আর্যভাষার সর্বশেষ স্তর অর্থাৎ নব্যভারতীয় আর্যভাষা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবহিত হতে পারবে। পূর্বের দুটি এককে প্রাচীন ভারতীয় এবং মধ্যভারতীয় আর্যভাষা সম্পর্কে জ্ঞানলাভের পর এই নব্যভারতীয় আর্যভাষা, শিক্ষার্থীকে ভারতীয় আর্যভাষার সামগ্রিক ধারণা প্রদানে সাহায্য করবে।

৩.২ প্রস্তাবনা

বর্তমান এককের আলোচ্য বিষয়বস্তু নব্যভারতীয় আর্যভাষা। এই আর্যভাষার উদ্ভব, বর্গীকরণের বিবিধ মাত্রা, ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক এবং অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, ভারতীয় আর্যভাষায় দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক গোষ্ঠীর প্রভাব—এই এককের মূল ভরকেন্দ্র। নব্যভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব প্রসঙ্গে বোধগম্যতার সুবিধার্থে এই এককে একাধিক সারণি ব্যবহৃত হয়েছে।

আমরা এই অংশে নব্যভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর শ্রেণিবিন্যাস, অঞ্চলভিত্তিক বিভাজন এবং ভাষার নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রতিটি ভাষাগোষ্ঠীর সারণি প্রকাশের মাধ্যমে এই অংশে নব্যভারতীয় আর্যভাষার সামগ্রিক চেহারা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। নব্যভারতীয় আর্যভাষার স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য আলোচনাই এই এককের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা এই এককের শেষ পর্যায়ে ভারতীয় আর্যভাষায় তিন স্তরের ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

৩.৩ নব্যভারতীয় আর্যভাষা কী?

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর একটি শাখা হল ইন্দো-ইরানীয় শাখা। এই শাখাটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি উপশাখা ইরানে-পারস্যে এবং অন্য একটি উপশাখা ভারতে প্রবেশ করে। ভারতে প্রবিষ্ট উপশাখাটিই হল ভারতীয় আর্যভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা ও মধ্যভারতীয় আর্যভাষার যুগ পেরিয়ে ভারতে প্রচলিত আর্যভাষার বিবর্তনের তৃতীয় তথা শেষ ধাপ হল নব্যভারতীয় আর্যভাষা।

নব্যভারতীয় আর্যভাষা বলতে কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাষাকে বোঝায় না। আনুমানিক নবম-দশম খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল অবধি এর কালব্যাপ্তি। এই সময়কালে ভারতীয় আর্যভাষা থেকে যেসব নতুন ভাষার জন্ম হয়েছে, সেগুলিই এই নব্যভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, নব্যভারতীয় আর্যভাষা হল ইতিহাসের একটি পর্বের নাম। এই পর্বের ভারতীয় আর্যভাষাগুলি হল— বাংলা, হিন্দি, মারাঠি, অবধি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি ইত্যাদি।

৩.৪ নব্যভারতীয় আর্যভাষার বর্গীকরণ

ভাষাতাত্ত্বিকরা বিভিন্নভাবে নব্যভারতীয় আর্য ভাষার বর্গীকরণ বা শ্রেনিবিভাগ করেছেন। তার মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি বিভাজনই প্রধান—

ক) অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ বর্গীকরণ

খ) জন্ম-উৎসগত বা ঐতিহাসিক বর্গীকরণ

গ) ভৌগোলিক বর্গীকরণ

(ক) অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ বর্গীকরণ: Friedrich Hörnle অনুমান করেছিলেন যে, আর্যরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। প্রথমে আগত দলটি উত্তর ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। দ্বিতীয় দলটি এসে প্রথম দলের বাসভূমির কেন্দ্রে অনুপ্রবেশ করে এবং প্রথম দলটিকে তাদের বাসভূমি থেকে তাড়িয়ে দেয়। তখন প্রথম দলের আর্যরা দ্বিতীয় দলটিকে কেন্দ্রে রেখে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। Hörnle-এর এই অনুমানের ভিত্তিতে পরবর্তীকালে জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রথম-দলে-আগত আর্যদের ভাষা কেন্দ্রভূমির বাইরের ভাষা। অর্থাৎ, বহিরঙ্গ ভাষা বা outer language। আর, দ্বিতীয়-দলে-আগত আর্যদের ভাষা হল কেন্দ্রভূমির অভ্যন্তরের ভাষা অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ভাষা বা Inner language।

পরবর্তীকালে বহিরঙ্গ আর্যভাষা থেকে যেসব নতুন ভাষার জন্ম হয়, গ্রীয়ার্সন সেগুলিকে বহিরঙ্গ নব্যভারতীয় আর্যভাষা বলেছেন এবং অন্তরঙ্গ আর্যভাষা-থেকে-জাত নতুন ভাষাগুলোর নামকরণ করেছেন অন্তরঙ্গ নব্যভারতীয় আর্যভাষা। গ্রীয়ার্সনের এই শ্রেনিবিভাগকেই বলা হয় নব্যভারতীয় আর্যভাষার অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ বর্গীকরণ।

সারণি-১

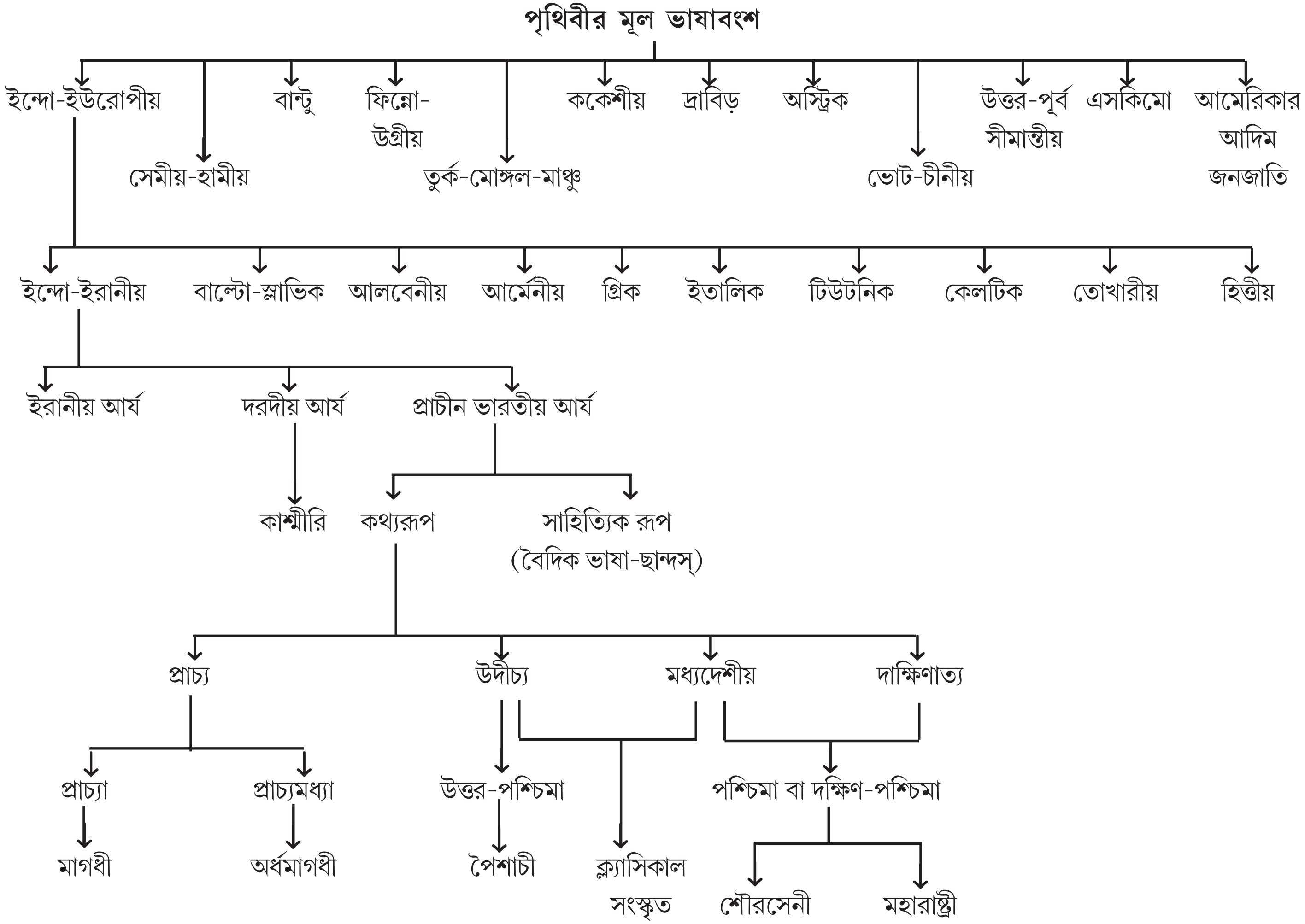

F:\Avik\Netaji\2025 New\5CC-BG-02 (CC-BG-02) E-Copy 5CC-BT-02 22.03.25

সারণি-২

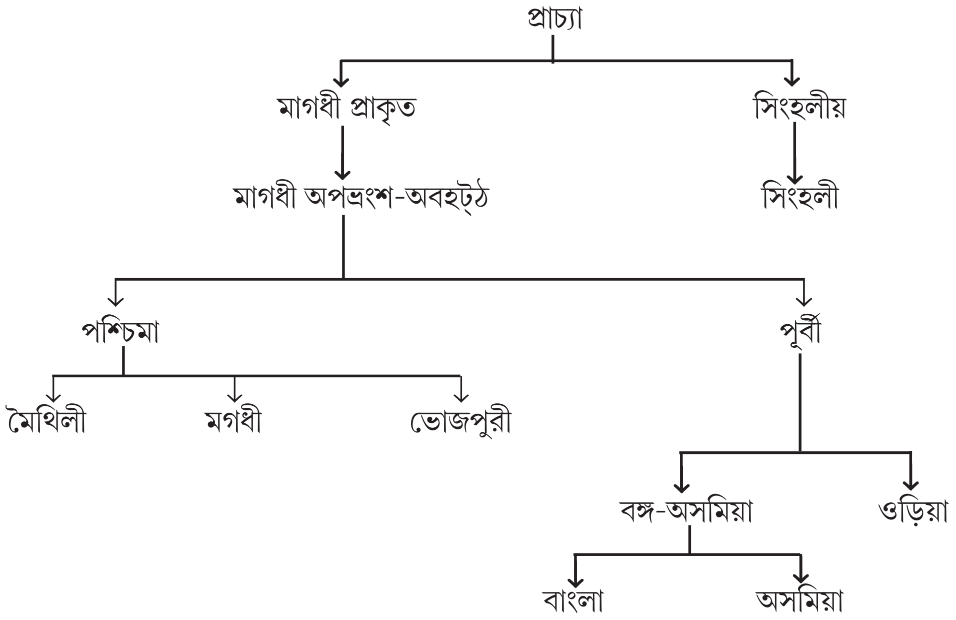

সারণি-৩

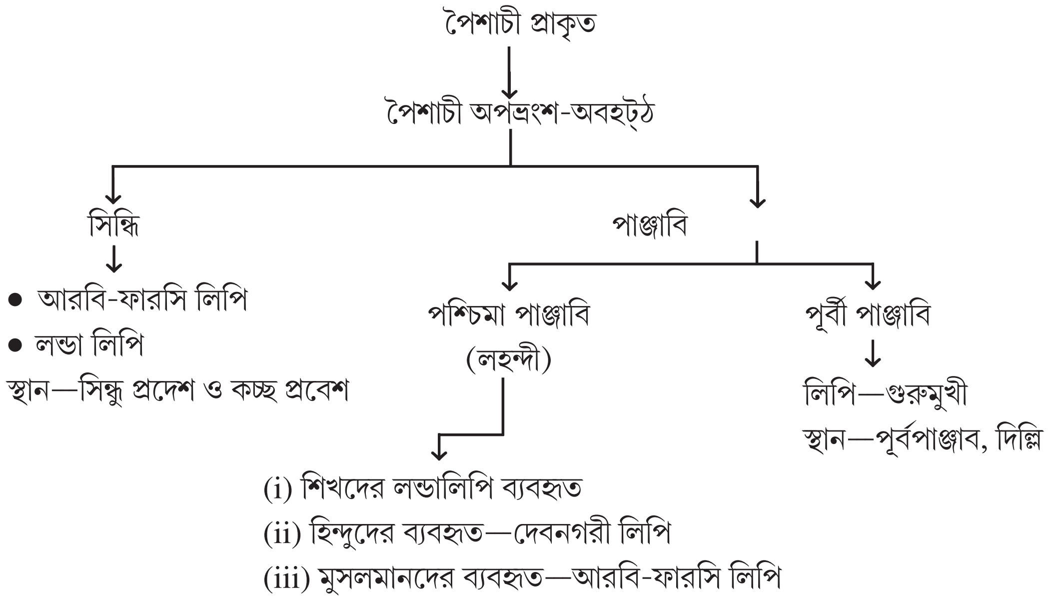

F:\Avik\Netaji\2025 New\5CC-BG-02 (CC-BG-02) E-Copy 5CC-BT-02 22.03.25

সারণি-৪

শৌরসেনী প্রাকৃত
- উত্তরা (পাহাড়ি)
  - গাড়োয়ালি
  - কুমায়ুনী
  - নেপালি ও গোর্খালি
- শৌরসেনী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ
  - মধ্যদেশীয়
    - কনৌজী → প্রাপ্তিস্থান—কান্যকুব্জ
    - বুন্দেলী → বুন্দেলখণ্ড
    - বঙ্গারু বা হরিয়ানী → দক্ষিণ-পূর্ব শান্তভাব ও হরিয়ানা
    - ব্রজভাষা → মথুরা, আগ্রা, আলিগড়
    - কথ্য হিন্দুস্থানি
      - হিন্দি → দিল্লি, মিরাট দেবনাগরী লিপি
      - উর্দু → আরবি, ফারসি লিপি
  - পশ্চিমা
    - রাজস্থানী
    - গুজরাটী

সারণি-৫

অর্ধমাগধী প্রাকৃত
↓
অর্ধমাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ
- অবধি
- বাঘেলী
- ছত্তিশগড়ী

সারণি-৬

মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত
↓
মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ
- মারাঠি → দেবনাগরীর ঈষৎ পরিবর্তিতরূপ বালবোধলিপি স্থান—মহারাষ্ট্র
- কোঙ্কনী → স্থান—গোয়া

অন্তরঙ্গ ভাষার অন্তর্ভুক্ত হল পশ্চিমা হিন্দি ও পাঞ্জাবি। আর, বহিরঙ্গ ভাষার মধ্যে পড়ে কাশ্মীরি, সিন্ধ্রি, বাংলা, ওড়িয়া, মারাঠি ইত্যাদি।

যদিও, পরবর্তীকালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গ্রীয়ার্সনের যুক্তিগুলি খণ্ডন করেন। গ্রীয়ার্সনের এই অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ বর্গীকরণটি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছেও আর গ্রহণযোগ্য নয়।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই মতামত খণ্ডন করেন দুটি যুক্তিতে—

- গ্রীয়ার্সনের মতে সকল বহিরঙ্গ ভাষার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে।

  যেমন—অপিনিহিতি। কিন্তু সুনীতিকুমার দেখান মারাঠি এবং সিন্ধি ভাষায় অপিনিহিতির কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না।

- গ্রীয়ারসনের মতে বহিরঙ্গের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি শুধু বহিরঙ্গ ভাষাতেই প্রাপ্ত। তার প্রভাব অন্তরঙ্গ ভাষাতে নেই। যেমন—বলা যায় স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয় এর ব্যবহার।

  কিন্তু সুনীতিকুমার দেখান পশ্চিমা হিন্দিতেও স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয়ের প্রয়োগ রয়েছে।

  যেমন—লড়কা লাড়কি।

(খ) জন্ম-উৎসগত বা ঐতিহাসিক বর্গীকরণ: নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলি মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে জাত হলেও বর্তমান স্তরে পৌঁছোনোর আগে তাদের নানাবিধ বিবর্তন ঘটেছে। ছকের মাধ্যমে সেই বিবর্তনগুলি পরিস্ফুট করা হল। ড. রামেশ্বর শ'-এর 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' থেকে সারণিটি গৃহীত।

(গ) ভৌগোলিক বর্গীকরণ: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুসরণে নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলোর বর্তমান অবস্থান বা প্রচলন-ক্ষেত্রের সঙ্গে ইতিহাসের যোগ রেখে তাদের ভৌগোলিক শ্রেণিবিভাগ করা যায় এইভাবে—

(১) উত্তর-পশ্চিমা (উদীচ্য): সিন্ধ্রি ও পাঞ্জাবি

(২) মধ্যদেশীয়: পশ্চিমা হিন্দি (অর্থাৎ কথ্য হিন্দুস্থানি, ব্রজভাষা, বুন্দেলি, বঙ্গারু ও কনৌজী), পূর্বী পাঞ্জাবি, রাজস্থানি, গুজরাটি।

(৩) প্রাচ্য: বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া, মৈথিলী, মগধী, ভোজপুরী

(৪) দাক্ষিণাত্য: মারাঠি ও কোঙ্কনী।

(৫) প্রাচ্য-মধ্য: অবধি, বাঘেলী, ছত্তিশগড়ী

(৬) উত্তরা বা হিমালয়ী: গোর্খালি ও নেপালি, কুমায়ুনী, গাড়োয়ালি।

৩.৫ নব্যভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্য

(ক) ধ্বনিতাত্ত্বিক:

১) মধ্যভারতীয় আর্যের যুগ্ম ব্যঞ্জন নব্যভারতীয় আর্যভাষায় একটিমাত্র ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হল এবং সেই ব্যঞ্জনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর পরিণত হল দীর্ঘস্বরে।

যেমন—পক্ক > পক্‌ক > পাক, দীর্ঘ > দিগ্‌ঘ > দীঘ, নৃত্য > নচ্চ > নাচ, মধ্য > মজ্‌ঝ > মাঝ, ক্ষুদ্র > খুদ্দ > খুদ ইত্যাদি।

২) যে যুক্তব্যঞ্জনের প্রথম ধ্বনি নাসিক্যব্যঞ্জন (ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্), সেই যুক্তব্যঞ্জনের নাসিক্য ব্যঞ্জনটি নব্যভারতীয় আর্যভাষায় লোপ পেয়েছে এবং তার পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ স্বরধ্বনি হয়ে অনুনাসিক হয়ে গেছে।

যেমন— কণ্টক > (প্রাকৃত) কণ্টঅ > বাংলা কাঁটা, পঞ্চ > পাঁচ, দন্ত > দাঁত ইত্যাদি।

৩) পদমধ্যগত 'ই (ঈ) + অ (আ)' এবং 'উ (ঊ) + অ (আ)' যথাক্রমে 'ই (ঈ)' এবং 'উ (ঊ)' হয়েছে।

যেমন— সং-ঘৃত > প্রা-ঘিঅ > ঘি; মৃত্তিকা > মাট্টিআ > মাটি।

৪) নব্যভারতীয় আর্যভাষায় পদান্ত স্বরধ্বনি প্রায়ই লুপ্ত হয়েছে অথবা বিকৃত হয়েছে। যেমন— সংস্কৃত 'রাম' (র্ + আ + ম্ + আ) > বাংলা বা হিন্দিতে 'রাম্' (র্ + আ + ম্)। ঠিক সেভাবেই 'অগ্নি' পরিবর্তিত হয়ে হিন্দিতে 'আগ্' বা 'দধি' থেকে 'দহী' হয়েছে। অবশ্য ওড়িয়া ভাষায় পদান্তিক স্বরধ্বনি রক্ষিত হয়েছে।

যেমন, ওড়িয়া ভাষায় 'রাম' উচ্চারিত হয় এভাবে—(র্ + আ + ম্ + অ)।

(খ) রূপতাত্ত্বিক:

১) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় শব্দের লিঙ্গ নির্ণয় করা হত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পদান্তিক স্বরধ্বনি অনুসারে। যেমন— 'ঈ'-কারান্ত শব্দ 'নদী' হল স্ত্রী লিঙ্গ। 'আ'-কারান্ত শব্দ 'লতা' হল স্ত্রী লিঙ্গ। পদান্তে অবস্থিত স্বরধ্বনি বিকৃত বা লুপ্ত হওয়ায় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় শব্দের লিঙ্গবিধি নব্যভারতীয় আর্যভাষায় বজায় থাকেনি। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় শব্দের লিঙ্গ নির্ধারিত হত অনেকক্ষেত্রে অর্থ নিরপেক্ষভাবে এবং শব্দের গঠন অনুসারে। ফলে অপ্রাণীবাচক শব্দও কখনো কখনো ক্লীবলিঙ্গ না হয়ে স্ত্রীলিঙ্গ বা পুং লিঙ্গ হয়েছে। যেমন, সংস্কৃতে 'লতা' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। কিন্তু

অনেক নব্যভারতীয় আর্যভাষায় লিঙ্গ নির্ধারিত হয় শব্দের অর্থ অনুসারে। যেমন— বাংলা ভাষায় পুরুষবোধক শব্দ পুং লিঙ্গ, স্ত্রীবোধক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, এবং অপ্রাণীবাচক শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। বাংলায় 'লতা' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

পাশাপাশি, কোনো কোনো নব্যভারতীয় আর্যভাষায় শব্দের লিঙ্গ অর্থনিরপেক্ষ হলেও সংস্কৃতের লিঙ্গ-বিধি থেকে তা স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়াল। যেমন, সংস্কৃতে 'দধি' শব্দ ছিল ক্লীবলিঙ্গ। কিন্তু নব্যভারতীয় আর্যভাষা হিন্দিতে 'দধি' থেকে জাত শব্দ 'দহী' হল পুংলিঙ্গ, সিন্ধ্রিতে 'দহী' স্ত্রীলিঙ্গ, মারাঠিতে 'দহি' ক্লীবলিঙ্গ। সংস্কৃত 'রশ্মি' পুংলিঙ্গ, কিন্তু হিন্দি 'রশ্মি' স্ত্রীলিঙ্গ।

২) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় প্রত্যেক কারকের সুনির্দিষ্ট বিভক্তি ছিল। শব্দের সঙ্গে সেইসব বিভক্তি যুক্ত হওয়ায় প্রায় প্রত্যেক কারকে শব্দের স্বতন্ত্র রূপ হত। কিন্তু নব্যভারতীয় আর্যভাষায় এই বিভক্তিগুলি প্রায় সবই লুপ্ত হল। কিছু কিছু অনুসর্গের অবক্ষয়িত রূপ বিভক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয় নব্যভারতীয় আর্যভাষায়।

যেমন— অনুসর্গ 'কৃত' > বাংলা 'কে', হিন্দি 'কো'-তে পরিণত হল। যেমন— বাংলায় 'রামকে', হিন্দিতে 'রামকো' ইত্যাদি।

৩) শব্দরূপের বিচারে নব্যভারতীয় আর্যভাষায় কারক হল দু'টি— মুখ্যকারক বা কর্তৃকারক এবং গৌণকারক বা তীর্যককারক। সংস্কৃতে কর্তৃকারকের নিজস্ব বিভক্তি ছিল প্রথমা বিভক্তি। নব্যভারতীয় আর্যে প্রথমায় প্রায়ই শূন্য বিভক্তি দেখা যায়। এছাড়া তৃতীয়ার অবক্ষয়জাত বিভক্তিও নব্যভারতীয় আর্যে কর্তৃকারকে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

যেমন— সংস্কৃতে অনুক্ত কর্তায় যে-তৃতীয়া বিভক্তির প্রচলন ছিল, থেকে বাংলায় কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তির প্রচলন বলে অনেকে মনে করেন। সংস্কৃত 'পুত্রেণ খাদ্যতে' > অপভ্রংশ 'পুত্তে খাইঅই' > বাংলা 'পুতে খায়'।

৪) অধিকাংশ নব্যভারতীয় আর্যভাষায় একবচন ও বহুবচনের রূপভেদ থাকল না। বহুত্ববাচক পৃথক শব্দ দিয়ে অথবা ষষ্ঠী বিভক্তির অবক্ষয়িত রূপ দিয়ে বহুবচন নির্দেশ করা হয়।

যেমন— বাংলায় পুরুষ + এর (ষষ্ঠী বিভক্তি) = পুরুষের > পুরুষেরা।

৫) নব্যভারতীয় আর্যভাষায় একাধিক ধাতুর সংযোগে গঠিত যৌগিক কালের রূপ দেখা দিল। যেমন— বাংলা √কর্ + ইয়া (এ) + √আছ্ + এ = করেছে। এখানে √কর্ ও √আছ্—দুই ধাতু মিলে একটি ক্রিয়া তৈরি করেছে।

৬) নব্যভারতীয় আর্যভাষায় ক্রিয়ারূপের সরলীকরণ ঘটেছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ক্রিয়ার পাঁচটি ভাব ও পাঁচটি কালে ক্রিয়ারূপের বৈচিত্র্য সাধিত হত পৃথক পৃথক বিভক্তি যোগ করে। নব্যভারতীয় আর্যভাষায় এসে শুধু কর্তৃবাচ্য ও কর্মভাববাচ্যে বর্তমানের বিভক্তি ঘটিত রূপ-স্বাতন্ত্র্য বজায় আছে। ক্রিয়ার ভাবের ক্ষেত্রে বর্তমান কালের নির্দেশক ও অনুজ্ঞায় স্বতন্ত্র রূপ রক্ষিত হয়েছে। সর্বত্র নিষ্ঠা প্রত্যয়যোগে অতীতকালের এবং কখনো কখনো কৃত্য ('-তব্য') অথবা 'শতৃ' প্রত্যয়যোগে ভবিষ্যৎকালের পদ নিষ্পন্ন হয়েছে।

যেমন— 'চলিত' (√চল্) > বাংলায় 'চলি'।

৭) নব্যভারতীয় আর্যভাষায় মূল ধাতুর (নিষ্ঠা অথবা শতৃ প্রত্যয়জাত) অসমাপিকার সঙ্গে 'অস্', 'ভূ' অথবা 'স্থা' ধাতুর পদ ব্যবহার করে যৌগিককালের ব্যবহার দেখা যায়।

যেমন— গত + √অস্ > গিয়াছে।

(গ) অন্বয়তাত্ত্বিক:

১) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যে গঠিত বাক্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল। নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলোতেও কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের গঠনে পার্থক্য আছে। তবে ঐতিহাসিক বিচারে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতীয় আর্যের কর্মবাচ্য পরিবর্তিত হয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নব্যভারতীয় আর্যে কর্তৃবাচ্যে পরিণত হয়েছে।

যেমন— অস্মাভিঃ পুস্তিকা পঠিতা (কর্মবাচ্য) > আমি পুথি পড়ি (কর্তৃবাচ্য)।

২) বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদের স্বতন্ত্র বিভক্তি চিহ্ন নব্যভারতীয় আর্যভাষায় অনেকক্ষেত্রে লোপ পেয়েছে। ফলে বাক্যে পদের অবস্থানটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেকারণে বাক্যে অনেকক্ষেত্রে কর্তা, কর্ম ইত্যাদি পদের স্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে। এই স্থান পরিবর্তন করে দিলে বাক্যের অর্থ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

যেমন— 'মানুষ কোনো কোনো বন্যপ্রাণী খায়'—এই বাক্যে 'মানুর্ষ' কর্তা, 'বন্যপ্রাণী' হল কর্ম। কিন্তু এই দুইয়ের অবস্থান পরিবর্তন করলে বাক্যটি হবে—'কোনো কোনো বন্যপ্রাণী মানুষ খায়।' এ'দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থের বাক্য।

৩.৬ ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনের ধারা

প্রাচীন, মধ্য, নব্যভারতীয় আর্যভাষা নানা পরিবর্তনের ধারায় আধুনিক রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। আমরা এই অংশে আর্য ভাষাগুলির ধারাবাহিক বিবর্তনের ধারা বোঝাবার চেষ্টা করব। মূলত প্রাচীন, মধ্য এবং নব্যভারতীয় আর্যভাষার পরিবর্তনের ধারাটি আলোচনার সূত্রে, তিন স্তরের আর্যভাষা এবং ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতের কিছু বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্য এখানে তুলে প্রদর্শিত হবে।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি

OIA (প্রাচীন ভারতীয় আর্য)	**ক্লাসিকাল সংস্কৃত**	**MIA (মধ্যভারতীয় আর্য)**
OIA তে প্রায় সমস্ত স্বরধ্বনি, ব্যঞ্জনধ্বনির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। স্বরধ্বনির ঋ, ঌ, ঐ, ঔ এবং ব্যঞ্জনধ্বনি শ, স, ষ-এর স্পষ্ট ব্যবহার লক্ষণীয়।	এই পর্যায়ে প্রায় সবগুলি ধ্বনির স্বরূপ রক্ষিত হয়। কিন্তু ঌ এর ব্যবহার দেখা যায় না।	এই পর্যায়ে ঌ এর লোপ পায়। ঋ পরিণত হয় অ/ই/উ/এ-তে যেমন—মৃগ > মগ, মিগ, মুগ। ঋ কখনো র/রি/রু তে পরিণত হয়েছে। যেমন—মৃগ > ম্রিগ, ম্রুগ, ঋষি > রিসি। ‘ঐ’ পরিণত হয়েছে ‘এ’ তে। যেমন— ধর্মানুশস্তে > ধর্মানুসথিয়ে।

স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি

OIA (প্রাচীন ভারতীয় আর্য)	MIA (মধ্যভারতীয় আর্যভাষা)	NIA (নব্যভারতীয় আর্যভাষা)
এই পর্যায়ে ক্র, ক্ল, ক্ত, ক্ষ্ম, র্ম, র্দ্ধ, ষ্ট্র, ৎস্ন ব্যবহৃত হত।	এই পর্বে সমীভবন লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ যুক্তব্যঞ্জন সমব্যঞ্জনে পরিণত হয়। যেমন—ভক্ত > ভত্ত, ধর্ম > ধম্ম। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় বিপ্রকর্ষও লক্ষ করা যায়। একে আমরা মধ্যস্বরাগমও বলি। উদাহরণ—দ্বাদশ > দুবাদশ। আদিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জন লোপ পায় ত্রিনি > তিন্নি।	এই পর্যায়ে সমব্যঞ্জন লোপ পায় এবং দীর্ঘিভবন ঘটে। MIA তে সমব্যঞ্জন তৈরি হয়, NIA তে সমব্যঞ্জন লোপ পায় এবং দীর্ঘীভবন ঘটে। যেমন—নৃত্য > নচ্চ > নাচ হস্ত > হত্থ > হাত ভক্ত > ভত্ত > ভাত যুগ্মব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে নাসিক্যধ্বনিটি লোপ পায় এবং আনুনাসিক প্রভাব যুক্ত হয়। যেমন—কণ্টক > কন্টঅ > কাঁটা।
শব্দের শেষে প্রায়শই ং, ঃ এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়।	ঃ লোপ পায়। যেমন—জনঃ, - জনো - জনে ং রক্ষিত হয়।	নব্য ভারতীয় আর্যভাষার স্তরে ং এর উচ্চারণ পরিবর্তিত হয়। উত্তর ভারতে ন, দক্ষিণ ভারতে ম, মহারাষ্ট্র গুজরাটে বঁ, বাংলা-আসাম-উড়িষ্যার ঙ তে পরিণত হয়।

কারক বিভক্তি

OIA (প্রাচীন ভারতীয় আর্য)	MIA (মধ্যভারতীয় আর্যভাষা)	NIA (নব্যভারতীয় আর্যভাষা)
OIA তে ছয়টি কারকই ব্যবহৃত হত। কর্তা, কর্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ, সম্প্রদান। সুকুমার সেনের মতে 'ছান্দস'-এ সম্বন্ধ পদের সঙ্গে ক্রিয়াপদের সম্পর্ক স্বীকৃতি পেয়েছিল। এই পর্যায়ে প্রত্যেকটি কারকের নিজস্ব বিভক্তি চিহ্ন ছিল।	MIA তে কারকের সুনির্দিষ্ট বিভক্তিচিহ্ন লোপ পায়। যেমন কর্ম ও কর্তৃ কারক এবং করণ ও অধিকরণ কারকের বিভক্তি চিহ্ন একই।	NIA তে বিবিধ অনুসর্গের ব্যবহার লক্ষ করা হয়।

লিঙ্গ

OIA (প্রাচীন ভারতীয় আর্য)	**MIA (মধ্যভারতীয় আর্যভাষা)**	**NIA (নব্যভারতীয় আর্যভাষা)**
এই স্তরে পুং, স্ত্রী এবং ক্লীব এই তিন প্রকার লিঙ্গের ব্যবহার লক্ষণীয়। এই পর্যায়ে লিঙ্গভেদ অর্থগত নয় ব্যাকরণগত। যেমন --- লতা, নদী এগুলি ক্লীবলিঙ্গ নয় স্ত্রীলিঙ্গ।	এই স্তরে স্ত্রীলিঙ্গের নির্দিষ্ট প্রত্যয় ঈ। এই পর্যায়ে বেশকিছু স্ত্রীলিঙ্গবাচক প্রত্যয় পুংলিঙ্গের প্রত্যয় হিসেবে কাজ করেছে। যেমন—হরিনা, শবরা, এগুলি পুংলিঙ্গবাচক শব্দ।	এই স্তরে অর্থ অনুসারে লিঙ্গ নির্ণয়ের প্রক্রিয়া চালু হয়। অনেক ভাষায় লিঙ্গ বিশেষে ক্রিয়া রূপের বদল ঘটতে শুরু করে। যেমন—লেড়কা - করতা লেড়কি - করতি। ক্লীবলিঙ্গবাচক শব্দের ক্ষেত্রেও এই পার্থক্য লক্ষণীয়। যেমন—‘বাস করতা’, আর ‘লড়ি করতি’

বচন

OIA (প্রাচীন ভারতীয় আর্য)	**MIA (মধ্যভারতীয় আর্যভাষা)**	**NIA (নব্যভারতীয় আর্যভাষা)**
OIA তে একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন তিন প্রকার বচনই ব্যবহৃত হয়। নির্দিষ্ট জোড়া প্রাণীর ক্ষেত্রে দ্বিবচন ব্যবহৃত হয়। যেমন— পিতা-মাতা। প্রত্যেক বচনের ক্ষেত্রে শব্দরূপ, ক্রিয়ারূপ আলাদা হয়।	MIA দ্বিবচনের ব্যবহার লোপ পায়। দ্বিবচন বহুবচনে পরিণত হয়। দ্বিবচনের ধারণা ক্ল্যাসিকাল সংস্কৃতির স্তর পর্যন্তই লক্ষণীয়।	NIA বচন অনুযায়ী ক্রিয়ারূপের পার্থক্যের প্রবণতা লোপ পায়। যেমন— আমি যাই, আমরা যাই ইত্যাদি।

ক্রিয়ার ভাব

OIA (প্রাচীন ভারতীয় আর্য)	MIA (মধ্যভারতীয় আর্যভাষা)	NIA (নব্যভারতীয় আর্যভাষা)
OIA তে পাঁচ রকম ক্রিয়ার ভাব লক্ষণীয়। যথা---অভিপ্রায়, নির্দেশক, অনুজ্ঞা, সম্ভাবক বা বিধিলঙ, নির্বন্ধ। এই স্তরে ক্রিয়ার ভাব অনুসারে ক্রিয়া রূপের পার্থক্য দেখা যায়।	MIA তে অভিপ্রায় আর নির্বন্ধের প্রয়োগ লুপ্ত। ভাব অনুসারে ক্রিয়ারূপের অভিনবত্ব কমে আসতে থাকে। অতীত ও বর্তমানে ভাব অনুযায়ী রূপ পরিবর্তন লক্ষণীয়।	NIA তে শুধুমাত্র বর্তমানকালে নির্দেশক ও অনুজ্ঞার স্বতন্ত্র রূপ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—সে যায় (নির্দেশক), সে যাক (অনুজ্ঞা)

ছন্দ

OIA (প্রাচীন ভারতীয় আর্য)	MIA (মধ্যভারতীয় আর্যভাষা)	NIA (নব্যভারতীয় আর্যভাষা)
এই পর্যায়ে অক্ষরমূলক ছন্দ বা বৃত্তছন্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। দল বা অক্ষরের সংখ্যা ও লঘুগুরুর ওপর নির্ভর করে ছন্দ নির্ণীত হত।	এই স্তরে অক্ষরের সংখ্যা নয়, মাত্রা ভিত্তিক ছন্দগণনার প্রভাব লক্ষণীয়। অন্ত্যানুপ্রাস বা পংক্তিমিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়।	এই পর্বে মাত্রাভিত্তিক ছন্দ গণনা পদ্ধতির ব্যবহারই লক্ষণীয়। এছাড়াও সমমাত্রিক চরণ, অন্ত্যানুপ্রাসের প্রকাশ দেখা যায়।

৩.৭ ভারতীয় আর্যভাষায় দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক গোষ্ঠীর প্রভাব

দ্রাবিড় প্রভাব: আর্যভাষীরা যখন ভারতে আসে, তখন এদেশে দ্রাবিড় ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। শুধু দক্ষিণ ভারতে তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম, কন্নড় বা কানাড়ী, টোডা, কোটা, কোডগু, টুলু-ই নয়; উত্তর ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশেও-যে তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব ছিল, তার প্রমাণ হল বালুচিস্তানের ব্রাহুই ভাষা। তাই ভারতীয় আর্যভাষায় দ্রাবিড়ীয় প্রভাব ক্রমবর্ধমান হতে থাকে।

সম্ভবত অর্বাচীন বেদ এবং ক্ল্যাসিকাল বা ধ্রুপদী সংস্কৃত যুগের মধ্যবর্তী স্তরে প্রাচীন ভারতীয়

আর্যভাষায় (OIA) দ্রাবিড় শব্দের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটে। ঋগ্বেদে কিছু দ্রাবিড় শব্দ মেলে। যেমন— 'ময়ূর', 'কটুক', 'কুণ্ড', 'খল', 'দণ্ড', 'পিণ্ড', 'বল', 'বিল', 'উলূখল' ইত্যাদি। পরবর্তী সংহিতা যুগেও কিছু নতুন শব্দ মেলে। যেমন, অথর্ববেদে 'তূল', 'বিল্ব', 'মূসল' ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ-এও এই জাতীয় অনুপ্রবেশ লক্ষ করা যায়। যেমন, শতপথ ব্রাহ্মণে 'অর্ক', 'অলস', 'পণ্ডিত' ইত্যাদি। বৈদিক ভাষায় এইরকম আরও দ্রাবিড় শব্দের সন্ধান মেলে। যেমন— 'অণু', 'অরণি', 'কপি', 'কাল', 'কলা', 'গণ', 'নানা', 'নীল', 'পুষ্প', 'পূজা', 'বীজ', 'রাত্রি' ইত্যাদি।

অনেকে মনে করেন, ভারতীয় আর্যভাষার মূর্ধণ্য ধ্বনি ('ট্', 'ঠ্', 'ড্', 'ঢ্', 'ণ্') দ্রাবিড়ীয় প্রভাবে উৎপন্ন। ড. সুকুমার সেনের মতে, এ নেহাত অনুমান মাত্র। তাঁর মতে, ভারতবর্ষে আসার আগেই 'ষ' ধ্বনিটির উদ্ভব হয়েছিল। দ্রাবিড় প্রভাব ছাড়াও অন্যত্র যেমন, সুইডিশ ভাষায় দন্ত্যধ্বনি থেকে মূর্ধন্য ধ্বনি আপনিই উৎপন্ন হয়েছে।

সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণে দ্রাবিড়ীয় প্রভাব পড়েছে গৃহীত শব্দাবলির মাধ্যমে। খ্রি. ৫ম শতকের আগে দ্রাবিড় ভাষার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না। অথচ তখনই দ্রাবিড় ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব প্রকট এবং সংস্কৃতে দ্রাবিড় শব্দ প্রচুর প্রবিষ্ট। প্রাকৃত ভাষায় সমাপিকা ক্রিয়ার জায়গায় নামপদের (নিষ্ঠান্ত ও শত্রন্ত) ব্যবহারে হয়ত কিছু দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব থাকতে পারে। দ্রাবিড় প্রভাবের সাক্ষাৎ ফল পাওয়া যায় সংস্কৃত শব্দকোষে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মধ্যে প্রচুর দ্রাবিড়ীয় শব্দ সংস্কৃতে গৃহীত হয়েছিল।

কেউ কেউ মনে করেন যে, বাংলায় শব্দরূপে বহুবচনের 'গুলা', '-গুলি' বিভক্তি আসলে তামিল ভাষার বহুবচন '-গল' বিভক্তি থেকে উদ্ভূত। কিন্তু ড. সুকুমার সেন এই মতকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি। কারণ, বাংলায় ওগুলি বিভক্তি নয়— একটি বিশিষ্ট শব্দ এবং পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের আগে তা বহুত্ববাচক সমাসবদ্ধ পদে পরিণত হয়নি। ফলে, বাংলা ভাষার উদ্ভবের আগে অথবা পরে কোনো দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না।

অস্ট্রিক প্রভাব: অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা একসময় সমগ্র উত্তর ও মধ্যভারতে প্রচলিত ছিল। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, এই অস্ট্রিক ভাষা ভারতীয় আর্যভাষাকে, বিশেষত নব্যভারতীয় আর্যভাষাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল। এই ভাষাগুলির কোনোটাই উন্নত নয় এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে কোনোটিরই লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায় না।

নৃতাত্ত্বিকদের অনুমানে, আমাদের আচারে-বিচারে এবং জীবনদৃষ্টিভঙ্গিতে আর্যপূর্ব কোনো জাতির, হয়ত অস্ট্রিক গোষ্ঠীর গভীর ও দৃঢ় প্রভাব আছে। ড. সুকুমার সেনের মতে, 'যথেষ্ট উপকরণের অভাবে ভাষাগত প্রভাব নির্ণয় করা দুর্ঘট।' বৈদিক কাল থেকে অস্ট্রিক ভাষার অনেক শব্দ আর্যভাষা গ্রহণ করেছে বলে অনুমান করা হয়। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারের অধিকাংশ দেশি শব্দ অস্ট্রিক ভাষা থেকে নেওয়া বলে

অনুমান করা হয়। যেমন, 'খড়', 'খুঁটি', 'ঝিঙ্গা', 'চিঙ্গড়ি', 'ঢেঁকি', 'ডিঙ্গা', 'ডিম্ব', 'ঢিল', 'ঢিপি', 'মুড়ি' ইত্যাদি। 'খোকা', 'খুকি', 'কুড়ি' (বিশ অর্থে) ইত্যাদি শব্দও অস্ট্রিক ভাষাজাত। 'বঙ্গ' নামটিও হয়ত এই সূত্রেই আগত। সংস্কৃতেও কোনো কোনো বিশিষ্ট শব্দ অস্ট্রিক ভাষা থেকে আগত। যেমন, 'নারিকেল', 'তাম্বুল', 'কদলী', 'অলাবু' ইত্যাদি।

৩.৮ সারসংক্ষেপ

এই একক পাঠের ফলে শিক্ষার্থীরা নব্যভারতীয় আর্যভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবে। এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষার প্রাপ্তিস্থান, নিদর্শন, বিভাজনের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে সারণির মাধ্যমে। এই একক পাঠের ফলে নব্যভারতীয় আর্যভাষায় অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষার প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে।

এই সূত্রেই প্রাচীন, মধ্য এবং নব্যভারতীয় আর্যভাষার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে এই অংশে।

৩.৯ অনুশীলনী

অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী:

১. নব্যভারতীয় আর্যভাষার আনুমানিক কালব্যাপ্তিটি উল্লেখ করুন।

২. তিনটি নব্যভারতীয় আর্যভাষার নামোল্লেখ করুন।

৩. বহিরঙ্গ ভাষা কী?

৪. অন্তরঙ্গ ভাষা কাকে বলে?

৫. ইন্দো-ইরানীয় ভাষাবংশের কয়টি শাখা ও কী কী?

৬. দাক্ষিণাত্যের দুটি ভাষার নামোল্লেখ করুন।

৭. নব্যভারতীয় আর্যভাষায় পদান্ত স্বরধ্বনিলোপের একটি উদাহরণ দিন।

৮. দু'টি দ্রাবিড় ও দু'টি অস্ট্রিক শব্দের উদাহরণ দিন।

৯. কোন্ ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাবে ভারতীয় আর্যভাষায় মূর্ধন্য ধ্বনি উৎপন্ন হয়?

১০. পশ্চিমা পাঞ্জাবি কোন্ ভাষাগোষ্ঠী থেকে আগত?

১১. পশ্চিমা পাঞ্জাবির অন্তর্গত দুটি লিপির নাম লিখুন।

১২. গুরমুখী লিপির নির্দশন কোন্ অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়?

১৩. ঋগ্বেদে উল্লিখিত কয়েকটি দ্রাবিড় শব্দের উদাহরণ দিন।

১৪. প্রাচ্য-মধ্য শাখার অন্তর্গত দুটি ভাষার নাম উল্লেখ করুন।

১৫. বঙ্গারু বা হরিয়ানী ভাষা কোন্ অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী:

১. নব্যভারতীয় আর্যভাষা বলতে কী বোঝেন?

২. নব্যভারতীয় আর্যভাষার অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ বর্গীকরণকে কতদূর সমর্থনযোগ্য বলে মনে করেন?

৩. ভোজপুরী ভাষার উদ্ভবটি রেখাচিত্রের সাহায্যে বুঝিয়ে দিন।

৪. টীকা লিখুন: শৌরসেনী প্রাকৃত।

৫. নব্যভারতীয় আর্যভাষার ভৌগোলিক বর্গীকরণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৬. নব্যভারতীয় আর্যভাষার উল্লেখযোগ্য ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি কী?

৭. নব্যভারতীয় আর্যভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণযোগে আলোচনা করুন।

৮. বাংলা ভাষার আবির্ভাবের ধারাটি আলোচনা করুন।

৯. বাংলা শব্দভাণ্ডারে অস্ট্রিক ভাষার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১০. ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তরে যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহারের বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

রচনাধর্মী:

১. নব্যভারতীয় আর্যভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

২. প্রাচীন, মধ্য ও নব্যভারতীয় আর্যভাষার একটি তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৩. ভারতীয় আর্যভাষায় অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রভাব কতখানি?

৪. নব্যভারতীয় আর্যভাষাকে কীভাবে বর্গীকরণ করা যায়, তা আলোচনা করুন।

৫. ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তরে রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের বিবর্তনের ধারা আলোচনা করুন।

৬. নব্যভারতীয় আর্যভাষার বর্গীকরণ বিষয়ে সকল ভাষাবিজ্ঞানীগণই কি সহমত? যদি মতভেদ থাকে, তবে সেই প্রসঙ্গে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

একক ৪ ❑ বাংলা ভাষার উদ্ভব

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ বাংলা ভাষার উদ্ভব

৪.৪ সারসংক্ষেপ

৪.৫ অনুশীলনী

৪.১ উদ্দেশ্য

আমরা পূববর্তী অধ্যায়গুলিতে ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই আলোচনার ধারায় দেখতে পেয়েছি নবভারতীয় আর্যভাষার স্তরে প্রাচ্য শাখার মাগধী অপভ্রংশের পূর্বী শাখা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম। আমরা এই এককে বাংলা ভাষার জন্মের এই ধারাটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে জানতে পারবে।

৪.২ প্রস্তাবনা

পৃথিবীর মোট বারোটি ভাষাবংশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে কীভাবে ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব ঘটেছে, তা পূর্ববর্তী এককগুলিতে আগেই আলোচিত হয়েছে। বর্তমান এককে ভারতীয় আর্যভাষার সর্বশেষ স্তর অর্থাৎ নব্যভারতীয় আর্যভাষা থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভবের ধারাটি প্রদর্শিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার সুবিধার্থে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ সারণি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে যাতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে বাংলা ভাষার উৎসের ধারাবাহিকতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৪.৩ বাংলা ভাষার উদ্ভব

আগেই বলা হয়েছে, পৃথিবীর সমস্ত ভাষাকে তাদের মূলীভূত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে প্রধানত বারোটি ভাষাবংশে বিভক্ত করা হয়। সেই ভাষাবংশের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষাবংশ। কারণ, প্রথমত এই ভাষাবংশ-থেকে-জাত আধুনিক ভাষাগুলি পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিশেষত ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশ স্থানে প্রচলিত আছে। দ্বিতীয়, শুধু ভৌগোলিক বিস্তারে নয়, এই ভাষাবংশ থেকে জাত প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাগুলি সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

F:\Avik\Netaji\2025 New\5CC-BG-02 (CC-BG-02) E-Copy 5CC-BT-02 22.03.25

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে মোট দশটি শাখার জন্ম হয়। এই শাখাগুলির মধ্যে শুধু ইন্দো-ইরানীয় জনগোষ্ঠী নিজেদের 'আর্য' নামে অভিহিত করত বলে, অনেকে শুধু ইন্দো-ইরানীয় শাখাটিকে সংকীর্ণ অর্থে আর্য শাখা বলে থাকেন। যদিও ব্যাপক অর্থে সমগ্র ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশকেই আর্য ভাষাবংশ বলা হয়।

ইন্দো-ইরানীয় শাখাটি দুটি উপশাখায় বিভক্ত হয়ে যায়— ইরানীয় ও ভারতীয় আর্য। ইরানীয় উপশাখাটি ইরান-পারস্যে চলে যায়। আর, ভারতীয় আর্য উপশাখাটি ভারতে প্রবেশ করে আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের বিস্তৃতিকে ধারণ করে আছে এই আর্যভাষা।

প্রাচীন ভারতীয়, মধ্যভারতীয় স্তর পেরিয়ে আর্যভাষা উপনীত হয় তৃতীয় স্তর বা নব্যভারতীয় আর্যভাষায়। সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্‌ঠের পরে এই ভাষা তৃতীয় স্তরে এসে একাধিক নব্যভারতীয় আর্যভাষার জন্ম দিল। যেমন— পৈশাচী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে পাঞ্জাবি, মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে মারাঠী, শৌরসেনী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে হিন্দি, অর্ধমাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে অবধি, মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ থেকে বাংলা ইত্যাদি ভাষার জন্ম হল।

অনেকেই মনে করেন, সংস্কৃত থেকেই বাংলা তথা ভারতের অন্যান্য আধুনিক ভাষাগুলির জন্ম। কিন্তু এই অনুমান ভ্রান্ত। কারণ, সংস্কৃত ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্যবংশের ভাষা। কিন্তু ভারতে আর্য-পূর্ব অস্ট্রিক, দ্রাবিড় বংশের ভাষা যেমন, তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম ইত্যাদি কখনোই সংস্কৃত-জাত নয়। দ্বিতীয়ত: পাঞ্জাবি, মারাঠি, হিন্দি, অবধি, বাংলা ইত্যাদি যেসব আধুনিক ভারতীয় ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য ভাষাবংশ থেকে জাত, সেগুলোর জন্মও ঠিক সংস্কৃত থেকে হয়নি।

সূক্ষ্ম বিচারে সংস্কৃত হল বৈদিকের পরবর্তী একটি সাহিত্যিক ভাষা— যা পরে মৃত ভাষায় পরিণত হয়। ফলে, জীবন্ত ভাষার মতো তার কোনো বিবর্তন হয়নি এবং তা থেকে কোনো ভাষার জন্ম হয়নি। বস্তুত, বৈদিক ভাষাই ছিল জীবন্ত ভাষা। এরই কথ্যরূপ নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা-সহ অন্যান্য নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলির জন্ম দিয়েছে। কাজেই, নব্যভারতীয় আর্যভাষাগুলির অব্যবহিত জন্ম-উৎস হল বৈদিক ভাষার কথ্যরূপ থেকে জাত মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার শেষ স্তর বিভিন্ন অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ভাষা।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের প্রাচীন স্তর থেকে নানা পর্যায় পেরিয়ে কীভাবে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে, তা একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হল।

বাংলা ভাষার জন্ম-উৎস

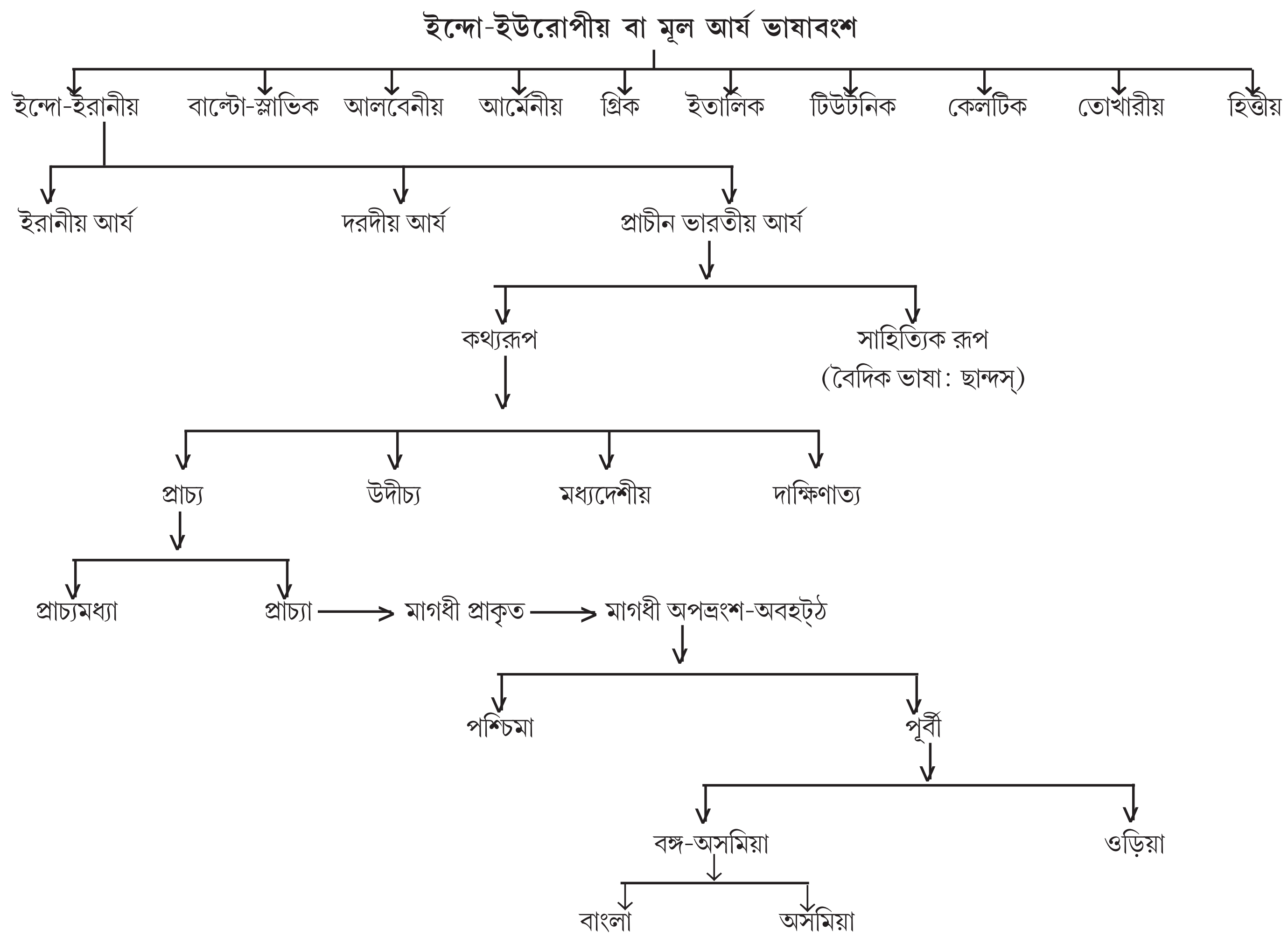

পূর্বোক্ত বৃক্ষচিত্রটি বিশ্লেষণ করলে আমরা পৃথিবীর মোট বারোটি ভাষাবংশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভবের ধারাটি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারব।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের মোট দশটি শাখা। সেগুলি হল— ইন্দো-ইরানীয়, বাল্টো-স্লাভিক, আলবানীয়, আর্মেনীয়, গ্রিক, ইটালিক, টিউটনিক, কেলটিক, তোখারীয় এবং হিত্তীয়। ইন্দো-ইরানীয় ভাষাবংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে তিনটি আর্যভাষা— (ক) ইরানীয় আর্য, (খ) দরদীয় আর্য এবং (গ) প্রাচীন ভারতীয় আর্য। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার দুইটি রূপ—কথ্য এবং সাহিত্যিক। বৈদিক ভাষাগুলি হল সাহিত্যিক রূপের অন্তর্গত। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কথ্যরূপের শাখাটি আবার চারভাগে বিভক্ত। সেগুলি হল—প্রাচ্য, উদীচ্য, মধ্যদেশীয় এবং দাক্ষিণাত্য। এগুলির মধ্যে প্রাচ্য শাখাটি আবার প্রাচ্যমধ্যা এবং প্রাচ্যা এই দুই শাখায় বিভক্ত। প্রাচ্যা শাখার মাগধী প্রাকৃত থেকে উদ্ভব ঘটেছে মাগধী অপভ্রংশ এবং অবহট্‌ঠের। মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের দুটি শাখা—পশ্চিমা এবং পূর্বী। এই পূর্বী শাখাটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত—বঙ্গ-অসমিয়া এবং ওড়িয়া। বঙ্গ-অসমিয়া শাখাটি থেকেই বাংলা এবং অসমিয়া ভাষার উদ্ভব।

৪.৪ সারসংক্ষেপ

শিক্ষার্থীরা এই অংশ পাঠের মাধ্যমে বাংলা ভাষার আবির্ভাবের ধারাটি সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানলাভ করতে পারবে। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বাংলা ভাষার তিনটি স্তর, তাদের বিস্তারপর্ব, ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করব।

৪.৫ অনুশীলনী

অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী:

১. ইন্দো-ইরানীয় শাখাটি কোন্ দুটি উপশাখায় বিভক্ত?

২. মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের কোন্ শাখা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে?

৩. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সাহিত্যিক রূপ কোন্‌টি?

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী:

১. 'সংস্কৃত ভাষা থেকেই বাংলা ভাষার জন্ম।'— এই মন্তব্যের পক্ষে বা বিপক্ষে আপনার যুক্তি সাজান।

২. 'আর্য ভাষাবংশ' বলতে কী বোঝানো হয়?

রচনাধর্মী:

১. বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাসটি রেখাচিত্রযোগে আলোচনা করুন।

মডিউল : ২

বাংলা ভাষার বিবর্তন, প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষা (ক), প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষা (খ)

একক ৫ ❑ বাংলা ভাষার বিবর্তন

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ প্রস্তাবনা

৫.৩ বাংলা ভাষার যুগবিভাজন

৫.৪ বাংলা ভাষায় অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব

৫.৫ সারসংক্ষেপ

৫.৬ অনুশীলনী

৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষার বিবর্তন সম্পর্কে জানতে পারবে। সেইসঙ্গে বাংলা ভাষায় অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব সম্পর্কেও তারা অবহিত হবে।

৫.২ প্রস্তাবনা

অব্যবহিত পূর্ববর্তী এককে আমরা দেখিয়েছি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অন্তর্গত ইন্দো-ইরানীয় শাখা থেকে কীভাবে ক্রমান্বয়ে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ এবং সেখান থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছে। বর্তমান এককে বাংলা ভাষার বিবর্তনের ধারাটি পরিবেশিত হয়েছে। বাংলা ভাষার কালগত বিভাজন প্রদর্শনের পাশাপাশি এই ভাষায় কীভাবে অন্যান্য ভাষার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে, সেটিই এই এককের আলোচনার ভরকেন্দ্র।

৫.৩ বাংলা ভাষার যুগবিভাজন

আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষার বিবর্তনের প্রায় এক হাজার বছরের ইতিহাসকে মূলত তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়—

(১) প্রাচীন বাংলা (Old Bengali)

(২) মধ্য বাংলা (Middle Bengali)

(৩) আধুনিক বাংলা (New Bengali)

(১) প্রাচীন বাংলা (Old Bengali): আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই স্তরের কালসীমা। এই পর্বের বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের রচিত চর্যাগীতিতে, 'অমরকোষ'-এর সর্বানন্দ রচিত টীকায় প্রদত্ত চারশ'-রও বেশি বাংলা প্রতিশব্দে। এই স্তরের বাংলা ভাষার

F:\Avik\Netaji\2025 New\5CC-BG-02 (CC-BG-02) E-Copy 5CC-BT-02 22.03.25

প্রধান বিশেষত্ব হল— দীর্ঘীভবন (ধর্ম > ধম্ম > ধাম); পদান্তিক স্বরধ্বনির স্থিতি (ভণতি > ভণই); 'য়'-শ্রুতি ও 'ব'-শ্রুতি (নিকটে > নিয়ড্ডী); '-এর', '-অর', '-র' বিভক্তিযোগে সম্বন্ধপদ (রুখের তেন্তলি); '-ক', '-কে', '-রে' বিভক্তিযোগে গৌণকর্ম ও সম্প্রদানের পদ (ঠাকুরক = ঠাকুরকে); '-ই', '-এ', -'হি', '-তে' বিভক্তিযোগে অধিকরণ (নিয়ড্ডী = নিকটে); '-এঁ' বিভক্তিযোগে করণ (সাদেঁ = শব্দের দ্বারা); বিভক্তির পরিবর্তে কিছু অনুসর্গের ব্যবহার (তোহোর অন্তরে = তোর তরে) ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে, প্রাচীন বাংলার বিস্তৃতিকাল আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। কারণ ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালপর্বে রচিত বাংলা ভাষার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তাই এই পর্বটিকে 'অনুর্বর পর্ব' বা 'অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্ব' বলা যায়।

(২) মধ্য বাংলা (Middle Bengali): আনুমানিক ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই কালপর্বের বিস্তৃতি। বাংলা ভাষার এই মধ্য পর্বের বিস্তার সুদীর্ঘ প্রায় চারশ' বছর। এই পর্বটিকে দুটি উপপর্বে ভাগ করা যায়—

(ক) আদিমধ্য বাংলা (Early Middle Bengali): এই কালপর্বের বিস্তার আনুমানিক ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর রচনাকাল বিতর্কিত হলেও মোটামুটিভাবে এই রচনাটিকেই আদিমধ্য পর্বের বাংলা ভাষার একমাত্র নিদর্শনরূপে ধরা হয়। এই পর্বের বাংলা ভাষার প্রধান বিশেষত্ব— আ-কারের পরবর্তী 'ই'/'উ' ধ্বনির ক্ষীণতা, সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচনে '-রা' বিভক্তি (আহ্মরা > আমরা), '-ইল'-যোগে অতীত কালের ও '-ইব' যোগে ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদ গঠন (শুনিলোঁ, করিবোঁ), 'আছ্' ধাতু যোগে যৌগিককালের পদসৃষ্টি (লই + (আ)ছে > লইছে), পাদাকুলক-পজ্ঝটিকা ছন্দ থেকে বহুপ্রচলিত পয়ার ছন্দের সৃষ্টি ইত্যাদি।

(খ) অন্ত্যমধ্য বাংলা (Late Middle Bengali): আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই কালপর্বের বিস্তৃতি। এই উপপর্বের ভাষার সমৃদ্ধ নিদর্শন বিভিন্ন ধারা মঙ্গলকাব্যে, বৈষ্ণব সাহিত্যে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। এই সময়ের বাংলা ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য একক ব্যঞ্জনের পরবর্তী পদান্তিক স্বরধ্বনির লোপ-প্রবণতা (রাম > রাম্), অপিনিহিতি (কালি > কাইল, করিয়া > কইর‍্যা), বিশেষ্যের কর্তৃকারকের বহুবচনে '-রা' বিভক্তি, নামধাতুর ব্যবহার (নমস্কার > নমস্কারিল), আরবি-ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ ও বৈষ্ণব কবিতায় ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহার ইত্যাদি।

(৩) আধুনিক বাংলা (New Bengali): আনুমানিক ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই যুগপর্বের বিস্তৃতি। বাঙালির মুখের বাংলা ভাষাই এই পর্বের বাংলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকবৃন্দ ও খ্রিস্টান মিশনারিদের রচিত বাংলা গ্রন্থ, রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনায় এই আধুনিক বাংলার নিদর্শন পাওয়া যায়। সাহিত্যিক ভাষার এই নিদর্শনের পাশাপাশি, পাঁচটি উপভাষাও এই কালপর্বের অবদান। সেগুলো হল, মধ্য পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা 'রাঢ়ী', দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তবঙ্গের উপভাষা 'ঝাড়খণ্ডী', উত্তরবঙ্গের উপভাষা 'বরেন্দ্রী', পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের উপভাষা 'বঙ্গালী' এবং উত্তরপূর্ব বঙ্গের উপভাষা 'কামরূপী' বা 'রাজবংশী'।

এগুলির মধ্যে গঙ্গাতীরবর্তী তথা কলকাতার নিকটবর্তী পশ্চিমবাংলার রাঢ়ী উপভাষার উপরে ভিত্তি করেই শিক্ষিতজনের সর্বজনীন আদর্শ চলিত বাংলা বা Standard Collaquial Bengali-র রূপ গড়ে উঠেছে।

আধুনিক বাংলা ভাষার দুটি প্রধান বিশেষত্ব হল, সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা এবং সাহিত্যে গদ্যরীতির ব্যাপক ব্যবহার।

এই স্তরে চলিত বাংলার প্রধান বিশেষত্ব হল— অভিশ্রুতি (করিয়া > কইর‍্যা > কর‍্যে > করে), স্বরসঙ্গতি (দেশী > দিশি), বহুপদী ক্রিয়ারূপ (গান করা, জিজ্ঞাসা করা), ফারসি 'ব' (wa) থেকে আগত 'ও'-এর সংযোজক অব্যয়রূপে ব্যবহার (রাম ও শ্যাম), বহু ইংরেজি শব্দের অনুপ্রবেশ, নতুন নতুন ছন্দোরীতি ও গদ্যছন্দের প্রতিষ্ঠা।

বাংলা ভাষার ইতিহাসের যুগবিভাজনটি নীচের ছকে (রামেশ্বর শ', পৃ. ৬২৬) প্রদর্শিত হল—

চর্যাগীতি ইত্যাদি	৯০০ - ১২০০ খ্রি.		**প্রাচীন বাংলা** (OB)
অনুর্বর পর্ব	১২০০ - ১৩৫০ খ্রি.	অন্ধকারযুগ	
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	১৫০০ খ্রি.	আদি মধ্য	**মধ্য বাংলা** (MB)
বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ মহাভারত, ভাগবতের অনুবাদ ইত্যাদি	১৭৬০ খ্রি.	অন্ত্যমধ্য	
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের খ্রিস্টান মিশনারিদের লেখা, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখের রচনা ও মৌখিক বাংলা	১৭৬০ খ্রি. থেকে বর্তমান কাল		**আধুনিক বাংলা** (NB)

৫.৪ বাংলা ভাষায় অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব

বাংলা শব্দ মূলত দুই প্রকার— মৌলিক এবং আগন্তুক। মৌলিক শব্দ বলতে বোঝায় ভারতীয় আর্যভাষা থেকে আগত বা গৃহীত শব্দাবলীকে। আর অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, সেমীয় ইত্যাদি অসম্পৃক্ত গোষ্ঠীর ভাষা বা ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর শাখান্তর থেকে পরে গৃহীত শব্দগুলিই হল আগন্তুক শব্দ।

মৌলিক শব্দগুলি মূলত তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত—তৎসম, তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম। 'জল', 'বায়ু', 'আকাশ', 'মানুষ', 'গৃহ', 'কৃষ্ণ', 'অন্ন'—ইত্যাদি হল তৎসম শব্দ; 'ওঝা', 'নীতি', 'খাজা', 'গায়', 'ঢাকা' ইত্যাদি হল তদ্ভব শব্দ। অর্ধ-তৎসম শব্দের উদাহরণ হল 'কেষ্ট', 'রাত্তির', 'বোষ্টম', 'গিন্নি', 'পেন্নাম' ইত্যাদি।

বাংলায় আগন্তুক শব্দ দুই প্রকার— দেশি ও বিদেশি। বিদেশি শব্দের মধ্যে আরবি, ফারসি, তুর্কী, ওলন্দাজ, ইংরেজি ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দঋণ রয়েছে বাংলা ভাষায়। যেমন— 'আন্দাজ', 'খরচ', 'কম', 'বেশি' (ফারসি), 'আইন', 'আক্কেল', 'হুকা', 'বিদায়' (আরবি), 'আলখাল্লা', 'উজবুক', 'উর্দু', 'কাঁচি', (তুর্কী), 'হরতন', 'রুইতন', 'ইস্কাবন' (ওলন্দাজ), 'লাট', 'আপিস', 'গেলাস', 'বাক্স' (ইংরেজি)। দ্রাবিড়, অস্ট্রিক গোষ্ঠীর বেশ কতকগুলি শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। যেমন—'খড়', 'খুঁটি', 'খোকা', 'খুকু', 'ঝাঁটা', 'ঢেঁকি', 'মুড়ি', 'ঢিপি', 'বাদুড়', 'বাবা', 'থোড়', 'ডাগর', 'ডোবা', 'চিংড়ি', 'চাউল', 'গাড়ি', 'কুকুর', 'পেট' ইত্যাদি।

এছাড়াও বেশকিছু হিন্দি শব্দ প্রাত্যহিক ব্যবহারের ফলে যুক্ত হয়েছে বাংলা শব্দভাণ্ডারে। যেমন—'কচুরি', 'কাহিনি', 'খানা', 'চাপকান', 'চামেলি', 'চালু', 'ঝাড়ু', 'ঝাণ্ডা', 'টহল', 'দাঙ্গা', 'লোটা', 'বেলচা', 'ফালতু' ইত্যাদি।

বাংলার সঙ্গে বহির্ভারতীয় ব্যবসায়িক যোগাযোগ, বিদেশ থেকে আগত ব্যবসায়ী, শাসকদের হাত ধরে বেশকিছু বিদেশি শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে অবলীলায় সংযুক্ত হয়েছিল। অগণিত আরবি, ফারসি শব্দ, পর্তুগিজ, চীনা শব্দের প্রাধান্য বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে লক্ষণীয়।

যেমন—

আরবি শব্দ: 'আকছার', 'আক্কেল', 'আলাদা', 'আসবার', 'আইন', 'ঈদ', 'ইজারা', 'ইমারত', 'ওকালতি', 'ওজন', 'কদম', 'কবুল', 'কুর্সি', 'কেচ্ছা', 'কুলুপ', 'কিসমত', 'খাসি', 'খুন', 'খেতাব', 'খাজনা', 'খালাসি', 'গরীব', 'গরমিল', 'জল্লাদ', 'জমা', 'জমানত', 'জিনিস', 'জিম্মা', 'তছরুপ', 'তদারক', 'দুনিয়া', 'দিন', 'ফিরিস্তি', 'ফকির', 'মামলা', 'মোকদ্দমা', 'মালিক', 'মিছিল', 'হাকিম', 'হজম', 'হিম্মত', ইত্যাদি।

ফারসি শব্দ: 'আইন', 'আওয়াজ', 'আন্দাজ', 'আঙ্গুল', 'আশকারা', 'আসমান', 'ওস্তাদ', 'কাগজ', 'কাবাব', 'কামাই', 'কারিগর', 'কিসমিস', 'খরচ', 'খাস্তা', 'খোশামোদ', 'গরম', 'গোয়েন্দা', 'গোমস্তা', 'চাদর', 'চাঁদা', 'চাবুক', 'চরকা', 'দরকার', 'দরবার', 'দাবি', 'দরাজ', 'নালিশ', 'নমুনা', 'নাবালক', 'পর্দা', 'পাপোস', 'পায়জামা', 'পোশাক', 'ময়দা', 'মোরগ', 'মরিচা', 'মালাই', 'সেতার', 'সুপারিশ', 'হিন্দি', 'হিন্দু', 'হামেশা' ইত্যাদি।

আরবি-ফারসি মিশ্রিত শব্দ: 'আদমসুমারী', 'ওকালতনামা', 'কুচকাওয়াজ', 'কোহিনূর', 'জমাদার', 'জরিমানা', 'তাঁবেদার', 'বেয়াদপ', 'বেইজ্জত', 'বেহায়া' ইত্যাদি।

তুর্কি শব্দ: 'কাবু', 'কুলি', 'কোর্মা', 'উর্দু', 'কাঁচি', 'উজবুক', 'বাবুর্চি', 'বারুদ', 'বেগম' ইত্যাদি।

পর্তুগিজ শব্দ: 'আচার', 'আতা', 'আনারস', 'আলকাতরা', 'আলমারি', 'ইস্তিরি', 'ইস্পাত', 'পাউরুটি', 'ফরাসি', 'ফিরিঙ্গি', 'বেহালা', 'পেয়ারা', 'পেপে', 'সাবান', 'সায়া' ইত্যাদি।

জার্মান শব্দ: 'কিন্ডারগার্ডেন'।

স্পেনীয় শব্দ: 'ডেঙ্গু'।

ওলন্দাজ শব্দ: 'হরতন', 'রুইতন', 'ইস্কাবন' ইত্যাদি।

চীনা শব্দ: 'চা', 'চিনি' ইত্যাদি।

জাপানি শব্দ: 'রিক্সা', 'টাইফুন', 'হাসনুহেনা' ইত্যাদি।

ইংরেজি শব্দ: 'আপিস', 'অক্সিজেন', 'টেবিল', 'চেয়ার', 'কেটলি', 'ডাক্তার', 'ডেপুটি', 'পকেট', 'পুলিশ', 'লেবেল', 'সার্কাস', 'টাইম', 'বিস্কুট', 'কংগ্রেস', 'কেক', 'কেরোসিন', 'হাইকোর্ট', 'সিগন্যাল' ইত্যাদি।

বাংলা শব্দভাণ্ডারে আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার সুযোগ পাব।

৫.৫ সারসংক্ষেপ

এই একক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষার স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবে। এই এককে বাংলা ভাষার যুগবিভাজন, প্রতিটি পর্বের ভাষাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা ভাষার যুগবিভাজন, তার বিভিন্ন ধারা, ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা পরবর্তী এককগুলিকে বিস্তারিত আলোচনা করব।

প্রতিটি ভাষা গঠনে বিভিন্ন ভাষার ঋণ রয়েছে। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার বিভিন্ন দেশি-বিদেশি শব্দের সমাহারে গঠিত। এই এককে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা শব্দভাণ্ডার সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক একটি ধারণা লাভ করবেন। পরবর্তী ১৭, ১৮ নং এককে শব্দভাণ্ডার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৫.৬ অনুশীলনী

অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী:

১. প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলার আনুমানিক কালব্যাপ্তি উল্লেখ করুন।

২. মধ্য বাংলা কোন্ দুটি পর্বে বিভক্ত?

৩. আধুনিক বাংলা ভাষার একটি বিশেষত্ব উল্লেখ করুন।

৪. বাংলার মৌলিক শব্দ কোন্‌গুলি?

৫. বাংলায় বিদেশি আগন্তুক শব্দের দুটি উদাহরণ দিন।

৬. প্রাচীন বাংলার বিস্তৃতিকাল উল্লেখ করুন।

৭. প্রাচীন বাংলার প্রধান সাহিত্যিক নিদর্শন কোন্‌টি?

৮. সর্বানন্দের 'অমরকোষ টীকা'য় আনুমানিক কত বাংলা শব্দ পাওয়া গেছে?

৯. আদি-মধ্যবাংলার প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শন কোন্‌টি?

১০. বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মধ্যযুগের কোন্ স্তরের ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শন?

১১. বাংলা উপভাষা কয় প্রকার ও কী কী?

১২. বাংলা শব্দভাণ্ডারে গৃহীত দুটি ওলন্দাজ শব্দ এবং দুটি জাপানি শব্দের নাম লিখুন।

১৩. মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের সময়কাল উল্লেখ করুন।

১৪. বাংলা শব্দভাণ্ডারের দুটি তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দের উদাহরণ দিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী:

১. আদি-মধ্য বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২. বাংলা ভাষার কালগত বিভাজনটি সারণিযোগে বুঝিয়ে দিন।

৩. অন্ত্য-মধ্য বাংলার প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৪. বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

রচনাধর্মী প্রশ্ন:

১. বাংলা ভাষায় বিবর্তনের ক্রমটি সুস্পষ্ট করুন।

২. বাংলা ভাষায় অন্যান্য ভাষার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. আদি-মধ্য ও অন্ত্য-মধ্য বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের একটি তুলনামূলক আলোচনা করুন।

একক ৬ ❑ প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষা (ক)

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য

৬.২ প্রস্তাবনা

৬.৩ বাংলা ভাষার নিদর্শন

৬.৪ প্রাচীন বাংলার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৬.৫ সারসংক্ষেপ

৬.৬ অনুশীলনী

৬.১ উদ্দেশ্য

প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষা-কেন্দ্রিক এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা প্রাচীন বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবে। পাশাপাশি প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শনগুলির সঙ্গেও পরিচয় ঘটবে তাদের।

৬.২ প্রস্তাবনা

প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার বিস্তৃত কালপর্বে প্রাপ্ত বিবিধ সাহিত্যিক নিদর্শন যেমন— চর্যাগীতি থেকে শুরু করে 'অমরকোষ'-এর টীকা ইত্যাদি এই এককে উল্লিখিত হয়েছে। পাশাপাশি, মূলত চর্যাগীতিকে আলোচনার কেন্দ্রে রেখে প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণসহ শিক্ষার্থীদের কাছে পরিবেশন করা হয়েছে।

৬.৩ প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন

প্রাচীন বাংলা ভাষার বিস্তৃতিকাল আনুমানিক ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়সীমার মধ্যে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালপর্বের মধ্যে রচিত বলে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে— এমন কোনো বাংলা রচনার সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাই ১২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত এই পর্বটিকে 'অনুর্বর পর্ব' বা Barren Period বলা হয়। এই পর্বের ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়নি বলে এর ভাষাবৈশিষ্ট্যও আমরা জানতে পারি না। তাই এই পর্বটিকে 'অন্ধকার যুগ'-ও বলা হয়। সে কারণে, এই পর্বটিকে বাদ দিয়েই অনেকে বলে থাকেন, প্রাচীন যুগের বিস্তারকাল হল ৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

বাংলা ভাষায় প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় বৌদ্ধতান্ত্রিক সহজিয়াদের রচিত চর্যাগীতিগুলিতে। চর্যাগীতি ছাড়া প্রাচীন বাংলার আর যেসমস্ত নিদর্শন পাওয়া গেছে, সেগুলো নিতান্তই নগণ্য। অমর সিংহ রচিত সংস্কৃত অভিধান-কল্প গ্রন্থ 'অমরকোষ'-এর টীকা রচনা করেছিলেন বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ। এতে যে প্রায় চারশ' বাংলা শব্দ আছে, সেগুলিকে প্রাচীন বাংলার নিদর্শন বলে ধরা হয়। আর, 'সেকশুভোদয়া'-য় সংকলিত যে দু'-চারটি বিচ্ছিন্ন বাংলা গান পাওয়া যায়, সেগুলিকেও প্রাচীন বাংলার নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা হয়। এছাড়া আছে বৌদ্ধকবি ধর্মদাসের 'বিদগ্ধ মুখমণ্ডল'-এ দু'-চারটি বাংলা ছড়া ও কবিতা।

৬.৪ প্রাচীন বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিষম ব্যঞ্জনের মিলনে গঠিত যুক্ত ব্যঞ্জনগুলি মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় সমীভূত হয়ে সমব্যঞ্জনে গঠিত যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছিল।

যেমন, পর্বত > পব্বত, বা, জন্ম > জম্ম।

প্রাচীন বাংলায় এই যুগ্ম ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি লুপ্ত হল।

যেমন, পব্বত > পবত, জম্ম > জম। এই লোপের ক্ষতিপূরণস্বরূপ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ হল।

যেমন—

পবত (প্ + অ + ব্ + অ + ত্ + অ) > পাবত (প্ + আ + ব্ + অ + ত্ + অ)

বা

জম (জ্ + অ + ম্ + অ) > জাম (জ্ + আ + ম্ + অ)

এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় অর্ধতৎসম শব্দে। সেখানে সমীভূত যুগ্মব্যঞ্জনের একটি লোপ পেয়েছে, কিন্তু পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়নি।

যেমন, মিথ্যা > মিছা।

নাসিক্যব্যঞ্জনের সংযোগে গঠিত যুক্তব্যঞ্জনও অনেক সময় সমীভূত হয়নি; তা সত্ত্বেও প্রাচীন বাংলায় এই ধরনের যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়েছে।

যেমন— বন্ধ > বান্ধ, চন্দ্র > চান্দ।

২) নাসিক্যব্যঞ্জন অনেকক্ষেত্রে লোপ পেল এবং তার ফলে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়ে গেল।

যেমন, শব্দেন > সাদেঁ।

৩) পাশাপাশি অবস্থিত একাধিক স্বরধ্বনি বজায় ছিল, অর্থাৎ দু'টি মিলে একটি স্বরে পরিণত হয়নি।

যেমন, উদাস > উআস। কিন্তু পদের অন্তে অবস্থিত একাধিক স্বর যৌগিক স্বররূপে উচ্চারিত হত এবং ক্রমে দুটি মিলে একক স্বরে পরিণত হল।

যেমন—ভণতি > ভণই, পুস্তিকা > পোত্থিআ > পোথী।

৪) পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বরধ্বনির মাঝখানে প্রায়ই 'য়'-ধ্বনি শ্রুতিধ্বনি রূপে এসে যেত।

যেমন, নিকটে > নিঅড্ডী > নিয়ড্ডী > নিয়ড়ি।

৫) স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ ধ্বনি প্রায়ই হ-কারে পরিণত হত।

যেমন, মহাসুখ > মহাসুহ, কথন > কহন।

৬) 'শ্'-এর স্থানে 'স্'-এর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

যেমন— এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস (< আশা), সুনুপাখ (শূন্যতা পাখা) ভিড়ি লাহু রে পাস (পাশ)।

৭) চর্যাপদে 'অ'-ধ্বনির উচ্চারণ ছিল আধুনিক উচ্চারণের তুলনায় সম্ভবত আরও বিবৃত (Open)। সেকারণেই হয়তো চর্যার লিপিবিধিতে শব্দের আদিস্বরে শ্বাসাহত (stressed) স্থানে 'অ'/'আ'-ধ্বনির বিপর্যয় দেখা যায়।

যেমন— অইস/আইস, কবালী/কাবালী, সমাঅ/সামাঅ ইত্যাদি।

৮) ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল— পদমধ্য 'হ'-ধ্বনির উচ্চারণ সংরক্ষণ (যেমন—'খণহ', 'তহিঁ' 'করহু' ইত্যাদি) এবং মহাপ্রাণ বর্ণ, বিশেষত 'হ্ম', 'হ্ন', 'ঢ'-এর অস্তিত্ব (যেমন—'আহ্মে', 'কাহ্নু', 'দিঢ' ইত্যাদি)। চর্যাপদে সম্ভবত ওড়িয়াসুলভ 'ল' ধ্বনি বজায় ছিল। অন্ত্যমিলে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

যেমন—'হেলেঁ', 'ডাল', 'ডালী' ইত্যাদি।

৯) চর্যাপদে অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠের মতোই স্বর-সংযোগ দেখা যায়, অর্থাৎ সেখানে স্বরসংকোচ সর্বত্র ঘটেনি।

যেমন— 'অমিঅ', 'আইস', 'চিঅরাঅ', 'করউ' ইত্যাদি। তবে, স্বরসংকোচের উদাহরণও বিরল নয়।

যেমন—'তৈলোএ'/'তেলোএ', 'ইন্দিঅ'/'ইন্দি', 'জাইউ'/'জাউ', 'করিঅ'/'করি' ইত্যাদি।

১০) চর্যায় মধ্য বাংলাসুলভ অপিনিহিতির উদাহরণ মেলে না; তবে স্বরসংগতির দু'-একটি উদাহরণ পাওয়া যায়।

যেমন, সুসুরা < শ্বশুর, ঘিনি < ঘেণেলি ইত্যাদি।

১১) নাসিক্যব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনের সরলীভবন দেখা যায়। পূর্বস্বর দীর্ঘত্বলাভের সঙ্গে সঙ্গে আনুনাসিক হয়ে গেছে— যদিও তা সর্বত্র চিহ্নিত হয়নি। সম্ভবত চর্যাপদে আনুনাসিকতা পুরোপুরি ঘটেনি। নাসিক্যব্যঞ্জন ছিল ক্ষীণ। তাই অনেক সময় পূরক দীর্ঘত্ব ও নাসিক্যব্যঞ্জন পাশাপাশিই অবস্থান করেছে।

যেমন—'চন্দ' > 'চান্দ', 'ভন্তি' > 'ভাংতি' > 'ভান্তী', 'তন্তে' > 'তান্তি' ইত্যাদি।

৬.৫ সারসংক্ষেপ

এই একক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রাচীন বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সম্পর্কে জানতে পারবেন। প্রাচীন বাংলার সাহিত্যিক উপাদানের মধ্য দিয়ে প্রাচীন বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

৬.৬ অনুশীলনী

অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী:

১. প্রাচীন বাংলা ভাষার আনুমানিক বিস্তৃতিকাল কত?

২. কোন্ পর্বটিকে 'অনুর্বর পর্ব' বলে চিহ্নিত করা হয়?

৩. প্রাচীন বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কোন্‌টি?

৪. অমর সিংহ রচিত সংস্কৃত অভিধান-কল্প গ্রন্থের নাম কী?

৫. প্রাচীন বাংলা ভাষায় যুগ্মব্যঞ্জন লোপের একটি উদাহরণ দিন।

৬. প্রাচীন বাংলা ভাষার একটি উদাহরণ দিন যেখানে যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়েছে।

৭. চর্যাগীতিতে প্রাপ্ত স্বরসংগতির একটি উদাহরণ দিন।

৮. 'বিদগ্ধ মুখমণ্ডল' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী:

১. টীকা লিখুন: প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন।

২. 'ভণতি' > 'ভণই'— এই উদাহরণটি প্রাচীন বাংলার কোন্ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত, ব্যাখ্যা করুন।

৩. প্রাচীন বাংলা ভাষায় কীভাবে নাসিক্যব্যঞ্জনের সরলীভবন ঘটেছে, তা বুঝিয়ে দিন।

৪. প্রাচীন বাংলায় মহাপ্রাণ ধ্বনির ব্যবহার সম্পর্কে লেখুন।

৫. পর্বত > পব্বত — ধ্বনিপরিবর্তনের ধারাটি বিশ্লেষণ করুন।

৬. প্রাচীন বাংলা ভাষায় 'হ' ধ্বনির ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৭. বন্ধ > বান্ধ — ধ্বনি পরিবর্তনের ধারাটি বিশ্লেষণ করুন।

রচনাধর্মী:

১. প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

একক ৭ ❑ প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষা (খ)

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য

৭.২ প্রস্তাবনা

৭.৩ প্রাচীন বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৭.৪ প্রাচীন বাংলা ভাষার অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৭.৫ সারসংক্ষেপ

৭.৬ অনুশীলনী

৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে জানতে পারবে।

৭.২ প্রস্তাবনা

এই এককের অব্যবহিত পূর্ববর্তী এককে প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এখানে প্রাচীন বাংলার অন্য দুই ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণযোগে পরিবেশিত হল। কারক-বিভক্তি, সর্বনাম, ক্রিয়া, বাচ্য ইত্যাদি বিভিন্ন আঙ্গিকে পৃথকভাবে রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচিত হয়েছে। প্রাচীন বাংলার অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে দুটি ধারায় আলোচিত— লিঙ্গ-সৌষম্য এবং অনুক্ত কর্তার প্রয়োগ।

৭.৩ প্রাচীন বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

অ. কারক-বিভক্তি:

১. প্রাচীন বাংলা ভাষায় কারক ছিল মুখ্যত দু'টি— মুখ্য কারক এবং গৌণ কারক। সংস্কৃতের শূন্য বিভক্তি, প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তিজাত রূপ হল মুখ্য কারকের। আর, তৃতীয়া থেকে সপ্তমী বিভক্তিজাত রূপ হল তীর্যক বা গৌণ কারকের।

২. কর্তৃকারকে 'শূন্য' বিভক্তি বা বিভক্তিহীনতা প্রাচীন বাংলায় লক্ষ করা যায়। যেমন, 'চঞ্চল চীএ পইঠো কাল'—এখানে 'কাল'-এ শূন্য বিভক্তি। কখনো কখনো অনির্দিষ্ট কর্তায় '-এ' বিভক্তির প্রয়োগও দেখা যায়। যেমন, 'রুখের তেন্তলি **কুম্ভীরে** খাঅ'— এখানে 'কুম্ভীরে'-তে '-এ' বিভক্তি।

F:\Avik\Netaji\2025 New\5CC-BG-02 (CC-BG-02) E-Copy 5CC-BT-02 22.03.25

৩. করণ কারকের বহু প্রচলিত বিভক্তি ছিল '-এঁ'। এটির উৎস '-এন' থেকে। যেমন, '**মতিএঁ**' ঠাকুরক পরিণিবিত্তা ('মতিএঁ'-তে 'এঁ' বিভক্তি)।

৪. করণ ও অধিকরণ কারক প্রায়ই একাকার হয়ে গেছে। ফলে অধিকরণেও প্রায়ই একই বিভক্তি চোখে পড়ে। যেমন—'ঘরেঁ'। অবশ্য অধিকরণকারকে অন্যান্য বিভক্তিও ছিল। যেমন '-ই' বিভক্তি ('**নিঅড়ি**' বোহি মা জাহুরে লাঙ্ক'), '-এ' বিভক্তি ('চঞ্চল **চীএ** পইঠো কাল'), 'তেঁ' বিভক্তি ('সকল সমাহিঅ কাহি করিঅই, **সুখদুখেতেঁ** নিচিত মরিঅই'), 'ত' বিভক্তি ('**হাঁড়িত** ভাত নাহি নিতি আবেশী') ইত্যাদি।

৫. অধিকরণের বিভক্তিগুলির মধ্যে '-এ' বিভক্তির প্রয়োগ ছিল ব্যাপক— এতটাই যে, অন্যান্য কারকের অর্থ প্রকাশ করার জন্যেও এই বিভক্তির ব্যবহার ছিল। যেমন— কর্তৃকারকের অর্থে, 'কানেট **চোরে** নিল কা গই মাগঅ'। আবার, অপাদানের অর্থে, '**জামে** কাম কি কামে জাম'।

৬. সম্বন্ধ পদের বিভক্তি ছিল '-এর', '-র', '-ক'। যেমন— '**রুখের** তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ' (গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়'), '**মোহোর** বিগোআ কহণ ন জাই' (আমাদের মিলনসুখের কথা বলা যায় না), 'এড়িএউ **ছান্দক** বান্ধ করণক পাটের আস' (ছন্দের বন্ধ ও ইন্দ্রিয়পটুতার আশা ত্যাগ করো)।

৭. তির্যক বিভক্তি ছাড়া অপাদান কারকের নিজস্ব বিভক্তি ছিল '-হুঁ'। যেমন, 'রঅণহুঁ' (< রত্নাৎ = রত্ন থেকে)।

৮. বিভক্তির অর্থ প্রকাশ করার জন্য যেসব শব্দ বিভক্তির বদলে ব্যবহৃত হয়, অথচ যেগুলি বিভক্তির মতো মূল শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় না, সেগুলিকে অনুসর্গ বলে। এই অনুসর্গের ব্যবহার প্রাচীন বাংলাতেই সূচিত হয়েছিল। চর্যাপদে অনুসর্গীয় বিভক্তিগুলির প্রয়োগ সংক্ষেপে এইরকম—

-ক/কে (গৌণকর্ম ও সম্বন্ধ) : **নাশক** থাতী, **ছান্দক** বান্ধ, **বাহবকে** পারই ইত্যাদি।

-কু (গৌণকর্ম) : **মকুঁণঠা**।

-রে/রেঁ (গৌণকর্ম) : রস **রসানেরে** কংখা ইত্যাদি

-ত/তে (করণ-অপাদান-অধিকরণ) : **সুখদুখেতেঁ, ডোম্বিত** আগলী।

নামবাচক অনুসর্গ : ডোম্বী এর সাঙ্গে, তঁই বিনু, গঅণ মাঝেঁ

অসমাপিকা অনুসর্গ : দিআ চণ্ডালী, দিঢ করি, কণ্ঠে লইআ ইত্যাদি।

৯. মুখ্য কর্মের শূন্য বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

উদাহরণ— 'সাসুরা **নিদ্‌** গেল'।

১০. গৌণ কর্মকারক সম্প্রদানের রূপ প্রাপ্ত হয়। ফলে সম্প্রদান কারকের বেশ কিছু বিভক্তি গৌণ কারকের বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত হয়।

যেমন—'লুই ভণই **গুরু** পুচ্ছিঅ জান' (শূন্য বিভক্তি)

'মতিএঁ **ঠাকুরক** পরিনিবিত্তা' (অ বিভক্তি)

'কেহো কেহো **তোহারে** বিরুয়া বলই' (রে বিভক্তি)

১১. অধিকরণে 'এ' বিভক্তি ছাড়াও আরো চারটি বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

যেমন—'**সুখ দুখেতে** নিশ্চিত মরিঅই' (তে বিভক্তি) (সুখে দুঃখেতে মরতেই হবে)

'কোড়ি মাঝেঁ একু **হিআহিঁ** সমাইউ' (হিঁ বিভক্তি) (কোটি লোকের মাঝে একে হৃদয় তা প্রবেশ করল)

'**হাঁড়িত** ভাত নাই নিতি আবেশী' (ত বিভক্তি) (হাড়িতে ভাত নাই অথচ নিত্য প্রতিবেশী আসে)

১২. প্রাচীন বাংলায় নিমিত্তার্থে 'অন্তরে' অনুসর্গের প্রয়োগ দেখা যায়।

যেমন—'তোহোর **অন্তরে** মোত্র হাভেরি মালী' (তোর জন্য আমি হাড়ের মালা নিলাম)

আ. সর্বনাম:

সংস্কৃত করণ কারকের বহুবচনের পদ অস্মাভিঃ (>প্রাকৃত অম্হাহি > অপভ্রংশ অম্হহি) থেকে আগত অম্হে (আহ্মে, আম্ভে, অহ্মে, অম্ভে) প্রাচীন বাংলাতেই কর্তৃকারকের একবচনের পদরূপে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করে। সংস্কৃত করণকারকের বহুবচন পদ তুষ্মাভিঃ (> প্রাকৃত তুম্হাহি > অপভ্রংশ তুহহি) থেকে আগত পদ 'তুহ্মে' প্রাচীন বাংলায় কর্তকারকের একবচনের পদরূপে কখনো ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

ই. ক্রিয়া:

১. ক্রিয়ারূপে বর্তমানকালের বিভক্তি ছিল উত্তম পুরুষে '-মি', '-হুঁ'। মধ্যম পুরুষে '-স' এবং প্রথম পুরুষে '-ই'। যেমন— 'হা লো ডোম্বী তো **পুছমি** সদ্‌ভাবে। **আইসসি জাসি** ডোম্বি কাহারি নাবেঁ।' (হাঁ রে ডোমনী, তোকে সাদামনে একটা কথা জিজ্ঞেস করি— তুই কার নৌকোয় আসা যাওয়া করিস রে), কিংবা 'লুই **ভণই** গুরু পুচ্ছিঅ জাণ' (লুই বলে গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও।)

২. অতীতকালের ক্রিয়ারূপ গঠন করা হত দু'ভাবে— নিষ্ঠান্ত পদ দিয়ে এবং ধাতুর সঙ্গে 'ল' বা '-ইল' প্রত্যয় যোগ করে। যেমন—নিষ্ঠান্ত পদের সাহায্যে √গম্ + ক্ত = গত > গঅ > গউ ('সমহর গউ নিবাণে' = শশধর নির্বাণে গত হল)

প্র— √বিশ্ + ক্ত = প্রবিষ্ট > পাইট্‌ঠ > পইঠ পইঠো ('চঞ্চল চীএ **পইঠো** কাল' = চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ট হল)

'ল'/'ইল' প্রত্যয় যোগ করে = √দেখ্ + ইল = দেখিল ('মই **দেখিল**' = আমি দেখিলাম)

√গম্ + ল = গেল ('সসুরা নিদ গেল' = শ্বশুর ঘুমিয়ে পড়ল)

'-ল'/'-ইল'-যুক্ত ক্রিয়ারূপগুলি প্রথমে কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে বিধেয় বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হত। এইজন্যে এইগুলির পুংলিঙ্গে ও স্ত্রীলিঙ্গে পৃথক রূপ হত। যেমন— 'সসুরা নিদ **গেল**' (পুংলিঙ্গ) 'সবরী নিচেতন **ভইলী**' (স্ত্রীলিঙ্গ)।

৩. ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়ারূপ গঠিত হত '-ইব' যোগে। যেমন—'মই ভাইব' (আমি ভাবব)

৪. অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ গঠিত হত তিনভাবে— ধাতুর সঙ্গে 'নিষ্ঠা' প্রত্যয় যোগে নিষ্ঠান্ত পদ রচনার পর তার সঙ্গে '-এ' বিভক্তি যোগ করে (√চড়্ + ইল = চড়িল, চড়িল + এ = চড়িলে; 'সাঙ্কমত **চড়িলে** দাহিণ বামে মা হোহী' অর্থাৎ সাঁকোতে চড়লে ডাইনে-বামে ঘুরো না), '-অন্ত' যোগে পদ গঠনের পর তার সঙ্গে '-এ' বিভক্তি যোগ করে (√বুড়্ + অন্ত = বুড়ন্ত, বুড়ন্ত + এ = বুড়ন্তে; '**মই এথু বুড়ন্তে** কিম্পি ন দিঠা' অর্থাৎ আমি এখন বুড়িয়ে যাওয়াতে কিছু দেখতে পাই না), এবং '-ই', '-ইঅ' বা 'ইআ' প্রত্যয় যোগ করে। যেমন— 'দিঢ় **করিঅ** মহাসুহ পরিমাণ লুই ভণই গুরু **পুছিঅ** জান'। অর্থাৎ দৃঢ় করে মহাসুখ পরিমাণ করো, লুই বলে গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জানো।

৫. যৌগিক কাল বা Compound Tense-এর উদাহরণ চর্যায় মেলে না। যদিও যৌগিক ক্রিয়া বা Compound Verb-এর ব্যবহার বেশ সুলভ। 'উঠি গেল', 'টুটি গেলি', 'গুণিআ লেহুঁ' ইত্যাদি।

ঈ. বাচ্য :

প্রাচীন বাংলায় ভাববাচ্য বা Passive Voice-এর প্রয়োগ ছিল। যেমন— 'নাব ন ভেলা দীসই' (< সং দৃশ্যতে), 'দুহিএ' (< দুহ্যতে)। ভাববাচক বিশেষ্যের সঙ্গে সংস্কৃত 'যা' ধাতুজাত পদ যোগে যৌগিক কর্মবাচ্য গঠন এখানেই প্রথম দেখা যায়। যেমন, 'কহন ন জাই' (= ন কথ্যতে)।

৭.৪ প্রাচীন বাংলা ভাষার অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ক. লিঙ্গ-সৌষম্য (Gender concord):

১. **সাক্ষাৎ বিশেষণ ও নামপদ:** 'চঞ্চল চীএ', 'নিঘিণ কাহ্নু'; কিন্তু 'দিঢ়ি টাঙ্গী', 'নিশী অন্ধারী', 'একেলী শবরী'। অর্থাৎ, নামপদের লিঙ্গ অনুসারে অন্যান্য পদের পরিবর্তন লক্ষণীয়।

২. **সম্বন্ধ বিশেষণ (-'র'/'রি') ও নামপদ:** '**রুখের** তেন্তলি', '**হরিণির** নিলঅ'; কিন্তু '**হাড়েরি** মালী', '**মহামুদেরী** কংখা', '**চান্দেরী** চান্দকান্তি', '**গুঞ্জরী** মালী'। অর্থাৎ, নামপদ অনুসারে কোথাও 'সম্বন্ধ' বোঝাতে 'র' বা 'রি'-এর প্রয়োগ ঘটেছে।

৩. **সর্বনাম বিশেষণ (-'র'/'রি') ও নামপদ:** '**মোহোর** বিগোআ', 'জৌবন **মোর**', '**জাহের** বাণচিহ্ন'; কিন্তু '**তোহোরি** কুড়িআ', '**মেরি** তইলা বাড়ি', 'বাষণা **মোরি**' ইত্যাদি। অর্থাৎ, নামপদ অনুসারে সর্বনাম-বিশেষণে কোথাও '-র' বা কোথাও -'রি' যুক্ত হয়েছে।

৪. **কৃদন্ত বিশেষণ ('ল'/-'লি') ও নামপদ:** '**মাতেল** চীঅ-গঅন্দা', '**পইঠেল** গরাহক', '**বেঢ়িল** হাক'; কিন্তু '**মেলিলী** কাচ্ছি', '**বুড়িলা** মাতঙ্গী', 'সোনে **ভরিলী** করুণা নাবী'। অর্থাৎ নামপদ অনুসারে 'ল' বা -'লি' যোগে কৃদন্ত বিশেষণ তৈরি হয়েছে।

৫. **কৃদন্ত ক্রিয়াপদ ('-ল'/-'লি') ও কর্তৃপদ:** '**চলিল** কাহ্ন', **জিতেল** ভঅবল'; কিন্তু 'রাতি **পোহাইলী**', 'আজি ভুসুক বঙ্গালী **ভইলী**', 'ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী **লেলী**' ইত্যাদি। অর্থাৎ এখানেও নামপদ বা কর্তৃপদ অনুসারে '-ল' বা -'লি'-যোগে ক্রিয়াপদ পরিবর্তিত হয়েছে।

খ. অনুক্ত কর্তার প্রয়োগ (Passive Construction):

চর্যায় ব্যবহৃত অকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কৃদন্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল (Past participle ও Future Tense) হল কর্তার বিশেষণ ও কর্তৃবাচক। কিন্তু সকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে অতীত বা ভবিষ্যৎ ক্রিয়াপদ কর্মের বিশেষণ ও কর্মবাচক। কর্তৃবাচক ও কর্মবাচক প্রয়োগে তাই যথাক্রমে কর্তা ও উক্ত কর্ম অনুযায়ী লিঙ্গ ধারণা আরোপিত হত। যেমন— 'চলিল কাহ্ন' (= চলিতঃ কৃষ্ণঃ), 'রাতি পোহাইলী' (= রাত্রিঃ প্রভাতিতা), 'লাগেলি আগি' (= অগ্নিকা লগ্নিতা)। কিন্তু 'মোএ ঘেণিলি হাড়েরি মালী' (= ময়া অস্থিমালিকা গৃহীতা), 'মই ভইব' (= ময়া ভাবিতব্যম), 'মই দিবি পিরিচ্ছা' (= ময়া দাতব্য পৃচ্ছা)।

৭.৫ সারসংক্ষেপ

এই একক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রাচীন বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারবে। এই এককে প্রাচীন বাংলা ভাষায় কারক-বিভক্তির ব্যবহার, ক্রিয়াপদ, সর্বনামের ব্যবহার, সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচীন বাংলার সাহিত্যিক নির্দশনের ওপর নির্ভর করেই প্রাচীন বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাচীন বাংলা ভাষার গঠন, স্বরূপ বোঝার ক্ষেত্রে এই একক অবশ্যপাঠ্য।

৭.৬ অনুশীলনী

অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী:

১. প্রাচীন বাংলা ভাষায় প্রাপ্ত কারকের সংখ্যা কয়টি?

২. প্রাচীন বাংলা ভাষায় বিভক্তিহীনতার একটি উদাহরণ দিন।

৩. প্রাচীন বাংলায় 'হুঁ' বিভক্তি কোন্ কারকে ব্যবহৃত হত?

৪. একটি নামবাচক অনুসর্গের উদাহরণ দিন।

৫. প্রাচীন বাংলা ভাষায় নিষ্ঠান্ত পদ যোগে অতীত কালের একটি ক্রিয়ারূপের গঠন দেখান।

৬. '-রি' যোগে প্রাচীন বাংলার একটি সম্বন্ধ পদের উল্লেখ করুন।

৭. প্রাচীন বাংলায় নিমিত্তার্থে ব্যবহৃত একটি অনুসর্গের উদাহরণ দিন।

৮. 'রুখের তেন্তলি <u>কুম্ভীরে</u> খাঅ'—নিম্নরেখাঙ্কিত পদটির কারক, বিভক্তি নির্ণয় কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী:

১. টীকা লিখুন: প্রাচীন বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অনুসর্গ।

২. প্রাচীন বাংলা ভাষায় সর্বনামের প্রয়োগ উদাহরণ-যোগে বুঝিয়ে দিন।

৩. প্রাচীন বাংলা ভাষায় কীভাবে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ গঠিত হত, উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৪. প্রাচীন বাংলা ভাষায় অনুক্ত কর্তার প্রয়োগ উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।

রচনাধর্মী:

১. প্রাচীন বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

২. প্রাচীন বাংলা ভাষার অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণযোগে আলোচনা করুন।

নোটস্

মডিউল : ৩

মধ্যযুগের বাংলা ভাষা (ক), মধ্যযুগের বাংলা ভাষা (খ), আধুনিক বাংলা ভাষা

একক ৮ ❑ মধ্যযুগের বাংলা ভাষা (ক)

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য

৮.২ প্রস্তাবনা

৮.৩ মধ্য বাংলা : আদি স্তরের ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৮.৪ মধ্য বাংলা : আদি স্তরের রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৮.৫ মধ্য বাংলা : আদি স্তরের ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য

৮.৬ সারসংক্ষেপ

৮.৭ অনুশীলনী

৮.১ উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীরা এর আগে প্রাচীন যুগের বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে জেনেছে। বর্তমান এককে মধ্যযুগের বাংলা ভাষার আদি স্তরের ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে তারা জানতে পারবে। মধ্য-বাংলার অন্ত্যস্তরীয় ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তী এককে আলোচিত হয়েছে।

৮.২ প্রস্তাবনা

মধ্যযুগের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলিকে এই এককে তিনটি আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যথা—ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও ছন্দোরীতিগত। প্রতিটি বৈশিষ্ট্য আলোচনার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে উদাহরণযোগে তা বিশ্লেষণ করার। পাশাপাশি প্রাচীন যুগের বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে মধ্যযুগের আদি-স্তরীয় বাংলার পার্থক্যগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে।

৮.৩ মধ্য বাংলা: আদি স্তরের ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

সাধারণত মধ্য বাংলা ভাষার ব্যাপ্তি ধরা হয়, ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। কিন্তু মধ্যযুগের ব্যাপ্তিকালের দুই প্রান্তীয় কালসীমার কোনোটিই তর্কাতীত নয়। এর সূচনাকাল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ড. সুকুমার সেন। তাঁর মতে, 'চতুর্দশ শতাব্দে ও পঞ্চদশ শতাব্দে লেখা বলিয়া নিশ্চিতভাবে নেওয়া যাইতে পারে, এমন কোনো রচনা মিলে নাই। সুতরাং ১৩৫০ হইতে ১৪৫০ অবধি শতাব্দ কালের কতটা প্রাচীন বাঙ্গালার অন্তর্গত ছিল এবং কতটা আদি-মধ্য বাঙ্গালার অন্তর্গত ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায়

F:\Avik\Netaji\2025 New\5CC-BG-02 (CC-BG-02) E-Copy 5CC-BT-02 22.03.25

নাই।' [সেন, ডঃ সুকুমার : 'ভাষার ইতিবৃত্ত', কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ১৭৮-১৭৯] অন্য প্রান্তটি সম্পর্কেও তিনিই তর্কের অবতারণা করেছেন। বলেছেন, 'শুধু ভাষার পরিবর্তনের কথা মনে রাখিলে অন্ত্য-মধ্য উপস্তরের শেষসীমা ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ ধরাই সঙ্গত। তবে সেই সঙ্গে সাহিত্যে ব্যবহারের দিকেও লক্ষ্য রাখিলে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ ধরিতে হয়।'

মধ্যযুগের সমাপ্তিকাল প্রসঙ্গে বলা যায়, মানুষের মুখনিঃসৃত মধ্যযুগের জীবন্ত কথ্যভাষার নিদর্শন পাওয়ার এখন আর কোনো উপায় নেই। শুধু সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার রূপ ধরেই এই পর্বের বাংলা ভাষার স্বরূপ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা যাবে। সেদিক থেকে দেখলে, মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুসালটিকেই (১৭৬০) মধ্যযুগের সমাপ্তিলগ্ন বলে চিহ্নিত করা যায়। অর্থাৎ মধ্যযুগের আনুমানিক বিস্তৃতিকাল ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই প্রায় চারশ' বছর ধরে কোনো জীবন্ত ভাষা অপরিবর্তিত থাকতে পারে না। সেই পরিবর্তনের চিহ্ন অনুসারে এই পর্বকে দু'টি উপপর্বে বিভক্ত করা যেতে পারে—

ক) আদি-মধ্য (১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ)

খ) অন্ত-মধ্য (১৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ)

আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার একমাত্র প্রামাণ্য নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এছাড়া মোটামুটিভাবে কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' এবং কয়েকটি মঙ্গলকাব্যকেও এই পর্বের রচনা বলে ধরা হয়। কিন্তু এগুলির অধিকাংশই এই পর্বের শেষের দিকের রচনা এবং এগুলির ভাষা পরবর্তীকালে এত বেশি পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হয়েছিল যে, এগুলিকে আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার প্রামাণ্য নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা যায় না। তাই মূলত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ওপর নির্ভর করে এই পর্বের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ণয় করা হয়।

আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১) 'অ'-ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ। যেমন— 'আতি', 'আকারণ'। ফলে 'অ' ধ্বনি 'আ' ধ্বনিতে পরিনত হয়েছে।

২) যৌগিক স্বরের দ্বিস্বর রূপে উচ্চারণ— 'কইল', 'বউল'।

৩) স্বরসংগতির বাহুল্য— রণুঝণু/রুণুঝুণু, এখণী/এখুণী।

৪) 'আ'-কারের পরস্থিত 'ই'-কার ও 'উ'-কার ধ্বনির ক্ষীণতা। পাশাপাশি-অবস্থিত দুটি ধ্বনির মধ্যে দ্বিতীয়টি, বিশেষত দ্বিতীয়টি যদি পদের শেষ ধ্বনি হয়, তাহলে সেটি ক্ষীণ উচ্চারিত হতে পারে। তার ফলে পাশাপাশি-অবস্থিত দুই ধ্বনি মিলিয়ে মৌলিক স্বরের (Dipthong)-এর সৃষ্টি সম্ভব। কিন্তু সেদিক থেকে বিচার করলে দুই স্বরের সংযোগে-সৃষ্ট শুধু 'আই' বা 'আউ' নয়; এরকম আরো বহু নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ পাওয়া যায়। যেমন—আওঁ ('জাওঁ'), এউ ('দেউ'), ইআঁ

('পসিআঁ'), ইঅ ('তিঅজ'), অএ ('রএ'), এআ ('বেআকুলী'), ওআ ('গোআলিনী'), আই ('নাইল'), আএ ('বাএ', 'রাএ') ইত্যাদি।

রামেশ্বর শ'-এর মতে, '...শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় পাশাপাশি দুই স্বরের স্থিতি, তার বৈশিষ্ট্য এসব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ধ্বনির ক্ষীণতা সম্বন্ধে আমরা অসংশয়িত নই। মনে হয় এসব ক্ষেত্রে যে স্বরসংযোগ পাই তা থেকেই পরবর্তীকালের বাংলার বিভিন্ন যৌগিক স্বরের সৃষ্টি হয়েছিল।'

৫) কোনো কোনো ভাষাতাত্ত্বিকের মতে, নাসিক্যব্যঞ্জনের সংযোগে-গঠিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের 'সরলীভবন' আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য। যেমন কান্তি > কাঁতি, ঝম্প > ঝাঁপ।

কিন্তু এখানেও ডঃ রামেশ্বর শ' ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, '...এই বৈশিষ্ট্যটিও সর্বক্ষেত্রে লক্ষ্য (যৎ) করা যায় না। এর বহুল ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। যেমন— 'চন্দ্রাবলী', 'কুম্ভার', 'নন্দন', 'নিন্দ', 'আহ্মি', 'ব্রহ্মা', 'কান্দো' ইত্যাদি। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, তদ্ভব শব্দে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীকরণের প্রবণতা সূচিত হয়েছিল মাত্র, কিন্তু সেটি তখনও ব্যাপক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে নি।'

৬) মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতার লোপ অথবা ক্ষীণতা আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য— এমন সিদ্ধান্ত করেছেন কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী। অর্থাৎ 'হ'-কার যুক্ত নাসিক্য ব্যঞ্জন থেকে 'হ'-কার লোপ পেয়েছে। যেমন— হ্ন (ন্‌হ) > ন এবং হ্ম (ম্‌হ) > ম। যেমন— কাহ্ন > কানু, আহ্মি > আমি।

এখানেও ভিন্নমত পোষণ করেছেন ডঃ রামেশ্বর শ'। লিখছেন, '...এই বৈশিষ্ট্যটিকেও এ যুগের বাংলা ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যরূপে গ্রহণ করতে পারি না। কারণ "কানু" ও "আমি" শব্দের চেয়ে বরং "কাহ্ন" ও "আহ্মি" শব্দের প্রয়োগই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বেশী [যৎ] এবং "হ্ন", "হ্ম" প্রভৃতি ধ্বনিসংযোগ ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। যেমন— "কোঁঅলী পাতলী বালী আহ্মে চন্দ্রাবলী", "গোঠে হৈতে আসি আহ্মি বুঢ়ী গোআলিনী", "তিরীর যৌবন রাতির সপন যেহ্ন নদীকের বাণে", "কাহ্নাঞি বাঁশীত দিল সানে", "বুয়িল ব্রহ্মার ঠাএ", "আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী", "পুছিল তোহ্মারা কেহ্নে তরাসিলা মণে", "তোহ্মার মুখত কাহ্নাঞিঁ নাহিঁ কিছু লাজ", "কোকিলের নাদ মোকে যেহ্ন যমদূত" ইত্যাদি।

৮.৪ মধ্য বাংলা: আদি স্তরের রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১) কর্তৃকারকে শূন্যবিভক্তি বা বিভক্তিহীনতা— 'শীতল মনোহর বাঁশি কে না বাএ' বা 'ডালত বসিঞা যেহ্ন কুয়িলী কাঢ়ে রায়ে।'

২) আদি-মধ্যযুগের বাংলায় মুখ্য কর্মেও বিভক্তিহীনতা দেখা যায়।

যেমন— 'অরেরে বাহিহি কাহ্ন নাব ছোড়ি ডগমগ কুগই ন দেহি'। 'তুঁহ এখনই সন্তার দেই জো চাহসি সো লেহি'।

৩) গৌণকর্মে ও সম্প্রদানে '-ক', '-কে', '-রে' বিভক্তি পাওয়া যায়।

যেমন—'কংসকে বুলিয়ে কন্যা আঁকাসে থাঁকিয়া', 'হাণ পাঁচ বাণে তাক না করিহ দয়া', 'যমুনাক যাই ছলে পানী আণিবার', 'সাপেরে করিয়াঁ বিষদানে।'

৪) পঞ্চমী বিভক্তির বদলে 'হৈতে' অনুসর্গের সাহায্যে অপাদানের অর্থ প্রকাশ করা হত।

যেমন— 'গোঠে হৈতে আসি আহ্মি বুঢ়ী গোআলিনী'। 'আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী'।

৫) সম্বন্ধ পদের অর্থ প্রকাশের জন্যে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ছিল '-এর', '-র', '-ক', '-কের'।

যেমন— 'বারেঁ বারেঁ কাহ্ন সে কাম করে', 'যে কামে হএ কুলের খাঁখারে', 'ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী', 'উত্তম জনের নেহা হেন মুরারি', 'চাহা চাহা আল বড়ায়ি যমুনাক ভিতে', 'আনাথী নারীক কত থাকে অভিমান', 'আলিঙ্গন দিআঁ কাহ্ন রাখহ পরাণ', 'তিরীর যৌবন রাতির সপন যেহ্ন নদীকের বাণে'।

৬) অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হত '-তঁ', '-তে', '-এ'।

যেমন— 'রাধার হিআত মাইল সুদৃঢ় সন্ধান', 'মদনবাণে পরাণে আকুলী ল'।

৭) উত্তম পুরুষের সর্বনাম ছিল 'আহ্মে' > 'মো' এবং মধ্যম পুরুষের সর্বনাম ছিল তোঁ > তোহ্মে ইত্যাদি। এগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন কারকের বিভক্তি-চিহ্ন যোগ হত।

৮) সর্বনাম পদের সঙ্গে কর্তৃকারকের বহুবচনে '-রা' বিভক্তি যুক্ত হত।

যেমন— 'আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী'। 'পুছিল তোহ্মারা কেহ্নে তরাসিলা মনে'।

৯) ক্রিয়া-বিভক্তির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় বর্তমানকালের উত্তমপুরুষে '-ওঁ', '-ই'; অতীতকালে '-লোঁ', '-ইল' এবং ভবিষ্যৎকালে '-ইব' বিভক্তি।

যেমন— 'তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী', 'ধরিবাক না পারোঁ পরাণী', 'পাখি নহোঁ তার ঠাই ঊড়ি পড়ি জাওঁ', 'একসরী হৈলোঁ মাত্র হেন ঘোর বনে', 'ছাড়িলোঁ মো মাহাদান তেজিলাঁ মো বাটে, 'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা', 'দাসী হআঁ তার পায়ে নিশিবোঁ আপনা'।

১০) কৃদন্ত অতীতকালের ক্ষেত্রে স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়ের ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষনীয়।

যেমন— 'গেলী রাহী', 'বড়ায়ি চলিলী'।

১১) বহু বচনে '-রা' প্রত্যয়ের অতিসীমিত প্রয়োগ, তাও কেবল উত্তম ও মধ্যমপুরুষের সর্বনামের ক্ষেত্রে—'আহ্মারা', 'তোহ্মারা' ইত্যাদি। অন্ত্য-মধ্য বাংলাসুলভ '-গুলা', '-গুলি', '-দিগ', '-দিগের' ইত্যাদি বহুবচন প্রত্যয়ের প্রয়োগ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ মেলে না।

১২) অসমিয়াসুলভ সর্বনামজাত ক্রিয়াবিশেষণের পদ— 'জৈসাণে', 'তৈসাণে' কেবল 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এই মেলে।

১৩) ধাতুর সঙ্গে 'ই', 'ইআঁ', 'ক', 'ইতেঁ', 'ইলে' ইত্যাদি যোগ করে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ রচিত হত। যেমন—

'পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ি পড়ি জাঁও।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ।'

'এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবই আসার
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজকুমুতার হার।
মুছিআঁ পেলাইবোঁ মোয়ে সিসের সিন্দুর
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর।...
যোগিনীরূপ ধরি লইবোঁ দেশান্তর।'

'অযোড়-যোড়ন আক্ষে করিবাক পারি,
সে কি রাধিকা ভৈল সীতা সতী নারী।'

'যে দেবস্মরণে পাপ বিমোচনে দেখিল হএ মুকতি
স দেব সনে নেহা বাঢ়াইলে হয়ে বিষ্ণুপুরে স্থিতি।'

'এ বার কাহ্নাঞি' বড় কৈল উপকার।
জরমে সুঝিতেঁ নারো এ গুণ তাহার।।'

'যমুনা নদীর রাধা তুলিতেঁ পানি।
কেহ্নে ধীরেঁ ধীরেঁ বুইলে মধুর বানী।'

৮.৫ মধ্য বাংলা: আদি স্তরের ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য

অপভ্রংশের বিশিষ্ট ছন্দ পাদাকুলককে প্রতি পদে ছিল ষোলো মাত্রা। তা থেকে অর্বাচীন অপভ্রংশের ছন্দ চতুষ্পদীর জন্ম হয়। পাদাকুলকের একমাত্রা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে চতুষ্পদীর প্রতি পদে দাঁড়ায় পনেরো মাত্রা। চতুষ্পদী থেকে বাংলা পয়ার ছন্দের জন্ম হয় 'চর্যাগীতি'-তে। আদি-মধ্য বাংলায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পয়ার ছন্দ পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। চতুষ্পদীর একমাত্রা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পয়ারে দাঁড়িয়েছিল প্রতি পদে চোদ্দ মাত্রায়। যেমন—

'যমুনার তীরে রাধা / কদমের তলে। = ৮ + ৬

তরল করিলেঁ কেহ্নে / নয়ন যুগলে।।' = ৮ + ৬

এই পয়ার ছন্দই আদি-মধ্য বাংলার প্রধান ছন্দ। এছাড়া নানা ছাঁদের ত্রিপদী, একাবলী প্রভৃতি ছন্দের ব্যবহারও পাওয়া যায়।

৮.৬ সারসংক্ষেপ

মধ্যযুগের আদি স্তরের বাংলা ভাষার নিদর্শন হিসেবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-কে গ্রহণ করা হয়। সেটির ভিত্তিতেই এই যুগের ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, অন্বয়তাত্ত্বিক এবং ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। আমরা এই এককে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষনের মাধ্যমে আদি-মধ্যস্তরের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরেছি।

৮.৭ অনুশীলনী

অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন:

১. মধ্যযুগের বাংলার ভাষার আনুমানিক বিস্তৃতিকাল কত?

২. মধ্যযুগের বাংলা ভাষাকে কোন্ দুটি স্তরে বিভক্ত করা যায়? সেগুলি কী কী? দুটি স্তরের কালসীমা উল্লেখ করুন।

৩. আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় কীভাবে যৌগিক স্বর দ্বিস্বররূপে উচ্চারণ হয়েছে, একটি উদাহরণ দিন।

৪. একটি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিন কীভাবে আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় কর্তৃকারকে শূন্যবিভক্তি প্রচলিত ছিল।

৫. আদি-মধ্য বাংলা ভাষার প্রধান ছন্দোরীতিটির নামোল্লেখ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন:

১. সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীভবন আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য।—এই মন্তব্যকে আপনি কতদূর সমর্থনযোগ্য বলে মনে করেন?

২. আদি মধ্যযুগের বাংলা ভাষার যে কোনো তিনটি রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করুন।

৩. আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার যে-কোনো তিনটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করুন।

রচনাধর্মী প্রশ্ন:

১. আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণযোগে আলোচনা করুন।

২. আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? উদাহরণযোগে বুঝিয়ে দিন।

৩. ছন্দোরীতিগত দিক থেকে আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

একক ৯ ❑ মধ্যযুগের বাংলা ভাষা (খ)

গঠন

৯.১ উদ্দেশ্য

৯.২ প্রস্তাবনা

৯.৩ মধ্য বাংলা: অন্ত্য স্তরের ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৯.৪ মধ্য বাংলা: অন্ত্য স্তরের রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৯.৫ মধ্য বাংলা: অন্ত্য স্তরের ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য

৯.৬ মধ্য বাংলা: অন্ত্য স্তরের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

৯.৭ সারসংক্ষেপ

৯.৮ অনুশীলনী

৯.১ উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীরা পূর্বের এককটিতে মধ্যযুগের বাংলা ভাষার আদি স্তরের বিবিধ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে জেনেছে। বর্তমান এককে অন্ত্য-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্যসহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে তারা জানতে পারবে।

৯.২ প্রস্তাবনা

অন্ত্য-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি এই এককে চারটি আঙ্গিকে বিশ্লেষিত হয়েছে— ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, ছন্দোরীতিগত ও বিবিধ। প্রতিটি বৈশিষ্ট্য আলোচনার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে উদাহরণযোগে বিশ্লেষণ করার। এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা আদি-মধ্যযুগের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও অন্ত্য-মধ্যযুগের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনামূলক আলোচনা করতে সক্ষম হবে।

৯.৩ মধ্য বাংলা: অন্ত্য স্তরের ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

অন্ত্য-মধ্য বাংলার স্থিতিকাল ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই যুগের বাংলা ভাষা নানাভাবে সমৃদ্ধ। এই পর্বেই লেখা হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলি, চৈতন্যজীবনী, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, আরাকানের মুসলমান কবিদের রচনা ইত্যাদি। এই সমস্ত রচনায় এই যুগের বাংলা ভাষার পর্যাপ্ত নিদর্শন পাওয়া যায়। অন্ত্য-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি একে একে আলোচিত হল—

F:\Avik\Netaji\2025 New\5CC-BG-02 (CC-BG-02) E-Copy 5CC-BT-02 22.03.25

প্রথমেই ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য—

১) পদের অন্তে একক ব্যঞ্জনের পরে অবস্থিত 'অ'-কার লোপ পেল। যেমন— 'আর্ শূন্যাছ আলো সই গোরাভাবের কথা। / কোণের্ ভিতর্ কুলবধূ কান্দ্যা আকুল্ তথা।।'

ডঃ রামেশ্বর শ' এই সূত্রের ব্যতিক্রমও চিহ্নিত করেছেন। যেমন— 'তৈল বিনে কৈল স্নান করিল উদক পান / শিশু কান্দে ওদনের তরে।'

২) পদের অন্তে যুক্তব্যঞ্জনের পরে অবস্থিত 'অ'-কার লোপ পায়নি। সেটি অবিকৃতরূপেই উচ্চারিত হত। যেমন— 'মিছা কাজে ফিরে স্বামী নাহি চাষবাস। / অন্নবস্ত্র কতেক যোগাইব বারো মাস।''

৩) পদের অন্তে অবস্থিত একক ব্যঞ্জনের পরবর্তী 'অ'-কার ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনিও রক্ষিত হয়েছে। যেমন—'বিশেষে বামন জাতি বড় দাগাদার। / আপনারা এক জপে আরে বলে আর।'

৪) আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দমধ্যস্থ স্বর অনেকক্ষেত্রে লোপ পেয়েছে। যেমন— হরিদ্রা > হল্দি। 'হল্দিবরণ গোরাচাঁদ পড়্যা গেল মনে'। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটিও মধ্য বাংলায় ব্যাপক বিস্তৃতি পায়নি। বরং এর বিপরীত দৃষ্টান্তই বেশি পাওয়া যায়। যেমন— 'হাটে হাটে তোর বাপ বেচিত আমলা। / যতন করিয়া তাহা কিনিত অবলা।।'

৫) অন্ত্য-মধ্যযুগে শব্দমধ্যস্থ 'ই' বা 'উ' অপিনিহিতি বা বিপর্যাসের প্রক্রিয়ায় কখনো কখনো তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে সরে এসেছে। 'উ' কখনো কখনো 'ই'-তে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন—বেগুন > বেউগণ > বাইগণ 'শাক বাইগণ মূলা আট্যা-থোড় কাঁচকলা / সকলে পুরিয়া লয় পাতি।।'

কখনো কখনো বিপর্যাস বা অপিনিহিতির ফলে আগে সরে আসা 'ই' বা 'উ' লোপ পেয়েছে। যেমন—রাখিয়াছি > রাইখ্যাছি > রাখ্যাছি। 'গোধিকা রাখ্যাছি বান্ধি দিয়া জাল-দড়া। ছাল উতারিয়া প্রিয়ে কর শীক পোড়া।।'

যদিও অধিকাংশক্ষেত্রে অপিনিহিতির পূর্ববর্তী রূপই দেখা যায়। যেমন— 'কইর্য্যা' বা 'কর্য্যা'-র বদলে 'করিয়া' রূপই বেশি— 'করিয়া পরম দয়া দিয়া চরণের ছায়া / আজ্ঞা মোরে করিলা পার্বতী।'

৬) মহাপ্রাণ নাসিক্য (অর্থাৎ বর্গের 'হ'-যুক্ত পঞ্চম বর্ণ) অল্পপ্রাণ নাসিক্য (অর্থাৎ বর্গের 'হ'-বিহীন পঞ্চম বর্ণ) বর্ণে পরিণত হতে আরম্ভ করেছিল আদি-মধ্যযুগের বাংলাতেই। অন্ত্য-মধ্যযুগে এসে

এই প্রবণতা ব্যাপকতর হল। যেমন— আহ্মি > আমি, তুহ্মি > তুমি, আহ্মার > আমার, তোহ্মার > তোমার।

'দড় বেঞ্জন আমি যেই দিনে রান্ধি
মারয়ে পিঁড়ির বাড়ি কোণে বস্যা কান্দি।'
'আনের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।'

কোনো কোনো ভাষাতাত্ত্বিকের মতে, 'ঢ়'-এরও মহাপ্রাণতা লোপ পেয়েছে। অর্থাৎ 'ঢ়' হয়েছে 'ড়'। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য অন্ত্য-মধ্যযুগের শেষদিকেও যে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, এমন নয়। মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের লেখাতেই পাই— 'ওরে বুঢ়া আঁটকুড়া নারদ অল্পেয়ে। / হের বর কেমনে আনিল চক্ষু খেয়ে।।'

৯.৪ মধ্য বাংলা: অন্ত্য স্তরের রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১) ব্যাকরণগত লিঙ্গানুশাসনের অবলুপ্তি ঘটেছে এখানে।

২) নামমূলক কর্তার বহুবচনে '-রা' বিভক্তি (যদিও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ কেবল সর্বনাম শব্দেই প্রাপ্তব্য) এবং নির্দেশক বহুবচনে '-গুলা', '-গুলি' প্রত্যয়ের ব্যবহার (সাফল্যবাচক বা তুচ্ছার্থক) এবং তীর্যক কারকের বহুবচনে '-দি', '-দিগ' প্রত্যয়ের প্রয়োগ লক্ষনীয়। যেমন— 'কে বলে শারদ শশী ও মুখের তুলা।/পদনখে পড়ে আছে তার কতগুলা।।' '-দিগ' আবির্ভূত হয়েছে সম্ভবত সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে।

৩) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কর্তৃকারকের, আহ্মে/তোহ্মে (> অন্ত্য-মধ্য বাংলায় আমি/তুমি, তোমি) একবচন ও বহুবচনে সমান্তরালভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু অন্ত্যস্তরে পদগুলির একবচনে স্থানান্তর সম্পূর্ণ হয়েছে। গৌণ কারকের 'আহ্মা'-/'তোহ্মা-' > 'আমা-'/'তোমা-' সর্বনামমূলক সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। যেমন— 'দড় বেঞ্জন আমি যেই দিনে রান্ধি/মারয়ে পিঁড়ির বাড়ি কোণে বস্যা কান্দি'। কিংবা 'আনের আছয়ে অনেক জনা/আমার কেবল তুমি।'

৪) গৌণ কারকে 'মোহ'-/'তোহ-' (< মভ্যম্ / তুভ্যম্) সর্বনামের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। কর্তৃকারকের 'মো-'/'আমা-', 'তো-'/'তোমা-'—এই প্রাচীন সর্বনামগুলির মধ্যে 'মো-' ক্রমশই অপ্রচলিত এবং 'তো-' হয়ে উঠেছিল তুচ্ছার্থবাচক।

৫) সম্ভ্রমার্থক সর্বনাম-কর্তার প্রসার ঘটে। যেমন— তিঁহি/তিনি, ইঁহো/ইনি।

৬) মুখ্য ও গৌণ কর্মকারকের প্রকৃত পার্থক্য দু'-চারটি রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ ব্যতীত এই স্তরে লুপ্ত হয়েছে।

৭) ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ছিল '-র', '-এর' ইত্যাদি। যেমন— 'হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।/পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।' বা 'রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।/যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।।'

৮) 'য়', '-এ', '-তে' সপ্তমী বিভক্তিরূপে প্রযুক্ত হতে থাকে। যেমন, 'উই চারা খাই বনে জাতিতে ভালুক।/নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক।।' কিংবা, 'ধূলায় ধূসর হয়্যা কান্দয়ে হস্তিনী।/মিথ্যা বর দিয়া কেন বধ কর প্রাণী।।'

৯) অন্ত্য-মধ্য বাংলায় ক্রিয়াপদের পরিবর্তনই ঘটেছে সর্বাধিক। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর তুলনায় তার বৈচিত্র্যসম্ভারও অনেক বেশি। অন্ত্য-মধ্য বাংলা ক্রিয়াপদের বৈশিষ্ট্যগুলি নানারূপ। যেমন—

মধ্য-বাংলায় বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদ কর্মবাচ্য থেকে উদ্ভূত বলে পদগুলি মূলত বিভক্তিহীন রয়ে গেছে। বিশেষত প্রথম ও উত্তম পুরুষের ক্ষেত্রে এই বিভক্তিহীনতা আদি স্তরেই লভ্য। যেমন, (আহ্মে) করি/করিল/করিব ইত্যাদি। কিন্তু ক্রিয়ার পুরুষবাচক বিভক্তি গ্রহণ অন্ত্যস্তর-সূচক। যেমন—

মধ্য-বাংলা	বর্তমানকাল	অতীতকাল	ভবিষ্যৎকাল
আদি	আহ্মে করিএ/করী	আহ্মে করিল/কৈল	আহ্মে করিব
অন্ত্য	আমি করি	আমি করিলাঙ/করিলুঁ কৈলাম/কৈনু	আমি করিমুঁ/ করিবাম্

১০) অনেকসময় প্রথম পুরুষের বিভক্তিহীন পদও সম্ভ্রমার্থে ব্যবহৃত হত। কারণ এই বিভক্তিহীন পদগুলো ছিল মূলত কর্মবাচক এবং কর্তার সঙ্গে সম্পর্কহীন। যেমন— 'তাঁরা রহে একপাশ', 'তিহোঁ সুনাইব', 'বড় লজ্জা পাইল তিহোঁ' ইত্যাদি।

১১) অন্ত্য-মধ্যবাংলায় কখনো কখনো বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎকালে সাধারণ বিভক্তিও তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হত। যেমন— 'তোরা প্রাণ যদি চাহ', 'তোরা ঝাঁপ দিবে জলে, 'তোরা মরেছিলে' ইত্যাদি।

১২) অন্ত্য-মধ্য বাংলায় অতীতকালে মধ্যম পুরুষে '-ইলা' বিভক্তির প্রচলন হয়ে উঠেছিল ব্যাপক— যা ছিল ঈষৎ সম্ভ্রমার্থক। ভবিষ্যৎকালের প্রথম পুরুষের বিভক্তি '-ইবে' অন্ত্য-মধ্য বাংলায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর তুলনায় অনেক ব্যাপক। তবে, মধ্যম পুরুষের '-ইবা' বিভক্তি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ মেলে না।

যেমন—

উত্তম পুরুষ: ‘সেই পুণ্যের ফলে কবি হৈয়া শিশুকালে
রচিলাঙ তোমার সঙ্গীতে।’

প্রথম পুরুষ: ‘ধনি ধনি কলিকালে রত্না নদীর কূলে
অবতার করিলা শঙ্কর
ধরি চক্রাদিত্য নাম দামুন্যা করিল ধাম
তীর্থ কৈলা সেই ত নগর।।’

সাধারণ ভবিষ্যৎকালের উত্তম পুরুষের বিভক্তি ছিল ‘-ইব’। যেমন—

‘সখীর উপরে দেহ তণ্ডুলের ভার।
তোমার বদলে আমি কবির পসার।।’

১৩) কিছু সংস্কৃত নামশব্দকে ক্রিয়ার ধাতুরূপে গ্রহণ করে তার সঙ্গে ক্রিয়ার বিভক্তি যোগ করা হত। নামধাতুর এই বহুল ব্যবহার অন্ত্য-মধ্য বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন, নমস্কার + ইলা = নমস্কারিলা।

১৪) মূল ক্রিয়ার অসমাপিকা রূপের সঙ্গে √আছ্ যোগ করে যৌগিক কালের রূপ গঠন করা হত। যেমন ‘গোধিকা রাখ্যাছি বান্ধি দিয়া জাল দড়া।/ছাল উতারিয়া প্রিয়ে কর শীক-পোড়া।।’

১৫) কোনো একটি ধাতুর পরিবর্তে যৌগিক ক্রিয়ার প্রচলন অন্ত্য-মধ্য বাংলার বহু তদ্ভব ধাতুকে অপ্রচলিত করে দিয়েছে। যেমন, ‘জিনা’ স্থলে ‘জয় করা’; ‘হুনে’ স্থলে ‘হোম করে’ ইত্যাদি। এছাড়া পাই ‘বাহুড়া’ ও ‘নেওটা’। এর অর্থ ‘ঘুরিয়া বা ফিরিয়া আসা’। ‘বুলা’ অর্থে ‘চলিয়া বেড়ানো’, ‘পিয়া’ অর্থে ‘পান করা’, ‘বসা’ অর্থে ‘বাস করা’, ‘গোড়া’ অর্থে ‘পিছু পিছু যাওয়া’ বা ‘অনুগমন করা’— এগুলির প্রয়োগও অন্ত্য-মধ্য স্তরের বাংলায় লক্ষ করা যায়।

৯.৫ মধ্য বাংলা: অন্ত্য স্তরের ছন্দোরীতিগত বৈশিষ্ট্য

অন্ত্য-মধ্য স্তরের বাংলায় পয়ার ছন্দের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণ কাহিনিমূলক রচনা ছাড়াও উচ্চাঙ্গের দার্শনিক রচনায় পয়ার ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন ছাঁদের ত্রিপদী ছন্দেরও প্রয়োগ ছিল। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বৈষ্ণব কবিতায় অপভ্রংশের চতুষ্পদী ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়।

৯.৬ মধ্য বাংলা: অন্ত্য স্তরের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

১) মধ্য যুগে বাংলা ভাষা ছিল মুসলমান শাসিত। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই অন্ত্য-মধ্য বাংলার প্রথম

পর্বে বহু পরিমাণে আরবি, ফারসি, তুর্কী শব্দের এবং শেষ পর্বে বেশ কিছু পর্তুগীজ শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে, যেমন—আরবি শব্দ হল 'গজব', 'আজব', 'আদমি', 'আইন', 'কেতাব', 'খাজনা' ইত্যাদি। ফারসি শব্দ যেমন— 'দার' (ডিহিদার), 'গিরি' (বাবুগিরি), 'গোলাপ' (< গুলাব) ইত্যাদি। তুর্কী শব্দের ক্ষেত্রে যেমন 'খাঁ', 'খাতুন', 'দারোগা', 'বিবি', 'বেগম' ইত্যাদি বাংলা ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। ভারতচন্দ্রের লেখাতেই এর উদাহরণ মেলে। যেমন— 'পাতশা কহেন শুন মানসিংহ রায়।/গজব করিলে তুমি আজব কথায়।।/লস্করে দু'-তিন লাখ আদমি তোমার।/হাতী ঘোড়া উট গাধা খচর যে আর।।'

২) ব্রজবুলি ভাষা— 'মিথিলার কবি বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষায় রচিত বৈষ্ণব পদ এক সময় বাঙালির খুব প্রিয় ছিল। এরই মাধ্যমে বাংলা ভাষার সঙ্গে মৈথিলী ভাষার ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। মূলত মৈথিলী ভাষা ও অংশত অবহট্‌ঠ ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার মিশ্রণে অন্ত্য-মধ্যযুগের বাঙালি বৈষ্ণব কবিরা একটি সাহিত্যিক ভাষার সৃষ্টি করেন। ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশে এই কৃত্রিম কাব্যভাষায় অজস্র রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ লেখা হয়েছিল। ব্রজবুলির মূলে আছে এই অবহট্‌ঠ ভাষা। আসাম ও বাংলা ছাড়া অন্যত্র ব্রজবুলির চর্চা ফলপ্রসূ হয়নি। ব্রজবুলির ছন্দ অবহট্‌ঠ ও মৈথিলীর মতোই মাত্রামূলক।

বৈষ্ণবপদে ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহার অন্ত্য-মধ্য যুগের বাংলা ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন— 'যাঁহা পহুঁ অরুণা চরণে চলি যাত।/তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত।/যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।/হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ।'

৯.৭ সারসংক্ষেপ

মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অন্ত্যস্তরের নিদর্শন হিসেবে বৈষ্ণব পদাবলি, চৈতন্যজীবনীকাব্য, মঙ্গলকাব্য, অন্নদামঙ্গল, অনুবাদ গ্রন্থ ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে। মূলত সেগুলির ভিত্তিতেই এই যুগের বিবিধ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৯.৮ অনুশীলনী

(ক) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন:

১. অন্ত্য-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার কালসীমা উল্লেখ করুন।

২. শ্বাসাঘাতের ফলে স্বরধ্বনি লোপের একটি উদাহরণ দিন।

৩. একটি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিন যে, অন্ত্য-মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় কীভাবে অল্পপ্রাণীভবন প্রচলিত ছিল?

৪. নামধাতুর সঙ্গে ক্রিয়া বা শব্দবিভক্তিযোগে নতুন শব্দ গঠিত হয়েছে—অন্ত্য-মধ্যযুগের বাংলা ভাষা থেকে এরকম একটি উদাহরণ দিন।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. অন্ত্য-মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদের বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণযোগে বুঝিয়ে দিন।

২. টীকা লিখুন : ব্রজবুলি।

৩. মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অন্ত্যস্তরে কীভাবে বিবিধ বিদেশি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল?

৪. অন্ত্য-মধ্য যুগের বাংলা ভাষায় কীভাবে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার প্রচলিত ছিল?

(গ) রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. অন্ত্য-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণযোগে আলোচনা করুন।

২. মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অন্ত্যস্তরের রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

৩. মধ্যযুগের বাংলা ভাষার দুটি স্তরের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের একটি তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৪. ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষার পার্থক্য উদাহরণযোগে নির্দেশ করুন।

একক ১০ ❑ আধুনিক বাংলা ভাষা: প্রথম পর্ব

গঠন

১০.১ উদ্দেশ্য

১০.২ প্রস্তাবনা

১০.৩ আধুনিক বাংলা ভাষা : পর্ব বিভাজন

১০.৪ আধুনিক বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১০.৫ সারসংক্ষেপ

১০.৬ অনুশীলনী

১০.১ উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীরা এর আগে প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে জেনেছে। বর্তমান এককে তারা আধুনিক যুগের বিবিধ ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে জানতে পারবে।

১০.২ প্রস্তাবনা

আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার বিস্তৃত কালপর্বকে কয়েকটি ভাগে এই এককে বিভক্ত করা হয়েছে। এরপর আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণযোগে আলোচিত হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে আছে ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, অন্বয়তাত্ত্বিক এবং ছন্দোরীতিগত নানা বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার্থীরা এই এককটি পাঠ করলে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক কাঠামোর পার্থক্যগুলি চিহ্নিত করতে পারবে।

১০.৩ আধুনিক বাংলা ভাষা: পর্ব বিভাজন

আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকে আধুনিক বাংলার গোড়াপত্তন শুরু হয়েছে। গদ্যসাহিত্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় এই আধুনিকতার সূত্রপাত। ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের বিচারে বাংলা ভাষা প্রাচীন যুগ থেকে বিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা ভাষার স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে।

আধুনিক বাংলা ভাষার কালসীমা বিস্তীর্ণ। ডঃ পরেশচন্দ্র মজুমদার এই আধুনিক বাংলা ভাষাকে কয়েকটি কালপর্বে বিভক্ত করেছেন। যেমন—

১. সূচনা পর্ব (১৫০০ — ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ)

F:\Avik\Netaji\2025 New\5CC-BG-02 (CC-BG-02) E-Copy 5CC-BT-02 22.03.25

২. উন্মেষ পর্ব (১৭৪৩ — ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ)

৩. অভ্যুদয় পর্ব (১৮১৮ — ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ)

৪. বিকাশ পর্ব (১৮৪৭ — বর্তমান কাল)

অনেক ভাষাতাত্ত্বিকই স্বাভাবিক কারণে এই যুগবিভাজন মেনে নিতে পারেননি। কারণ, মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে। এই সময়কালকেই বাংলা ভাষায় মধ্যযুগের সমাপ্তি এবং আধুনিক যুগের সূচনা হিসেবে মনে করা হয়। অর্থাৎ, আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলা ভাষার আধুনিক যুগের বিস্তৃতিকাল।

১। সুচনাপর্ব (১৫০০ - ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ):

অষ্টাদশ শতকের বাংলার সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল গদ্যসাহিত্যের আবির্ভাব। যদিও, গদ্যের পরিচিতি বাংলা ভাষায় একেবারে নতুন নয়। কারণ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে রচিত বাংলা গদ্যেরও কিছু কিছু নমুনা পাওয়া গেছে। এগুলি প্রধানত বৈষ্ণব সাধকদের কারিকা, কুলজীগ্রন্থ বা দেহ-কড়চা জাতীয় প্রশ্নোত্তরমালা অংশ (মৌলিক অথবা অনুবাদ), চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ সংক্রান্ত বৈষয়িক রচনা অথবা নাটকীয় সংলাপ-আশ্রিত মৌখিক রচনাংশ। যেমন, ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে অহোমরাজ স্বর্গনারায়ণকে লিখিত কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের পত্র, গৌহাটীর তদানীন্তন ফৌজদারকে লিখিত জনৈক অহোমরাজের লেখা চিঠি (১৬৩১ খ্রি.), ঢাকা অঞ্চলের উপভাষায় লেখা প্রাচীন চুক্তিপত্র (১৬৯৬ খ্রি.), নরোত্তমদাসের দেহকড়চা (১৬৮১-৮২ খ্রি.} গোপীচন্দ্র নাটকে উল্লিখিত নাটকীয় সংলাপ (১৭শ শতক) ইত্যাদি।

অষ্টাদশ শতকে রচিত গদ্যনিবন্ধও দুর্লভ নয়। যেমন, ১৭৭১-এ ছেলে গুরুদাসকে লেখা মহারাজ নন্দকুমারের চিঠি, গৌড়ীয় মোহান্তদের লেখা ইস্তফা ও পরাজয়পত্র, ১৭৩১-এ সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্যের 'অজয়পত্র', 'ভাষা পরিচ্ছেদ'-এর অনুবাদের সূচনা অংশ (১৭৭৪-৭৫ খ্রি.), 'মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র' নামক গদ্য গল্পের রচনাংশ (১৮শ শতক) ইত্যাদি।

তবে, বাংলা হরফে সর্বপ্রথম মুদ্রিত বাংলা গদ্যের নমুনা হল, হালহেড্ রচিত বাংলা ব্যাকরণে উদ্ধৃত একটি পত্র (১৭৭৮ খ্রি.)।

২। উন্মেষ পর্ব (১৭৪৩-১৮১৮ খ্রি.):

ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা গদ্যের প্রগতি ও ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলেও বাংলা গদ্যের উন্মেষ পর্বের প্রকৃত সূত্রপাত ঘটল ১৭৪৩ খ্রি. থেকে। রোমান হরফে লিখিত হলেও বাংলা গদ্য প্রথম স্থিরত্ব লাভ করল ১৭৪৩-এ; সেইসঙ্গে সূচিত হল বাংলা গদ্যে বিদেশি প্রভাব। গদ্য রচনার লেখক হিসেবে বিধর্মী লেখকেরা প্রধানত ধর্মপ্রচারকরূপেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই প্রশ্নোত্তরমূলক বৈষ্ণবীয়

কড়চা-নিবন্ধগুলিই তাঁদের সাহিত্যিক রচনার আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠেছিল। তাই বাংলা গদ্যের অনুশীলন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অস্বীকার করা চলে না। তাঁরা বাংলা সাহিত্যে যে-নতুন যুগ আনলেন, সেই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

প্রথমত, ইউরোপীয় ভাষার প্রভাব বাংলা গদ্যে দেখা দিল। বাংলা শব্দভাণ্ডারে পর্তুগীজ ও ইংরেজি শব্দাবলীর অনুপ্রবেশ ভাষাকে করল সমৃদ্ধ। বাংলা বাক্যগঠনেও ইউরোপীয় ভাষার প্রভাব লক্ষ করা গেল।

দ্বিতীয়ত, বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র্য পাশ্চাত্য প্রভাবেই পল্লবিত হয়ে উঠল। চিঠিপত্র ও দলিলের যুগ অতিক্রম করে বাংলা গদ্য বিচিত্র বিষয়ে অনুপ্রবেশ করল। ফলে, সংস্কৃত, ইংরেজি, অথবা যেকোনো প্রাদেশিক ভাষায় রচিত বিভিন্ন বিষয়ধর্মী গ্রন্থের অনুবাদ, প্রচারপুস্তিকা, আইনগ্রন্থের অনুবাদ, ব্যাকরণ, বর্ণপরিচয়, অভিধান বা শব্দকোষ, পাঠ্যপুস্তক, বিজ্ঞানমূলক রচনা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা যেকোনো সমৃদ্ধতর ভাষার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল।

তৃতীয়ত, ধর্মীয় প্রচার সর্বজনীন করে তোলার তাগিদে ইউরোপীয় ধর্মপ্রচারকরা বাংলা ভাষার আঞ্চলিক কথ্য বা মৌখিক রূপটি সাহিত্যে আমদানি করলেন। বাংলার প্রাচীন গদ্যে সেই নিদর্শন মেলে।

চতুর্থত, ব্যবহারিক জীবনে প্রাত্যহিক প্রয়োজনে বাংলা ভাষার মৌখিক ও বৈষয়িক গদ্যরীতি অযথা 'যাবনীমিশাল' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাংলা গদ্যে এই আরবি-ফারসির অযথা অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধাচরণ করলেন এই বিদেশী সুধীসমাজ। বস্তুত, ১৭৭৮-এ হালহেড্ ও পরবর্তীকালে হেনরি পিট্‌স্ ফরস্টার ও উইলিয়াম কেরী প্রমুখ বিদ্বজ্জনের প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যে আরবি ফারসির বদলে স্থান পেতে শুরু করল প্রকৃত বাংলা ও সংস্কৃত। তাঁদেরই সমবেত প্রয়াসে বাংলা লিখিত গদ্যের একটি পরিশীলিত সাধু আদর্শ গড়ে উঠল। পাশাপাশি, বাংলা গদ্যে তৎসম শব্দের বানানে যে নির্বিকার স্বেচ্ছাচারিতা চলছিল, কেরী প্রমুখের প্রচেষ্টায়, ব্যাকরণ, অভিধান ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচারের ফলে, বিশেষত মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারে, বাংলা পাঠ্যপুস্তকে বানানপদ্ধতির বিশুদ্ধিকরণ ঘটল।

পঞ্চমত, বাংলা গদ্য সর্বপ্রথম ছাপাখানা ও ছাপার অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত হল। রোমান হরফে লেখা হলেও বাংলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (১৭৪৩ খ্রি.)। ইংরেজি ভাষায় লিখিত হালহেড্-এর বাংলা ব্যাকরণে (১৭৭৮ খ্রি.) মুদ্রিত বাংলা হরফ সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হল এবং বাংলা মুদ্রণ অক্ষরের স্রষ্টা হলেন স্যার চার্লস্ উইলকিন্‌স্— যাঁর কাছে শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্মকার বাংলা হরফ তৈরি করা শিখেছিলেন।

বাংলা গদ্যরীতির ধারায়, এই পর্বের অন্যান্য লেখক ও তাঁদের রচনাগুলি হল—

১. দোম আন্তোনিও-দো রোজারিও : ব্রাহ্মন-রোমান-ক্যাথলিকসংবাদ: সম্ভবত ১৭৩৫ সালে রচিত,

১৭৪৩ সালে প্রকাশিত। মানোএল-দা-আস্‌সুম্পসাওঁ ছিলেন এর সম্পাদক। এটি পর্তুগীজ ভাষায় অনূদিত। পর্তুগালের লিসবন থেকে এটি মুদ্রিত হয়েছিল।

২. মানোএল-দা-আস্‌সুম্পসাওঁ: (ক) কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ। এটি ১৭৪৩ সালে রোমান অক্ষরে লিসবন থেকে মুদ্রিত। (খ) বাঙ্গালা ও পর্তুগীজ ভাষার শব্দকোষ ও ব্যাকরণ। এটি সম্ভবত ১৭৩৪ সালে রচিত। লিসবন থেকেই ১৭৪৩ সালে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত।

৩. নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড্ রচিত বাংলা ব্যাকরণ: A Grammar of the Bengal Language: এটি হুগলী থেকে ১৭৭৮ সালে মুদ্রিত।

৪. জোনাথান ডানকান: দেওয়ানি আইন সংক্রান্ত ইম্পে কোডের বঙ্গানুবাদ। (Regulations for the Administrations of Justice in the Courts of Dewanee Adaulut। এটি ১৭৮৫-তে কলকাতার The Honourable Company's Press থেকে মুদ্রিত।

৫. নীল বেঞ্জামিন এডমনস্টোন: ফৌজদারী আইন সংক্রান্ত অনুবাদ (Bengal Translation of Regulations for the guidance of the Magistrates)। এটি ১৭৯২-এ কলকাতার The Honourable Company's Press থেকে মুদ্রিত।

৬. হেনরি পিট্‌স্ ফরস্টার: (ক) আইন সংক্রান্ত কর্ণওয়ালিস কোডের বঙ্গানুবাদ। এটি ১৭৯৩-এ কলকাতা থেকে মুদ্রিত। (খ) ইংরেজী বাঙলা শব্দকোষ এবং বাঙলা-ইংরেজী শব্দকোষ (A Vocabulary in Two Parts, English & Bengali and vice versa)—প্রথম খণ্ড ১৭৯৯, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮০১ সালে প্রকাশ পায়। এটি কলকাতার কেরিস এণ্ড কোম্পানীজ প্রেস থেকে মুদ্রিত।

৭. এ. আপজন: 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি'। কলকাতার দি ক্রনিকল প্রেস থেকে ১৭৯৩ সালে এটি মুদ্রিত।

৮. জন মিলার: The Tutor বা 'সিক্ষ্যাগুরু'। এটি ১৭৯৭ সালে প্রকাশিত। মুদ্রণস্থল সম্ভবত কলকাতা।

তবে, ১৮০০ সালে ওয়েলেসলি-প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা গদ্যের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটল। এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের দেশিয় ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। ফলে, বাংলা ভাষায় প্রথম পাঠ্যপুস্তকের প্রবর্তন হল। এই পাঠ্যপুস্তকগুলি মূলত লিখেছিলেন কলেজের পণ্ডিত ও শিক্ষকগণ। কিন্তু এর প্রাণকেন্দ্রে ছিলেন উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪ খ্রি.)। কেরীর নিজস্ব বাংলা রচনা কোন্‌গুলি, তা আর বোঝার কোনো উপায় নেই। কারণ, অধিকাংশ বই কেরীর নামে প্রকাশিত হলেও সেগুলি মূলত ছিল যৌথসৃষ্টি। এই জাতীয় প্রধান রচনাগুলি হল—

১. 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' (১৮০০ খ্রি.): মুদ্রণস্থল শ্রীরামপুর। শ্রীরামপুর মিশন প্রকাশিত প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ এটি। এটি টমাস ও রামরাম বসু কর্তৃক অনূদিত ও কেরী কর্তৃক সংশোধিত।

২. সমগ্র নিউ টেস্টামেন্ট অনুবাদ (১৮০১ খ্রি.): এটির সম্পাদক উইলিয়াম কেরী হলেও অনুবাদ করেন টমাস, রামরাম বসু, কেরী ও ফাউন্টেন। কেরীর জীবদ্দশায় এটির মোট আটটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৩. ওল্ড টেস্টামেন্ট অনুবাদ (৪ খণ্ডে) (১৮০২-১৮০৯): এটি টমাস-রামরাম বসু-ফাউন্টেন-মার্শম্যান প্রমুখ কর্তৃক মূল হিব্রু ভাষা থেকে বাংলায় অনূদিত, মুদ্রণস্থল শ্রীরামপুর।

৪. বাংলা ব্যাকরণ: A Grammar of the Bengalee Language by William Carey। এটি ১৮০১-এ প্রকাশিত ও কেরীর জীবদ্দশায় এটির মোট চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

৫. বাংলা-ইংরেজি অভিধান: A Dictionary of the Bengalee Language। এটির দু'টি খণ্ড। প্রথমটি ১৮১৮ ও দ্বিতীয়টি ১৮২৫-এ প্রকাশিত।

৬. কথোপকথন (Dialogues): কেরী রচিত এই বইটি শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ১৮০১-এ প্রকাশিত।

৭. ইতিহাসমালা: শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ১৮১২ সালে প্রকাশিত এই বইটি সংকলন করেন কেরী সাহেব।

এছাড়া ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কাউন্সিল-আয়োজিত আলোচনাচক্রে পঠিত কয়েকটি বাংলা প্রবন্ধও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যেমন, মার্টিন রচিত 'আসীসীয়েরা ইয়ুরোপীয়েরদের মত নীতিজ্ঞ হইতে পারিবে' (১৮০২); হান্টার রচিত 'হিন্দুলোকেরা ভিন্ন ২ জাতি এই প্রযুক্ত তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধির হানি হয়' (১৮০৩); টড্ রচিত 'মূল সংস্কৃত গ্রন্থ চলিত ভাষাতে তরজমাতে বিদ্যা প্রচার হয় এবং লোকেরদের নীতিজ্ঞতাচরণ দ্বারা উপকার হয়' (১৮০৪) ইত্যাদি।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অন্যান্য শিক্ষক ও সহযোগীদেরও পৃথক পৃথক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। মূলত ভাষাশিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত পাঠ্যপুস্তকজাতীয় এই রচনাগুলি হল—

১. রামরাম বসু: 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১), 'লিপিমালা' (১৮০২)।

২. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার: 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'রাজাবলি' (১৮০৮), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮), 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (রচনাকাল আনুমানিক ১৮১৩, মুদ্রণকাল ১৮৩৩) এবং 'বেদান্তচন্দ্রিকা' [১৮১৭, রামমোহনের 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার'-এর (১৮১৫) প্রতিবাদে লিখিত।]

৩. গোলোকনাথ শর্মা: 'হিতোপদেশ' (১৮০১)।

৪. তারিণীচরণ মিত্র: 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' (১৮০৩), 'নীতিকথা' (১৮১৮, সহকারী লেখক—রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন)

৫. **চণ্ডীচরণ মুনশী:** 'তোতা ইতিহাস' (১৮০৫)।

৬. **রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়:** 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' (১৮০৫)।

৭. **রামকিশোর তর্কচূড়ামণি:** 'হিতোপদেশ' (১৮০৮)।

৮. **হরপ্রসাদ রায়:** 'পুরুষপরীক্ষা' (১৮১৫)।

৩. অভ্যুদয় পর্ব (১৮১৮-১৮৪৭)

বাংলা গদ্যের তৃতীয় পর্বের সূত্রপাত হল ১৮১৮ সালে। এই সময় বাংলা সাময়িকপত্রের আবির্ভাব ঘটল। এই যুগটিই বাংলা গদ্যের অভ্যুদয় পর্ব। ভাষাগত আদর্শের নিরিখে এই যুগ যদিও পূর্ববর্তী যুগকেই অনুসরণ করে চলেছে, ভাষাচিত্রে কোনো যুগান্তকারী পরিবর্তন সেভাবে পরিলক্ষিত হয়নি; তবুও এই যুগে মানসিকতার নব অভ্যুদয় ঘটে। ঘটে আত্মচেতনার নবজাগৃতি। জাতীয়-জীবন পুনরুজ্জীবনের অনিবার্য পরিণতিরূপে তাই এই সময়ের বাংলা গদ্যও হয়ে ওঠে পরিণত।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের সূচনা ও উন্মেষপর্বে গদ্যরীতি ছিল পারিবারিক, বৈষয়িক বা বিশেষ প্রতিষ্ঠান-গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশের বাহনমাত্র। কিন্তু অভ্যুদয় পর্বে এসে দেখা গেল, গদ্যরচয়িতার পাঠক কোনো ব্যক্তিবিশেষ নন। ফলে, গদ্যসাহিত্য সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যের চোরাকুঠুরী থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল নিত্য চলাচলের রাজপথে। এই পরিস্থিতিতেই উদ্ভূত হল বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা।

১৮১৮ পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যের ওপর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তথা শ্রীরামপুর মিশনারিদের প্রভাব স্তিমিত হয়ে এল। ফলে, কেরী-পরবর্তী ইউরোপীয় বিদগ্ধজন যেমন, শ্রীরামপুরের ফেলিক্স্ কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান, পীয়ার্স, ম্যাক্, ইয়েটস্, এলার্টন, স্টুয়ার্ট, হার্লি, মে, গীয়ার্সন প্রমুখ প্রায় যেন জনমানসের অন্তরালে চলে গেলেন। আর এই সহৃদয় বৈদেশিকদের পরিবর্তে এই যুগের নেতৃত্ব দিলেন কেরী, রামরাম বসু বা মৃত্যুঞ্জয়ের মতো কোনো প্রচারক নন; বরং সংস্কৃতিবান, সমাজসচেতন মধ্যবিত্ত জনগণের প্রতিভূস্বরূপ রামমোহন বা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ যুগন্ধর পুরুষ।

এই যুগপ্রধানদের মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছেন হিন্দু রক্ষণশীলরা; যেমন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, তারিণীচরণ মিত্র, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রমুখ; অথবা খ্রিস্টান পাদ্রিরা (মূলত শ্রীরামপুরের মিশনারিরা), তেমনি অন্যদিকে রয়েছেন রামমোহনপক্ষীয় যুক্তিনিষ্ঠ তার্কিত সংস্কারবাদীরা। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, হিন্দু কলেজের প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব প্রমুখ। নব্যশিক্ষিত প্রধানদের মধ্যে ছিলেন ডেভিড হেয়ার এবং ডিরোজিও। এরা হয়ে উঠলেন 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর নায়ক। তাঁরা প্রায় সমস্ত ধর্মের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। এই সময়ে বাঙালির ধর্ম, সমাজ ও

রাজনৈতিক চেতনার অভ্যুত্থানের পাশাপাশি দেখা দিল ইউরোপীয় নবজাগরণের ধারণালব্ধ নতুন আধুনিক ভাবধারা, স্বাধিকারচেতনা।

এই যুগেই আবির্ভূত হল বাংলা সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র। ১৮১৮ থেকে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অন্তত বাহাত্তরটি সংবাদ ও সাময়িকপত্র বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়। এই পর্বের বিশেষ কয়েকটি পত্রিকা হল— *দিগ্‌দর্শন* (এপ্রিল, ১৮১৮), *সমাচারদর্পণ* (১৮১৮), গঙ্গাধর ভট্টাচার্য প্রকাশিত *বাঙ্গাল গেজেটি* বা *Bengal Gazette*, তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত *সংবাদকৌমুদী* (১৮২১), ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *সমাচার চন্দ্রিকা* (১৮২২), নীলরতন হালদারের *বঙ্গদূত* (১৮২৯), ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত *সংবাদ প্রভাকর* (১৮৩১), অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকা (১৮৪৩) ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্য ও গদ্যের প্রস্তুতি পর্ব সংবাদপত্রকে আশ্রয় করেই অনেকাংশে বিস্তার লাভ করেছে। তাই অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় যাঁরা বাংলা গদ্যের ভিত গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই সাময়িকপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এঁদের সম্মিলিত অনুপ্রেরণাতেই বাংলা গদ্য আভিধানিক অচলতা অথবা প্রাতিষ্ঠানিক সংকীর্ণতা ছিন্ন করে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছিল। সংস্কৃতবহুল পণ্ডিতী রীতি বা ফারসিবহুল আদালতী রীতির দ্বিধা কাটিয়ে বাংলা ভাষা হয়ে উঠতে পেরেছিল সর্বজনের ব্যবহারযোগ্য। পরবর্তী যুগের ‘আলালী’ রীতি এবং বিদ্যাসাগরী রীতির পূর্বসূচনা হিসেবে তাই এই পর্বের গুরুত্ব অপরিসীম।

৪. বিকাশ পর্ব (১৮৪৭ খ্রি. — বর্তমান কাল)

বাংলা ভাষার চতুর্থ পর্বকে বলা যায় বাংলা গদ্যের ‘বিকাশ পর্ব’। ১৮৪৭-এ বিদ্যাসাগরের ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’-র প্রকাশকাল থেকে যার সূত্রপাত। এই যুগে বাংলা গদ্যরীতিতে ঘটল আমূল পরিবর্তন। একে বলা যেতে পারে যুগান্তকারী বিপ্লব।

বিদ্যাসাগর বাঙালিকে শোনালেন বাংলা গদ্যের নিজস্ব ছন্দ, দেখালেন তার লালিত্য ও নমনীয়তা, নিয়ে এলেন যতিচিহ্নিত গদ্যে বাক্যগঠনরীতির সৌষম্য ও ছন্দস্রোত। পাশাপাশি অক্ষয়কুমার দত্তের নিপুণ লেখনীতে বাংলা গদ্যে প্রতিষ্ঠিত হল গদ্যরচনার দার্ঢ্য, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী তথ্যনিষ্ঠা ও বিষয়বৈচিত্র্য। আর, ১৮৬৫-তে বঙ্কিমের ‘দুর্গেশনন্দিনী’র আত্মপ্রকাশে বাংলা গদ্য এক নতুন পথে যাত্রা শুরু করল।

বাংলা গদ্যের অভ্যুদয় ও বিকাশ পর্ব রচিত হয়েছে বাঙালির জীবনের এক উদার বিস্তৃত পটভূমির অবসরে। বিভিন্ন সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত, ধর্মীয় সংস্কারমুক্তি, রাজনৈতিক ঘটনাবলি ও পাশ্চাত্য জীবনমহিমায় জাগ্রত জীবনচেতনাবোধ— এই সমস্ত মিলিয়েই রচিত হয়েছে এই যুগের চলমান চিত্র। এই যুগের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল—

১. রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব এবং তাঁর ‘বেদান্তগ্রন্থ’ ও ‘বেদান্তসার’ (১৮১৫)।

২. ডিরোজিও-র আবির্ভাব (১৮০৯-১৮৩১) ও 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর উদ্ভব (১৮৩১-৪৩)।

৩. পুস্তকপ্রকাশনার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে প্রকাশনার ক্ষেত্রে মিশনারি প্রেস আর অপরিহার্য থাকল না। তাই সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বল্পমূল্যে পাঠ্যগ্রন্থ সরবরাহ করা ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হল 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭), 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' (১৮১৮) ইত্যাদি। পাঠ্যপুস্তকবহির্ভূত নানা মৌলিক রচনাও এই যুগে প্রকাশিত হতে থাকল।

৪. বাংলাদেশে কলেজশিক্ষার গোড়াপত্তন ঘটল এই যুগে। যেমন— হিন্দু কলেজ (১৮১৭), শ্রীরামপুর কলেজ (১৮১৮), বিশপস্ কলেজ (১৮২০), সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪), কলকাতা মাদ্রাসা (১৮২৯), মেডিকেল কলেজ (১৮৩৫) ইত্যাদি।

৫. সাংস্কৃতিক সভাসমিতি ও বিদ্বৎসভার উদ্ভব ঘটে এই সময়েই। যেমন, রামমোহনের 'আত্মীয়সভা' (১৮১৫), সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (১৮৩৮), ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩), ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫১), বেথুন সোসাইটি (১৮৫১), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' (১৮৫৩), হিন্দুমেলা (১৮৬৭) ইত্যাদি।

৬. বিভিন্ন ধর্মীয় সভার উদ্ভব ঘটল এই সময়ে। যেমন, রাধাকান্ত দেব, ভবানীচরণ প্রমুখ রক্ষণশীল হিন্দুদের ধর্মসভা স্থাপন (১৮২৯), রামমোহনের ব্রহ্ম উপাসনা সভা বা ব্রহ্মমন্দির স্থাপন (১৮২৮), ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ (১৮৬৬), আর্যদ্বমাজ (১৮৭৫) এবং রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রচারিত উদার হিন্দুধর্মের পাশাপাশি ওয়হাবী, ফরাজী বা স্যার সৈয়দ আহমেদ প্রবর্তিত মুসলিম সচেতনা (১৮৮৬-১৮৯৩) ইত্যাদি।

৭. সামাজিক ঘটনাপ্রবাহ, যেমন— সতীদাহ প্রথা নিবারণ (১৮২৯), তিতুমীরের বিদ্রোহ (১৮৩১-৩২), আইন-আদালতে ফারসির পরিবর্তে বাংলার প্রবর্তন (১৮৩৮), ১৮৫৬-য় বিধবা বিবাহ আইন পাশ, নীলবিদ্রোহ (১৮৫০-৬০), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) ইত্যাদি।

উন্মেষ পর্বের গদ্যরীতি:

উন্মেষ পর্বের ভাষাদর্শের প্রভাব বাংলা গদ্যের অভ্যুদয় পর্ব, এমনকি বিকাশ পর্বের রচনারীতিতেও প্রচ্ছন্নভাবে সক্রিয় ছিল।

উইলিয়াম কেরীর আবির্ভাবকে উন্মেষ পর্বের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধরলে দেখা যাবে, আঠারো শতকের শেষার্ধে প্রকৃতপক্ষে গদ্যরচনার দুটি রীতির আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রথম রীতির ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে মধ্যবাংলায়-অনুশীলিত ভাষারীতির সাধু, শিষ্ট রূপ— যার সূত্রপাত বাংলা গদ্যের সূচনাপর্বেই লক্ষ করা যায়। এই জাতীয় পরিশীলিত 'সাধু গৌড়ীয় ভাষা'র সার্থক প্রতিফলন ঘটল বোধহয় সর্বপ্রথম 'মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র' নামক গদ্যগল্পটিতে অথবা ডানকান-এর আইনগ্রন্থ অনুবাদের রচনাংশে (১৮৭৫)।

কাব্যে-ব্যবহৃত নব্য বাংলা থেকেই এই আধুনিক সাধু ভাষার ক্রমিক উত্তরণ ঘটেছে। এই দুটি রীতির পার্থক্য কেবল পদক্রম-বিন্যাসেই অঙ্গীকৃত। যেমন—

মধ্য বাংলা : 'প্রণাম করিয়া বীর চণ্ডীর চরণে। / শুভক্ষণে প্রবেশ করিল গিয়া বনে।।'

সাধু ভাষা : চণ্ডীর চরণে প্রণাম করিয়া বীর শুভক্ষণে বনে গিয়ে প্রবেশ করল।

অথবা

মধ্য বাংলা : 'তখন জানিল মনে ওঝা ধন্বন্তরি। / ঔষধ লইয়া গেল জয় বিষহরি।।'

সাধু ভাষা : ওঝা ধন্বন্তরি তখন মনে জানিল (যে) জয় বিষহরি ঔষধ লইয়া গেল।

অনেকক্ষেত্রে মধ্য বাংলার পদবিন্যাস সাধু ও শিষ্ট গদ্যে প্রায় অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। যেমন—

মধ্য বাংলা : 'চান্দের আদেশ পায়্যা কাণ্ডারী চলিল।
সপ্তডিঙ্গা লৈয়া কালীদহে উত্তরিল।।...
মনস্তাপ পায় তবু না নোয়ায় মাথা।
বলে চেঙ্গমুড়ি বেটী কিসের দেবতা।।'

বাংলা গদ্যে দ্বিতীয় রীতির আবির্ভাব ঘটল সর্বপ্রথম আঠারো শতকের শেষার্ধে। এ রীতি হল বাংলা ভাষার আঞ্চলিক রূপ আশ্রিত। এর আগে কাব্যসাহিত্যের অন্দরমহলে ভাষার শিষ্ট ও আঞ্চলিক ধর্মের প্রভাব ছিল। তাই মধ্য বাংলা আশ্রিত সাধু আদর্শের ওপর রাঢ়ী অথবা বরেন্দ্রী বা বঙ্গালী আবরণ মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। সেই সূত্র ধরেই রাঢ়ী আঞ্চলিকতার মৌখিক কথ্যধর্ম মাণিকরাম, বিপ্রদাস প্রমুখ লেখকদের রচনায় অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছিল। তাই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের অপিনিহিতি-অভিশ্রুতি-স্বরসংগতি-জনিত মৌখিক রাঢ়ীর লক্ষণ ও তার নির্বিচার প্রয়োগ কাব্যে অমার্জনীয় 'গুরুচণ্ডালী' ত্রুটি হিসেবে গণ্য হত না। যেমন, অন্ত্যমধ্য বাংলা: লৈক্ষ্য < লক্ষ, সৈত্য < সত্য, জাত/রাত : জেতের/রেতের, হগু = হউক, দেখ্যা/ দেখে, কইর‍্যা/কর‍্যা/কোরে ইত্যাদি।

এমনকি রাঢ়ী বাংলাসুলভ শব্দের দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ-রীতিও কাব্যের ভাষায় প্রতিফলিত হত। যেমন 'জল আস্তে যায়'। কাব্যে আরবি-ফারসি শব্দের ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশ সম্ভবত এই কথ্য ধর্মেরই প্রভাবজাত। কথ্যসর্বস্ব, ধ্বন্যাত্মক দ্বৈত পদও কাব্যে স্বাভাবিকভাবেই আরোপিত হত। যেমন—'ধাকাধোঁকা', 'লাথালোথা', 'টুঁসাটুঁসি', 'আলাদুলা', 'ধুসেমুসে' ইত্যাদি। কথ্য ইডিয়ম প্রায় পুরোপুরি কথ্যরীতিতে বিন্যস্ত হত। যেমন—'কেমনে যাইবি তোরা দুগ্ধের ছায়াল', 'সঘনে মুচড়ে দাড়ি গোঁপে দেয় তার'।/রঞ্জার বেটার মাথা খাব এইবার'। 'হাত পা ভাঙিয়ে রাখ বলে কয়ে তাকে।/ঠুটা খোড়া হয়ে যেন ঘরে বসে থাকে', 'তোর পাকে আমার মরিল বেটা নাতি/একজন না রহিল কুলে দিতে বাতি', 'সময় কালেতে যাহা শিখাইলে গুরু/সেইসভ মন্ত্র যে আইসে সুড়ুসুড়ু' ইত্যাদি।

এই আঞ্চলিক ধর্ম কোথাও কোথাও মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাই অনেকক্ষেত্রে রাঢ়ী বৈভাষিক (Sub-dialectal) লক্ষণও সাহিত্যে অবধারিত ছিল। যেমন, ব্যঞ্জনবর্ণের মহাপ্রাণহীনতা (লাফ > লাপ, লাখ > লাক, বলিছে > বলিচে), 'ল্' স্থানে 'ন্' (লুকাইয়া > নুকায়ে, লুচি > নুচি, লৌকিকতা > নৌকতা), স্বরবিপর্যয় (মুকুট > মটুক), অতীতকালের উত্তমপুরুষের বিভক্তি '-লাম', '-লেম'-এর পরিবর্তে '-লুম', '-নু' (আলুম, আইলুম, আনু) ইত্যাদি।

অর্থাৎ, বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে এই রাঢ়ীয় আঞ্চলিকতা যতটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল, গদ্যের ক্ষেত্রে তা ততটা হয়নি। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী অর্থাৎ দক্ষিণ রাঢ়ের পূর্ব অংশের উপভাষার স্থায়ী প্রভাব বাংলা সাধু গদ্যে দেখা দিয়েছে প্রকৃতপক্ষে গদ্যের বিকাশ পর্বে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। গদ্যে সংস্কৃতানুগত্য ও ফারসি প্রভাবের অতিরেক এই রাঢ়ী কথ্য আদর্শের তাড়নায় মধ্যপথ অবলম্বন করেছে।

কথ্য রাঢ়ী ভাষায়, রামরাম বসুর কথায় 'এদেশীয় চলন ভাষা'-র সাহিত্যিক প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে উনিশ শতকের প্রারম্ভে, বাংলা গদ্যের 'কেরী' যুগে। রামরাম নিজেই তাঁর 'লিপিমালা' (১৮০২)-র ভূমিকায় এই কথ্য ভাষাকে স্বাগত জানিয়েছেন, 'এখন এস্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এদেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজক্রিয়াক্ষম হইতে পারেন না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলনভাষা ও লেখাপড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ববিধ কার্য্যক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্ধে এ ভূমীয় যাবতীয় লেখাপড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপিমালা নাম পুস্তক রচনা করা গেল।'

লক্ষণীয়, রামরামের কাছে এই কথ্যরীতি এদেশীয় বিদেশিদের শিক্ষা সহায়তার মাধ্যমরূপেই গৃহীত হয়েছে, সাহিত্যিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। তাই এই পর্বে সাধু ও কথ্যরীতি যেন দুটি সমান্তরাল ভিন্নধর্মী ভাষাপ্রবাহ। এই পর্বের লেখকরা তাই এই দুই রীতির সমন্বয়সাধন করতে পারেননি।

উনিশ শতকের গোড়ায়, কেরী-যুগে বাংলা গদ্যে আর একটি নতুন রচনাশৈলীর সংযোজন ঘটল, বাংলা গদ্যে পণ্ডিতী রীতি আরোপিত হল। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার হলেন এর প্রধান পথিকৃৎ। এই রীতির মুখ্য অবলম্বন সংস্কৃত আদর্শ। 'আদর্শ' বলতে কেবল তৎসম শব্দচয়ন বা আভিধানিক উপাদান সংগ্রহ নয়; বাক্যরীতির অনুকরণও বটে। তাই সংস্কৃতসুলভ সমাসবাহুল্য, ব্যাকরণগত প্রক্ষেপ অথবা জটিল বাক্য প্রয়োগ বাংলা গদ্যে দেখা দিল। বিদ্যাসাগরের রচনার প্রথম ও পরবর্তী সংস্করণগুলোর পাঠ তুলনা করলেই একথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কিন্তু বিকাশ পর্বে গদ্যের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে সংস্কৃত বাক্যরীতির পরিবর্জনে। এই পর্বেই সংস্কৃত বাক্যরীতির বলয় গ্রাস থেকে মুক্ত হয়েছে বাংলা গদ্য।

কাজেই, উনিশ শতকের সূচনায় বাংলা গদ্যরীতির ক্ষেত্রে উপাদানগত বিভেদ ছিল মূলত তিনটি— এক. তদ্ভব শব্দ ও মৌখিক ইডিয়ম্-আশ্রিত আঞ্চলিক রীতি। যেমন— এক রাঢ়ী বা পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক রীতি। দুই. ফারসি শব্দ-প্রভাবিত রীতি। তিন. তৎসম শব্দ ও সংস্কৃত বাক্যরীতি আশ্রিত পণ্ডিতী রীতি।

৪ আধুনিক বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. অনেকে মনে করেন, গদ্যের জন্ম আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু বাঙালির মৌখিক গদ্যের ব্যবহার আগেই প্রচলিত ছিল— দৈনন্দিন কর্মক্ষেত্রে বাঙালি-যে আধুনিক যুগের আগে পদ্যে কথা বলত, এমনটা নয়। আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য এই যে, যে-গদ্য বাঙালির দৈনন্দিন ব্যবহারে প্রচলিত ছিল, সাহিত্যে তার প্রয়োগ সূচিত হল অর্থাৎ গদ্যসাহিত্য রচনার সূত্রপাত হল আধুনিক যুগে।

২. সাহিত্যে ব্যবহৃত গদ্যেরও আবার দুটি রীতি গড়ে উঠল— সাধু ও চলিত ভাষা। মূলত পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের (হুগলী, হাওড়া, নদীয়া, উঃ ২৪ পরগণা ইত্যাদি) কথ্যভাষার ওপর ভিত্তি করে চলিত গদ্যের রূপ গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে মূলত মধ্যযুগীয় বাংলার শব্দরূপ-ধাতুরূপ ও প্রধানত সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার নিয়ে সাধু গদ্য গড়ে তোলা হয়েছিল। যদিও সাধু ও চলিত গদ্যের ধারা উনিশ শতকে প্রায় সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়েছিল; তবু সেইসময় সাধু গদ্যের ধারাটিই বেশি বলবৎ ছিল। পরে ক্রমে চলিত গদ্যের ধারাটি বিকাশ লাভ করে এবং সাধু গদ্যের ব্যবহার কমে আসে।

৩. সাধুভাষার ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গের পূর্ণতর দীর্ঘরূপ বজায় ছিল। যেমন— 'করিয়া', 'করিয়াছিল', 'যাহার', 'তাহার', 'হইতে' ইত্যাদি। চলিত ভাষায় এগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ প্রচলিত হল। যেমন— 'করে', 'করেছিল', 'যার', 'তার', 'থেকে', 'হতে' ইত্যাদি।

৪. মধ্যযুগের বাংলায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপিনিহিতি বা বিপর্যাসের ফলে শব্দ-মধ্যবর্তী 'ই' বা 'উ' তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে উচ্চারিত হত (যেমন করিয়া > কইর্যা)। কিন্তু আধুনিক যুগের আদর্শ চলিত বাংলায় অপিনিহিতির পরবর্তী ধাপের ধ্বনি-পরিবর্তন অভিশ্রুতি সংঘটিত হল (যেমনু কইর্যা > করে)।

৫. আধুনিক চলিত বাংলায় শব্দের মধ্যে পাশাপাশি বা কাছাকাছি অবস্থিত দুটি বিষম স্বরধ্বনি স্বরসঙ্গতির প্রক্রিয়ায় সমীভূত হয়ে একইরকম বা প্রায় একইরকম স্বরধ্বনিতে পরিণত হল। যেমন, দেশি > দিশি, পটুয়া > পোটো ইত্যাদি।

৬. মূল ক্রিয়ার ধাতুর সঙ্গে '-অনট্' (অন), 'অ' ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ করে প্রথমে ক্রিয়াজাত বিশেষ্য পদ রচনা করা হয়। যেমন— গম্ + অনট্ (অন) = গমন, গৈ + অনট্ (অন) = গান, গ্রহ্ + অনট্ (অন) = গ্রহণ, √জ্ঞা + সন্ + অ + আ = জিজ্ঞাসা ইত্যাদি। এরপর তাকে পূর্বপদ রূপে গ্রহণ করে √কৃ-ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়ার বিভক্তি যোগ করে নানা যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। যেমন— গমন করা, গান করা, গ্রহণ করা, জিজ্ঞাসা করা ইত্যাদি। এইরকমের যৌগিক

ক্রিয়াপদ প্রথমে সাধুভাষায় ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হত। পরে কিছু কিছু যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার চলিত ভাষাতেও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

৭. আধুনিক বাংলায় দু'টি সংযোজক অব্যয়— 'ও', 'এবং'-এর ব্যবহার খুব বেশি। এই দুটির মধ্যে 'এবং' আগে থেকেই প্রচলিত। 'ও' হল আধুনিক বাংলার বৈশিষ্ট্য। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, এটি ফারসি 'ব' (wa) থেকে এসেছে।

৮. আধুনিক বাংলা ভাষার বাক্যগঠনরীতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, নঞর্থক অব্যয় 'না', 'নাই', 'নি' ইত্যাদি, অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে এবং সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় এবং নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ারও আগে বসে। যেমন— ছেলেটা না মন দিয়ে পড়াশুনো করল, না মন দিয়ে অভিনয় করল।

৯. একাধিক সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহারে যৌগিক বাক্য গঠন না করে আধুনিক বাংলায় অনেকক্ষেত্রেই পূর্ববর্তী বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিবর্তিত করে একটিমাত্র বাক্যে পরিণত করা হল। যেমন— ছেলেটা বাড়ি গিয়ে (গেল এবং) ভাত খেয়ে (খেল এবং) পড়তে বসল।

১০. আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে বিভিন্ন ভাষা থেকে নানান বিদেশি বা দিশি শব্দ প্রবিষ্ট হল। ইংরিজির পাশাপাশি পর্তুগীজ, ফরাসি, ইতালীয়, জার্মান, ওলন্দাজী, চিনা, জাপানি— ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষার শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটল।

১১. ছন্দোরীতিতে নানা বৈচিত্র্য আধুনিক বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পুরোনো পয়ার ছন্দ থেকে অমিত্রাক্ষর ও গৈরিশ ছন্দের জন্ম তো হলই; আধুনিক বাংলা কবিতায় গদ্যছন্দেরও সূচনা হল। এছাড়া বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহারও দেখা দিল।

১০.৫ সারসংক্ষেপ

সুবিস্তৃত আধুনিক যুগের কালপর্বের এই এককে উদাহরণযোগে ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে আলোচনা করা হল।

১০.৬. অনুশীলনী

(ক) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন:

১. আধুনিক যুগের বাংলা ভাষাকে কীভাবে কালগত দিক থেকে বিভক্ত করা যায়?

২. আধুনিক যুগের বাংলার প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যটি কী?

৩. সাহিত্যিক গদ্যের দুটি রীতির নাম কী?

৪. মধ্যযুগের বাংলায় প্রচলিত অপিনিহিতি আধুনিক যুগের বাংলায় এসে কোন্ ধ্বনি পরিবর্তনকে সূচিত করে তুলেছিল?

৫. ধাতু, প্রত্যয় ও ক্রিয়া বিভক্তিযোগে একটি যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ দিন।

৬. আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারের প্রধান বৈশিষ্ট্যটি কী?

৭. গদ্যছন্দের সূচনাকাল হিসেবে কোন্ সময়টিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন:

১. আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার দুটি করে ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উদাহরণযোগে আলোচনা করুন।

২. আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যটি বুঝিয়ে দিন।

(গ) রচনাধর্মী প্রশ্ন:

১. উদাহরণযোগে আধুনিক যুগের বাংলার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

২. প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলা ভাষার প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণগুলির তুলনামূলক পরিচয় পরিস্ফুট করুন।

একক ১১ ❑ আধুনিক বাংলা ভাষা: দ্বিতীয় পর্ব

গঠন

১১.১ উদ্দেশ্য

১১.২ প্রস্তাবনা

১১.৩ প্রাক্ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্বের বাংলা গদ্যচর্চা

১১.৩.১ প্রাক্ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্বের গদ্যচর্চার ধারা কেন পাঠ করব?

১১.৩.২ প্রাক্ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্বের বাংলা গদ্যচর্চা (উনিশ শতকের পূর্ববর্তী ধারা):

১১.৩.৩ ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, বৈষ্ণব কারিকা, কড়চা

১১.৩.৪ দলিল-দস্তাবেজ

১১.৩.৫ পর্তুগিজদের দ্বারা রচিত বাংলা গদ্য

১১.৩.৬ আইনের বইয়ের অনুবাদ

১১.৩.৭ বাংলা গদ্যচর্চায় শ্রীরামপুর মিশন

১১.৪ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যচর্চার ধারা

১১.৪.১ সমকালীন প্রেক্ষিত

১১.৪.২ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাদি

১১.৪.৩ রামরাম বসুর জীবন ও কর্ম

১১.৪.৪ রামরাম বসুর সাহিত্যকর্ম

১১.৪.৫ রামরাম বসুর গদ্যশৈলী

১১.৪.৬ উইলিয়াম কেরীর জীবন ও কর্ম

১১.৪.৭ উইলিয়াম কেরীর সাহিত্যচর্চা

১১.৪.৮ উইলিয়াম কেরীর গদ্যবৈশিষ্ট্য

১১.৪.৯ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের জীবন ও কর্ম

১১.৪.১০ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সাহিত্যকর্ম

১১.৪.১১ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গদ্যবৈশিষ্ট্য

১১.৫ রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের গদ্য

১১.৫.১ রাজা রামমোহন রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী

১১.৫.২ রামমোহন রায়ের সমকাল

১১.৫.৩ বাংলা গদ্যচর্চায় রামমোহন রায়ের ভূমিকা

১১.৫.৪ রামমোহন রায়ের সাহিত্যচর্চার ধারা

১১.৫.৫ রামমোহন রায়ের গদ্যের বৈশিষ্ট্য

১১.৫.৬ রামমোহন রায়ের গদ্য সম্পর্কে আলোচকদের মতামত

১১.৫.৭ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংক্ষিপ্ত জীবনী

১১.৫.৮ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমকাল

১১.৫.৯ বাংলা ভাষাচর্চায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভূমিকা

১১.৫.১০ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক কর্ম

১১.৫.১১ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্যের উদাহরণ

১১.৫.১২ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্যচর্চায় বিবর্তন

১১.৫.১৩ পূর্বসূরীদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির পার্থক্য

১১.৫.১৪ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনারীতি

১১.৫.১৫ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্যশৈলীর বহুমাত্রিকতা

১১.৬ নক্‌শাজাতীয় গদ্য এবং উনিশ শতকের নক্‌শাকার

১১.৬.১ নক্‌শা কাকে বলে?

১১.৬.২ নক্‌শাজাতীয় গদ্য সৃষ্টির পূর্ববর্তী সাহিত্য ধারা

১১.৬.৩ সমকালীন পরিস্থিতি

১১.৬.৪ নক্‌শা জাতীয় রচনায় আলোচিত বিষয়

১১.৬.৫ বাংলা নক্‌শাজাতীয় সাহিত্যের দৃষ্টান্ত

১১.৬.৬ প্রথম নক্‌শা ও নক্‌শাকার

১১.৬.৭ প্যারীচাঁদ মিত্র

১১.৬.৮ 'আলালের ঘরের দুলাল': বিষয় সংক্ষেপ

১১.৬.৯ 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯)

১১.৬.১০ কালীপ্রসন্ন সিংহ

১১.৬.১১ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' রচনার উদ্দেশ্য

১১.৬.১২ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-র ভাষার ব্যবহার

১১.৬.১৩ প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের ভাষারীতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

১১.৭ বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য:

১১.৭.১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাধারণ পরিচয়

১১.৭.২ বিবর্তনের ধারা

১১.৭.৩ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচর্চার ধারা

১১.৭.৪ গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য

১১.৭.৫ বঙ্কিমের গদ্যচর্চা

ক) প্রবন্ধসাহিত্য

খ) উপন্যাস

গ) বঙ্গদর্শন পত্রিকা

১১.৭.৬ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

১১.৮ রবীন্দ্রনাথের ভাষাশৈলী

১১.৮.১ রবীন্দ্রসৃষ্টি

ক) কবিতা

খ) নাটক

গ) গদ্য

ঘ) গল্প

ঙ) উপন্যাস

চ) প্রবন্ধ

১১.৮.২ রচনাশৈলী, ভাষাচর্চার ধারা

১১.৯ বাংলা সংবাদ-সময়িকপত্র গদ্যচর্চা

১১.৯.১ সংবাদ-সাময়িকপত্রের সাধারণ পরিচয়

১১.৯.২ পত্র-পত্রিকার প্রথম যুগ

১১.৯.৩ সংবাদ-সাময়িকপত্র পরিচালনার আঙ্গিক

১১.৯.৪ সংবাদ-সাময়িকপত্রের ভাষা ব্যবহার

১১.৯.৫ প্রথম সংবাদ-সময়িকপত্র

১১.৯.৬ বহুমাত্রিক ধারার পত্র-পত্রিকা

ক) ধর্মপ্রচারমূলক পত্রিকা

খ)সমাজ-সংস্কার মূলক ভাবনা প্রকাশক

গ) রক্ষণশীল ধারার পত্রিকা

ঘ) সভা-সমিতির উদ্দেশ্য প্রচারমূলক

ঙ) উনিশ শতকের প্রগতিশীল চর্চা

চ) নারী স্বাধীনতার পক্ষে পত্রিকার ভূমিকা

ছ) পত্র-পত্রিকায় সাহিত্য চর্চা

জ) অন্যধারার পত্রিকা

ঝ) রাজনৈতিক পত্রিকা

১১.১০ বিশ শতকের বাংলা ভাষাচর্চা

১১.১১ একুশ শতকের বাংলা ভাষাচর্চা

১১.১২ সারসংক্ষেপ

১১.১৩ অনুশীলনী

১১.১ উদ্দেশ্য

বাংলা গদ্য রচনার ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে ভাষার উদ্ভব, ভাষার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধীয় আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক। ভাষা একদিনে তৈরি হয়নি। মানব সভ্যতা বিবর্তনের ধারায় ধ্বনি, বর্ণ সহযোগে তৈরি হয়েছে শব্দভাণ্ডার এবং এই শব্দভাণ্ডার জুড়েই তৈরি হয়েছে অর্থবহ বাক্য। সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয় বহু পরবর্তীকালে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত সাহিত্য আলোচক, সাহিত্যিকগণ মনে করেছিলেন পদ্য নির্মিত ছন্দবদ্ধ ভাষাই সাহিত্য নির্মাণের আদর্শ কাঠামো। মধ্যযুগে মূলত রাজন্যবর্গের নির্দেশে, বিনোদনের উদ্দেশ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই ব্যবহারিক প্রয়োজনে বাংলা গদ্যচর্চার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। চর্যাপদ থেকে ভারতচন্দ্রের যুগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য ছিল পদ্যাশ্রিত। ইংরেজ আগমনের পরবর্তী সময় আইন-আদালতের কাজকর্ম পরিচালনায় গদ্যভাষার চর্চা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাংলা গদ্যচর্চার বিস্তারে উনিশ শতকের বেশ কতকগুলি প্রেক্ষাপটের ভূমিকা অবশ্য উল্লেখযোগ্য। তাদের মধ্যে অন্যতম পর্তুগিজ মিশনারিদের আগমন, দেশজ ভাষায় খ্রিস্টধর্ম চর্চা এবং রাজকর্মচারীদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা।

আঠারো-উনিশ শতকের গদ্যচর্চার এই বিস্তার বহুল আলোচ্য হলেও প্রায় ষোড়শ শতাব্দী থেকেই বাংলা গদ্যভাষা ব্যবহারের বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। কতিপয় কড়চা জাতীয় বৈষ্ণব গ্রন্থ, রাজকার্য সংক্রান্ত দলিল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র ও খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য প্রচলিত পুস্তিকায় বাংলা গদ্যের লিখিত রূপের নিদর্শন লক্ষণীয়। ধর্মপ্রচার, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই-এর স্বার্থে, বিভিন্ন সমাজ-সংস্কার আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে বাংলা গদ্যের বিভিন্ন আঙ্গিকের চর্চা শুরু হয়। সর্বোপরি এই সময় ইংরেজ রাজকর্মচারীদের বাংলা শিক্ষার উদ্দেশ্যে এবং উচ্চবিত্ত হিন্দু বাঙালির শিক্ষার দাবিতে প্রবন্ধ রচনা, পাঠ্য পুস্তক নির্মাণের তাগিদ অনুভূত হয়। এই সময় একদিকে সংস্কৃত রীতির অনুসরণ অপরদিকে ইংরেজি সাহিত্য রীতির অনুসরণ যেমন লক্ষণীয় তেমনি ফারসি সাহিত্যরীতির চর্চাও লক্ষণীয়। এই সময় বাংলা গদ্য লেখকদের সামনে কোন প্রামাণ্য নিদর্শন ছিল না। প্রাথমিক পর্বে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের অনুবাদই ছিল বাংলা গদ্য সাহিত্যের ভিত্তি। ফলে মূলের ভাষাশৈলী, সাহিত্যরীতির প্রভাব স্বভাবতই বাংলা সাহিত্যে লক্ষণীয়। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, উইলিয়াম কেরী প্রমুখের হাত ধরে বাংলা গদ্যচর্চায় নবপ্রাণ সঞ্চারিত হয়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বা বিদ্যাসাগরদের হাত ধরে যেমন সংস্কৃত সাহিত্যরীতি অনুসারী বাংলা গদ্য নির্মিত হয় তেমনি রামরাম বসু বা কিছু ক্ষেত্রে রামমোহন রায়দের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে ফারসি সাহিত্য রীতির অনুসরণ লক্ষণীয়। পরবর্তী পর্যায়ে প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহদের হাত ধরে মৌখিক কথনরীতির প্রকাশ ঘটে সাহিত্যে।

বর্তমান এককে আমরা প্রাক্ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্ব থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা গদ্যচর্চার ধারা, বাংলা ভাষার বিবর্তনের স্বরূপ আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য।

১১.২ প্রস্তাবনা

প্রত্যেক যুগেই নবীনের আবির্ভাবের প্রয়োজনে পুরাতনকে পথ ছেড়ে দিতে হয়। নবীনের হাত ধরে নব্য চিন্তন মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে। উনিশ শতকের প্রথম দিক জুড়েই শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কার, নবীন-আধুনিক জ্ঞানচর্চা, ধর্ম আন্দোলনের তরঙ্গে বাংলাদেশ আন্দোলিত হয়। উনিশ শতকে সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি ক্ষেত্রে এক ব্যাপক পালাবদল সংগঠিত হয়। একদিকে যেমন পুরাতন সংস্কারকে আঁকড়ে ধরার প্রচেষ্টা করেছেন একাংশ অপরদিকে আধুনিক শিক্ষিত বাঙালি এক নতুন যুগ চেতনা, সাহিত্যসম্ভার আমদানি করার চেষ্টা করেছিলেন। এই পর্বে বাংলা সাহিত্যে গদ্যচর্চার উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটে।

প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মপ্রচার থেকে ইংরেজ কর্মচারীদের দেশিয় ভাষাশিক্ষা, রাষ্ট্র পরিচালনা, আইন-আদালতের কর্মপরিচালনার উদ্দেশ্যে বাংলা গদ্যভাষার নির্মাণ হয়। পরবর্তীতে রসজ্ঞ সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও বাংলা গদ্যচর্চার সূত্রপাত হয়। মধ্যযুগের গদ্যভাষার কিছু নিদর্শন পাওয়া গেলেও সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গদ্যভাষা ব্যবহৃত হত না। ইংরেজ শাসন পত্তনের পর থেকে প্রতিদিনের কাজকর্মের স্বার্থে, অন্ন-বস্ত্রের প্রয়োজনে লেখাপড়ার গুরুত্ব বাড়তে থাকে। দেশ শাসনের জন্য রাজস্ব সংগ্রহের জন্য আইনের বই লেখা শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতে বাংলা শেখার উদ্দেশ্যে বা দেশিয় সাহিত্য-সংস্কৃতি শেখার তাগিদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় একদিকে যেমন সমৃদ্ধ আদালতি বাংলার প্রভাব লক্ষণীয় তেমনি সংস্কৃত পণ্ডিতদের অনুগ্রহে তৎসম-তদ্ভব শব্দ বিজড়িত সাধুরীতির প্রয়োগও দেখা যায়। এর পাশাপাশি কথ্যরীতিকেও বাংলা সাহিত্যে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন একাংশ।

আমরা এই এককে আমরা গদ্যচর্চার বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করব। উনিশ শতক বাংলা গদ্যচর্চার সূচনাপর্ব; অবশ্য যোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই বাংলা গদ্যের পথচলা শুরু হয়। আমরা এই এককে প্রাক্ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্বের গদ্যচর্চা থেকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যচর্চা, রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় থেকে প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের বহুরৈখিক গদ্যশৈলী, বৈচিত্র্য, স্বলক্ষণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। এই পর্বে রচিত সাহিত্যের দৃষ্টান্ত আলোচনার সাপেক্ষে আমরা আধুনিক বাংলা ভাষার গঠন ও বিবর্তনের ধারাটি বোঝার চেষ্টা করব।

১১.৩ প্রাক্ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্বের বাংলা গদ্যচর্চা

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী ধারায় অর্থাৎ যোড়শ-সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের বাংলা গদ্যচর্চার ধারা আমাদের আলোচনার মুখ্য উদ্দিষ্ট। ইংরেজ আগমন সূত্রে গদ্যচর্চার প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়। কারণ ইংরেজ আগমন পরবর্তীকালে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা সূত্রে রাজকর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই সময় ইংরেজ শাসকগণ বুঝতে পেরেছিলেন দেশিয় ভাষা না শিখলে দেশ পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। ভাষা শিক্ষার জন্য গদ্যই প্রধান মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। কারণ পদ্য মারফত ভাষা শেখানো সম্ভব নয়।

এই গদ্যচর্চার ধারা হঠাৎ উনিশ শতকে শুরু হয়নি, সাহিত্য ক্ষেত্রে গদ্যের ব্যবহার খুব জনপ্রিয় না হলেও মধ্যযুগে প্রশাসনিক কাজে বাংলা গদ্যের ব্যবহারের নিদর্শন লক্ষ করা যায়। আমরা উনিশ শতকের পূর্ববর্তী ধারার গদ্যশৈলী আলোচনা সূত্রে বাংলা গদ্যচর্চার প্রবাহমান ধারাটি বোঝার চেষ্টা করব।

১১.৩.১ প্রাক্ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্বের গদ্যচর্চার ধারা কেন পাঠ করব?

এখন প্রশ্ন হতে পারে, প্রাক্ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্বের গদ্যচর্চার ধারা কেন পাঠ করব? উনিশ শতক ইংরেজ শাসনব্যবস্থার বিস্তারকাল। নয়া শাসক ও শাসননীতির হাত ধরে নানান বদল সংগঠিত হয়। নয়া শাসন ব্যবস্থায় বাংলা ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ভাষাশিক্ষা সূত্রে বাংলা গদ্য নির্মাণের প্রয়োজনীয়তাও তৈরি হয়। যেকোন আঙ্গিক, রীতির আবির্ভাব, বিকাশ এক দীর্ঘ সময়ের ফসল। এই গদ্যচর্চার ধারা বা বিবর্তনের সূত্রগুলি বোঝার জন্য আমরা উনিশ শতকের পূর্বের অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী পর্যায়ের বাংলা গদ্যচর্চার ধারাটি অনুসন্ধানের চেষ্টা করব।

উনিশ শতকে বাংলা গদ্যচর্চার যে ধারা সূচিত হয় তার পূর্ববর্তী পর্যায়ের বাংলা গদ্যচর্চাই আমাদের আলোচ্য। বাংলা গদ্যচর্চায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান সম্পর্কে আমরা কম বেশি সকলেই অবগত। এই পর্বে আমরা প্রাক্ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যচর্চার ধারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব।

১১.৩.২ প্রাক্ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্বের বাংলা গদ্যচর্চা (উনিশ শতকের পূর্ববর্তী ধারা):

এই সময়ের গদ্যচর্চাকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়-

দলিল-দস্তাবেজ

আদালতের নির্দেশনামা, ওকালতনামা

ব্যক্তিগত চিঠিপত্র

বৈষ্ণব কারিকা, কড়চা

সামান্য কিছু গল্প সংগ্রহ

অষ্টাদশ শতকে পর্তুগিজ মিশনারিদের লিখিত গদ্য

ধর্মপ্রচারমূলক পত্র, ব্যাকরণচর্চা

আইনের বইএর অনুবাদ

শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে প্রকাশিত গদ্য

ধর্মপ্রচারমূলক গদ্য, অনুবাদ চর্চা

প্রাথমিক পর্বে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা গদ্যের প্রচলন হয়। কোম্পানি এই ধর্মপ্রচারকে উৎসাহ না দিলেও বিরোধিতা করেনি। এই সময় বেশ কিছু অনুবাদ গ্রন্থ রচিত হয়, পাশাপাশি বেশ কিছু রসজ্ঞ সাহিত্যও রচিত হয়। তবে বাংলা গদ্য ভাষার ব্যবহার এর দুশো বছর আগেই শুরু হয়। সপ্তদশ-অষ্টদশ শতকের বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজ, কুলজি গ্রন্থ, বৈষ্ণব কারিকার সন্ধান পাওয়া যায়। কোচবিহাররাজ নরনারায়ণদেব রচিত চিঠি বাংলা সাহিত্যের প্রথম গদ্য নিদর্শন হিসেবে পরিচিত। এই ভাষা যদিও গুরুচণ্ডালী দোষাক্রান্ত তবু এটি প্রথম বাংলা গদ্যচর্চার নিদর্শন হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অনেকে শূন্যপুরাণের ভাষাকেও গদ্যভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ বলা যায় নিত্য প্রয়োজন ব্যতীত মূল ধারার সাহিত্যের প্রাঙ্গনে গদ্যের চলন উনিশ শতকের আগে সেভাবে লক্ষ করা যায়নি।

প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্ম স্থাপন, মতবাদ-মতাদর্শ প্রচারের হাতিয়ার হিসেবেই গদ্য ভাষার ব্যবহার শুরু হয়। বাংলা গদ্যের উন্মেষে, একাডেমিক বা বিদ্যায়তনিক বাংলা গদ্য ভাষার বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের নাম বিশেষ আলোচ্য হলেও, আমাদের মনে রাখতেই হবে আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের গঠনে-বিকাশে পর্তুগিজ মিশনারিদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মার্শম্যান, টমাস, ওয়ার্ড, উইলিয়াম কেরী প্রমুখ ইংরেজ মিশনারিগণ আঠারো শতকে শ্রীরামপুরে একটি মিশন প্রতিষ্ঠা করেন, তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্ট ধর্মপ্রচার। ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বই প্রকাশ, বাইবেলের অনুবাদের মত কর্মসূচি গৃহীত হয়। ইংল্যান্ড থেকে একটি পুরনো মুদ্রাযন্ত্র আনিয়ে পঞ্চানন কর্মকারের কাছ থেকে বাংলা হরফ তৈরি করে শ্রীরামপুরে একটি প্রেস গঠিত হয়। ছাপাখানা স্থাপন আপামর বাঙালির কাছে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চাকে ধারটিকে সুগম করেছিল। এরপর ধীরে ধীরে শ্রীরামপুর মিশন এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পথ চলা সমান্তরাল রেখায় বাহিত হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী স্তরে বাংলা গদ্যের বিকাশে কয়েকজন লেখক, সাহিত্যিক, ধর্ম প্রচারক, সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা আলোচনা করব।

১১.৩.৩ ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, বৈষ্ণব কারিকা, কড়চা:

চিঠিপত্রের নিদর্শন:

অহোম রাজ লিখিত কয়েকটি চিঠিতে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যের কিছু নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। এই পর্বের প্রাচীনতম নিদর্শন ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে লিখিত একটি চিঠি যা কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ অহোম রাজাকে লিখেন। পত্রটি এইরূপ

'লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্তব্যে বার্দতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি।'

বৈষ্ণব সমাজ এবং মোহান্তদের লিখিত গদ্য:

১৭৩১ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ীয় মোহন্তদের কাছে লিখিত ইস্তফাপত্র, জয়পুরের সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্যের অজয়পত্র মধ্যযুগের গদ্যের নিদর্শন। এছাড়াও বৈষ্ণব কারিকা, কড়চাগুলি সমকালের গদ্যের নিদর্শন।

ষড়গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর কারিকায় গদ্যের ব্যবহার করেছেন। এই গদ্যের নমুনা

'প্রথম শ্রীকৃষ্ণগুণ নির্ণয়। শব্দগুণ, রূপগুণ, রসগুণ ও স্পর্শগুণ এই পাঁচগুণ। এই পঞ্চগুণ শ্রীমতি রাধিকাতেও বসে।'

সপ্তদশ শতকের বিখ্যাত গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্য নরোত্তম দাস রচিত কড়চার উদাহরণ

'তুমি কে! আমি জীব। তুমি কোন্ জীব। আমি তটস্থ জীব। থাকেন কোথায়। ভাণ্ডে। ভাণ্ড কিরূপ হইল। তত্ত্ববস্তু হৈতে।'

গদ্যগ্রন্থ:

এইসময় দলিল, দস্তাবেজ তত্ত্বধর্মী গ্রন্থের পাশাপাশি অনুবাদ গ্রন্থ এবং গল্প গদ্যের, নমুনা দেখতে পাওয়া যায়।

'গৌতম বণিকের শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করলেন আমারদিগের মুকিত কি প্রকারে হয় তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গৌতম উত্তর করিতেছেন। তাবৎ পদার্থ জানিলে মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন। পদার্থ কতো।'

আবার 'মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র' নামক একটি গল্প সংগ্রহ করেন ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তার নমুনা 'মোং ভোজপুর শ্রীযুক্ত ভোজরাজা তাহার কন্যা শ্রীমতি মৌনাবতি যোড়য বরিস্যা বড় সুন্দরী মুখ চন্দ্র তুল্য কেষ মেঘের রঙ্গ চক্ষু আকন্ন পর্যান্তা যুঙ্গা ভ্রুরু ধনুকের নেয়ার ওষ্ঠ রক্তিমে বর্ন হস্ত পদ্মের মৃণাল।'

গদ্য বৈশিষ্ট্য:

বাংলা গদ্যের গঠন সবিন্যস্ত নয়। বাক্যের গঠনে জটিলতা লক্ষণীয়। মূলত সাধুভাষার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব কারিকায় যেমন তত্ত্বধর্মী গদ্যশৈলী লক্ষণীয়, তেমনি অপরদিকে চিঠিপত্রে বা গল্পে বাক্যের গঠন জটিল, অবিন্যস্ত বাংলা ভাষার প্রভাব লখ করা যায়।

এই সময়ের দলিল দস্তাবেজ, আদালতের নির্দেশনামা, ওকালতনামায় তৎসম তদ্ভব দেশী শব্দের প্রাধান্য যেমন লক্ষণীয় তেমনি আরবি ফার্সি শব্দের প্রভাবও লক্ষ করা যায়। সমকালীন মুসলমান শাসকের দৌলতে আরবি ফারসি ব্যাপকভাবে বাংলা গদ্য ভাষায় প্রভাব ফেলেছিল। এই সময়কার কিছু উদাহরণ আলোচনার মাধ্যমে আমরা সমকালের ভাষারীতি, বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝার চেষ্টা করব।

১১.৩.৪ দলিল-দস্তাবেজ

'ইজত আসার বৈকুন্ঠবাম দত্ত সিকদার ও মধুসূদন শর্মা কারকুন যুচরিতেষু আগে তরফ খএরাত সেখ আবদুল্লার ও শেখ আবদুল মোমেন সাং দুর্গাপুর আরজ হইলা জাহির করিলেন যে পরগনা খটঙ্গা দুর্গাপুরে খএরাত জমী সালি ১০ দঘ বিঘা পাই ভোগ করিতেছি সনন্দ রাখি এখন সীকদার সনন্দ তলব করে জে হুকুম হয় তাহার আরজ খুনিঞা হুকুম করিল সনন্দ তহকীব করহ জদি মো সনন্দ ভোগ প্রমাণ খএরাত মনসুর রাখিল সনন্দ করিয়া দেহ অতএব সনন্দ তহকীব করা গেল'। (লিপিকাল ১৭২৯ বঙ্গাব্দ) 'আগে মৌজে ডিহি বক্রেশ্বরের

গোপিনাথ শর্মা ও রামজীউ শর্মা ও লক্ষীকান্ত শর্মা ও জয়চন্দ্র শর্মা ও রাজ্জিধর শর্মা জাহির করিলো জে উক্ত ডিহি বক্রেশ্বর দেবোত্তর মৌজা দরবস্ত ও চক গঙ্গারামের ডিহি ও চক শিবপুরসাবীক বীররাজার দত্ত "বক্রেশ্বরনাথ শিবঠাকুরের নিষ্কর দেবতার মুদ্দ্যৎ পুরুষ ২ হসতে ৩ জীয়ের সেবা পূজা করিয়া দখলিকার আছে বীররাজার দত্ত সনন্দ রাখে এক্ষণ বক্রেশ্বর মেলাতে হুজুরের লোক লস্কর হাতী ঘোড়াতে বাজারে জুলুম হাঙ্গামা করে এজন্য দরখাস্ত করি বক্রেশ্বরের মেলাতে জুলুম না করে তেঁহায় যেমত হুকুম অতএব উক্ত ডিহি বক্রেশ্বর দরবস্ত দেবদত্তর মৌজা ল চক গঙ্গারামে ডিহি ও শিবপুর সাবিক বীররাজার দেওয়া যথার্থ্য তাহার সনন্দ রাখে উক্ত শর্মা পাণ্ডা মজকুরেরা পুরুষ ২ মুদ্দ্যত হইতে জীউড় সেবা পূজা করিয়া দখলিকার আছে ও বক্রেশ্বরে যে বাজার হয় তাহাতে খাজনা আদায় করিয়া দখলিকার আছে উক্ত দেবত্তর বৃত্তি বেশাদে কেহ জুলুম হাঙ্গামা করিবে না'। (লিপিকাল ১৭৯৩ বঙ্গাব্দ)

গদ্যবৈশিষ্ট্য:

এই অংশে জটিল বাক্য গঠনরীতির প্রভাবে, যতিচিহ্ন ব্যবহারের দুর্বলতার কারণে, অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগের ফলে এই বাক্যগুলির কোণ সুস্পষ্ট অর্থ প্রতীত হয় না।

১১.৩.৫ পর্তুগিজদের দ্বারা রচিত বাংলা গদ্য:

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত বিখ্যাত কয়েকটি গ্রন্থ -

দোম এন্তনিও রচিত 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'।

মনো এল দা অসসুম্পসাম-এর গ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (অনেকের মতে লেখক এই গ্রন্থ দেশিয় খ্রিস্টানদের দিয়ে অনুবাদ করিয়েছিলেন)।

এছাড়াও বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও পর্তুগিজ-বাংলা শব্দভাণ্ডার রচনা করেন মানো এল অসসুম্পসাম।

অষ্টাদশ শতকে ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের লিসবনে ছাপা হয় বাংলা ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ। এর রচয়িতা মনোএল দ্যা অসসুম্পসাম। এই বইয়ের বাঁদিকের পৃষ্ঠায় রোমানো অক্ষরে বাংলা এবং ডান দিকের পৃষ্ঠায় পর্তুগিজ ভাষায় অনুবাদ লক্ষনীয়। অনেকের মতে মূল পর্তুগিজ অংশটুকু মনো-এল এর অনুবাদ হলেও সম্ভবত তিনি বাংলা অংশগুলি দেশিয় কোনো খ্রিস্টানকে দিয়ে অনুবাদ করিয়েছিলেন। এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ এবং তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ পায় যথাক্রমে ১৮৩৬ এবং ১৮৬৯ সালে। এই বইতে প্রশ্নোত্তরের ছলে খ্রিস্ট ধর্মের ব্যাখ্যা প্রকাশ পায়।

নমুনা -'সেভিল্যা। শুহরে এক গৃহস্থ আছিল, তাহার নাম সিরিলো, সেই সিরিলো কেবল এক পুত্রো জন্মাইল; তাহারে এতো দয়া করিল যে কোনো দিন তাহারে শিক্ষা ও না দিল এবং শাস্তিও না দিল; সেই যাহা করিতে চাহিত, তাহা করিত।'

এছাড়াও মনোএল পর্তুগিজ ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। বইটির প্রথম অংশ ব্যাকরণ এবং পরের অংশ পর্তুগিজ বাংলা এবং বাংলা পর্তুগিজ শব্দকোষ।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বই 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'; রচয়িতা দোম আন্তনিও। যিনি একজন পর্তুগিজ পাদ্রী। এই বইতেও একজন ব্রাহ্মণ এবং একজন ক্যাথলিকের মধ্যে প্রশ্নোত্তর ছলে খৃষ্ট মহিমা বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়াও নগেন্দ্রনাথ বসু এবং সুশীল কুমার দে দুটি বইয়ের উল্লেখ করেছিলেন যে দুটি বইয়ের কোন মুদ্রিতরূপ বর্তমানে পাওয়া যায় না। বই দুটি 'প্রশ্নোত্তরমালা' ও 'প্রার্থনামালা'।

১১.৩.৬ আইনের বইয়ের অনুবাদ:

আমরা জানি পলাশী যুদ্ধ পরবর্তীকালে শাসনভার পরিবর্তনের পর বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা বুঝেছিলেন দেশিয় ভাষা না শিখে কার্যভার পরিচালনা করা অসম্ভব। এ সময় একদিকে যেমন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ফারসি জানা মুনশিরা বাংলা সাহিত্য নির্মাণে মনোনিবেশ করেন তেমনি কতকজন ইংরেজ কর্মচারীর সন্ধান পাওয়া যায়। যারা এই সময় বাংলা ব্যাকরণ রচনায়, অনুবাদ রচনায়, আইনের বই অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতমন্যাথিয়েল ব্রাসি হালহেড, জোনাথান ডানকান, এডমন্ড স্টোন প্রমুখ। হ্যালহেড বাংলা শেখাবার উদ্দেশ্যে এটি বাংলা ব্যাকরণ বই রচনা করেন। বহুল আলোচিত এই বইটির নাম 'এ গ্রামার অফ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ'। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে এই বইটি প্রকাশের জন্য অনুরোধ করেন হ্যালহেড। এই বইগুলির ভাষা খুব সহজবোধ্য না হলেও সমকালের বাংলা ভাষার নিদর্শন হিসেবে অবশ্য আলোচ্য।

জোনাথান ডানকানের আইনের বইয়ের অনুবাদ (১৭৮৫ বঙ্গাব্দ)

'জমিদারি ও তালুকদারি ও চৌধুরাই ও বাটী ও ভূমির মিরাসের বিষয় যেখানে একজন না হইয়া অধিক অংশী হয় তাহারা আপন ২ জাতির শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থামতে অংশ পাইবেক এমত প্রকাশের বিষয়ে অংশির দিগের অনুমতিক্রমে ব্যবস্থামতে যাহারা যে অংশ পাওনা হয় প্রত্যেকে সকলের নামে দিক্রি করিতে হরেক ইহার অন্যতম করিতে না পারিবেন'

এডমনস্টোনের অনুবাদ (১৭৯১ বঙ্গাব্দ)

'সকল ফেরবার লোককে রক্ষা করা হাকিমের কর্তব্য কর্ম বিশেষত তাহাদিগে যাহারা সহজেই দুস্থ পেয়ার তালুকদারান ও রায়ত লোক ও আর খেত আবাদ করণওয়ালাদিগের ভালের নিমিত্তে ও রক্ষা করিবার নিমিত্তে নবাব গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর জখন মনাছেন বুঝেন আইন করিবেন।'

ফরস্টারের অনুবাদ (১৭৯৩ বঙ্গাব্দ) (কর্নওয়ালীসী কোড এর অনুবাদ করেন)

'হাকীমের উচিত যে ছোট বড় সকল লোকের বিশেষতঃ দুস্থ ও গরিবদিগের রক্ষা নিয়ত করেন অতএব ঐ শ্রীযুত সকল মফস্বলী তালুকদার ও প্রজা প্রভৃতি চাষী লোকদিগের কল্যাণ ও কুশলের নিমিত্ত যে কালে যে আইনকরণ উচিত জানেন সেকালে তাই নির্দিষ্ট করেন কিন্তু এমন তো সকল আইন নির্দিষ্ট হইতে কোন প্রকারে জমিদার ও হুজুরী তালুকদার প্রভৃতি ভূমাধিকারীদিগের শিরে যে মোকররি জমার ধার্য্য রহে তাহা দিবার বিষয়ে তাহাদিগের কিচু আপত্য ও ওজনর হইবেক না।'

গদ্যের বৈশিষ্ট্য:

ভাষার আড়ষ্ঠতা, বাক্য গঠন এবং পদ গঠনের জটিলতা, যতিচিহ্ন ব্যবহারের সমস্যা এই গদ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাধুভাষাই এই গদ্যরচনার রীতি। সংস্কৃতধর্মী শব্দের পাশাপাশি আরবি-ফারসি শব্দের প্রাধান্য লক্ষণীয়। বাক্য সংগঠনে, পদের সমন্বয়ে, বাক্যাংশগুলির ভারসাম্য রক্ষায় ব্যর্থতা লক্ষণীয়।

১১.৩.৭ বাংলা গদ্যচর্চায় শ্রীরামপুর মিশন:

রাজকাজকর্মচারীদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে, ভাষা শিক্ষাদান, বাংলা পাঠ্যপুস্তক নির্মাণে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি বাংলা গদ্যের বিকাশে আরেকটি প্রতিষ্ঠানের নাম অবশ্যই উল্লেখ্য; শ্রীরামপুর মিশন।

শ্রীরামপুর মিশনের উদ্দেশ্য:

মূলত খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই মিশন প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলা ভাষায় খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার এবং বহু সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদের কাজ শুরু হয় শ্রীরামপুর মিশন এবং প্রেসের হাত ধরে। শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে যুক্ত তিনজন বিদেশি বাংলা গদ্যের পথ চলাকে খানিক প্রশস্ত করেছিলেন। তাঁরা উইলিয়াম কেরী, জোশুয়া মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড

শ্রীরামপুর মিশনের হাত ধরে কেরী এবং তার সহযোগীরা বাইবেল অনুবাদের কাজ শুরু করেন। প্রায় কুড়িটি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন মিশনারিরা। এই বাংলা গদ্যের গঠন খুব সুচিন্তিত, পরিণত না হলেও গদ্যের প্রচারে শ্রীরামপুর মিশন ও প্রেসের ভূমিকা অবশ্যই উল্লেখ্য। শ্রীরামপুর মিশন এবং শ্রীরামপুর প্রেসের হাত ধরে প্রায় ৮০টি পুস্তক রচিত হয় এবং ৭ লক্ষ কপি উচ্চারণ করা হয়।

শ্রীরামপুর মিশন ও প্রেসের উদ্যোগে প্রকাশিত গ্রন্থাদি:

ইংল্যান্ড থেকে একটি পুরনো মুদ্রাযন্ত্র আনিয়ে পঞ্চানন কর্মকারের কাছ থেকে বাংলা হরফ তৈরি করে শ্রীরামপুরে একটি প্রেস গঠিত হয়। এই প্রেস থেকে প্রকাশিত প্রথম বই নিউ টেস্টামেন্টের অন্তর্গত 'মঙ্গল সমাচার মতিউর রচিত' বইটি। ১৮০১ সালে সম্পূর্ণ 'নিউ টেস্টামেন্ট' এবং 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮০৯ সালে ধর্ম পুস্তক নামে সমগ্র বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

যদিও এই বাইবেলের ভাষা অত্যন্ত জড়তাযুক্ত এবং কৃত্রিম। এই অনুবাদে ইংরেজি পদবিন্যাসের রীতি অনুষ্ঠিত হওয়ায় এই গদ্যরীতি জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারিনি।

শ্রীরামপুর মিশন বাংলা গদ্যে প্রথম পাঠ্যপুস্তক ব্যাকরণ, রামায়ণ-মহাভারত মুদ্রণ করে প্রকাশ করেন। এছাড়াও কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণ, ব্যোপদেবের মুগ্ধবোধ, ব্রুকের সম্পাদনায় অমরকোষ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশিদাসী মহাভারত ইত্যাদি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।

উইলিয়াম কেরী ছাড়াও তার অন্যতম সহযোগী জশুয়া মার্শম্যান বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৩১) দুখণ্ড, 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৪৮) রচনা করেন।

শ্রীরামপুর মিশনের গদ্যের বৈশিষ্ট্য:

শ্রীরামপুর মিশনারিদের উদ্যোগে বাংলা গদ্য চর্চার হাতেখড়ি হলেও অভিজ্ঞতার অভাবে স্বচ্ছন্দ সাবলীল বাংলা গদ্য রচনা সম্ভবপর হয়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইংরেজি বাক্যগঠনের রীতি অনুসৃত হয়েছে ফলে স্বাভাবিকতার অভাব লক্ষণীয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার আন্বয়িক প্রভাব অনুবাদের ভাষাকে দুর্বোধ্য করেছে। এছাড়াও নিকৃষ্ট তৎসম শব্দের বাহুল্য, জটিল, আড়ষ্ঠ বাক্যগঠন নীতি, যতিচিহ্নের দুর্বলতা, পদ গঠনের ত্রুটি সমকালীন গদ্যের বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও অতিরিক্ত সংস্কৃতধর্মী তৎসম শব্দের ব্যবহার গদ্যের দুর্বোধ্যতাকে বাড়িয়েছে।

বাংলা গদ্যের পরবর্তী ধাপ নির্মাণের ক্ষেত্রে ভিত্তিভূমি সূচিত হয়েছিল শ্রীরামপুর মিশনের হাত ধরে। সমকালের এই গদ্য মনোগ্রাহী উঠতে পারেনি, ভাষা গঠনের দুর্বলতার কারণে। মিশনারিরা মূলত ধর্ম প্রচারের জন্য, খ্রিস্টধর্মকে মানুষের কাছে বোধগম্য করে তোলার প্রয়োজনে বাংলা গদ্য রচনায় মনোননিবেশ করে।

আমরা এই পর্বে বাংলা গদ্যচর্চার প্রাথমিক পর্বের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। উনিশ শতকে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন সূত্রে বাংলা ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়। ভাষাশিক্ষা প্রদানের স্বার্থেই বাংলা গদ্য নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়। উনিশ শতকের গদ্যচর্চায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রভাব অবশ্য আলোচ্য। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের হাত ধরে বাংলা ভাষা শিক্ষা সূত্রেই গদ্যচর্চা, এবং সাহিত্যিক গদ্যের উন্মেষ ঘটে। তবে এই গদ্যচর্চার বীজ প্রথিত রয়েছে যোড়শ-সপ্তদশ শতকে। এই সময়ের চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ, ওকালতনামা, পরবর্তীতে পর্তুগিজ পাদ্রিদের রচনা, শ্রীরামপুর মিশনের মিশনারিদের রচনা উনিশ শতকের পূর্ববর্তী ধারার গদ্যের উদাহরণ। উনিশ শতক গদ্যচর্চার বিস্তার পর্ব, যা আজকের দশক অবধি প্রবাহিত। এই দীর্ঘ বিবর্তন এক দিনে সংগঠিত হয়নি। গদ্যচর্চার প্রাথমিক ধারাটি বোঝার জন্য যোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের গদ্যচর্চার ধারাটি বোঝার চেষ্টা করেছি।

১১.৪ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যচর্চার ধারা

১১.৪.১ সমকালীন প্রেক্ষিত

ইংরেজ মিশনারিদের পর বাংলা গদ্যের সৃষ্টিপর্বের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের নাম বিশেষভাবে জড়িয়ে রয়েছে। ভারতের শাসনকার্য্যের জন্য ইংল্যান্ড থেকে আগত রাজকর্মচারীদের কাজকর্মের সুবিধার্থে ভাষাগত ব্যবধান দূরীকরণের উদ্দেশ্যে উইলিয়াম কেরীর পরামর্শে ওয়েলেসলি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে দেশিয় ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ইংরেজ সিভিলিয়ানদের অর্থাৎ রাজকর্মচারীদের দেশিয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম কেরী এই কলেজের বাংলা এবং সংস্কৃত বিভাগের দায়িত্ব পান। ১৮০১ থেকে ১৮১৫ সাল এই কয়েক বছরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বাংলা গদ্যের ভিত্তি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যা বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি সংগঠনকে প্রভাবিত করেছিল। আধুনিক সাহিত্য নির্মাণের এই ধারা পরবর্তীতে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের হাত ধরে আধুনিক

সময় পর্যন্ত প্রবাহিত। মূলত দেশিয় ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে গদ্য নির্মাণের সূত্রপাত হলেও গদ্য সাহিত্য নির্মাণে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা বারবার আলোচনায় উঠে আসে। এ প্রসঙ্গে ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন 'গদ্য সাহিত্য রচনা করা এই কলেজটির লক্ষ্য ছিল না, ছিল উপলক্ষ মাত্র।' অবশ্য একথা মানতে অসুবিধা হয় না যে এই উপলক্ষই কলেজটিকে আলোচনার শিরোনামে জায়গা করে দিয়েছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হাত ধরে যে পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হয় তার রচনার দায়িত্ব সামলেছেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং ফারসি জানা মুন্সিরা। ফলে এই দুই ভাষার ভাষারীতি এবং সাহিত্যরীতির প্রভাব স্বভাবতই বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। যার ফলে বাংলা ভাষা সাহিত্য ঋদ্ধ হয়েছে, পুষ্ট হয়েছে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্বে শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থের অভাব অনুভূত হয়। সমস্যা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সমসাময়িক পণ্ডিতদের সাহায্য নেন কেরী সাহেব। উইলিয়াম কেরী তাঁর সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন বাংলা গদ্যগ্রন্থের দুই উল্লেখযোগ্য লেখক রামরাম বসু এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারকে। এই দুই লেখকের রচনাশৈলী ভিন্ন হলেও তাঁদের রচনা বাংলা গদ্যসাহিত্যের নির্মাণকে বহুদিন পর্যন্ত পরিচালিত করেছে। এছাড়াও গোলকনাথ শর্মা, চণ্ডীচরণ মুনশি, তারিণীচরণ মিত্র, হরপ্রসাদ রায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

১১.৪.২ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাদি:

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য-

উইলিয়াম কেরীর 'কথোপকথন' (১৮০১) এবং 'ইতিহাসমালা' (১৮১২)

রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) এবং 'লিপিমালা' (১৮০২)

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'রাজাবলি' (১৮০৮), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮), 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (১৮৩৩) ইত্যাদি।

তারিণীচরণ মিত্রের 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' (১৮০৩)

গোলোকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ' (১৮০২)

চণ্ডীচরণ মুনশির 'তোতা ইতিহাস' (১৮০৫)

হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষপরীক্ষা' (১৮১৫)

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্র' (১৮০৫)

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 'পদার্থ কৌমুদী' (১৮২১) এবং 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী' (১৮২২) ইত্যাদি।

এই গ্রন্থগুলির প্রকাশকালের দিকে লক্ষ করলেই বোঝা যায় উনিশ শতকের প্রথম পর্বে বাংলা গদ্যের কোন প্রামাণ্য নিদর্শন বা আদর্শ লেখকদের সামনে ছিল না। একদিকে সংস্কৃত অনুসারী ভাষারীতি, অন্যদিকে ইংরেজি সাহিত্যরীতির প্রভাব, ফারসি ভাষাশৈলীর প্রভাব যেমন লক্ষণীয় তেমনি প্রচলিত কথ্যভাষারীতির প্রভাবও নজরে পড়ে। কেরী সাহেবের 'কথোপকথন' এবং রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'-তে কথ্যরীতির

প্রভাব লক্ষণীয়। অবশ্য এই ভাষাকে আদর্শ ভাষা বলা চলে না। এইসময় বহুক্ষেত্রেই সংস্কৃত মুখাপেক্ষিতাই সমৃদ্ধির উপায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। তবে কথ্যরীতি ব্যবহার প্রসঙ্গে কেরী সাহেব ছিলেন প্যারিচাঁদ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ বাঙালি স্রষ্ঠাদের পথপ্রদর্শক। পণ্ডিতী ভাষা না আলাপী ভাষা কোন ভাষা গ্রাহ্য হবে তৎকালে এই দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছিল। তবে এই সময় বহুমাত্রিক দ্বন্দ্ব-তর্কের মধ্যে থেকেই বাংলা গদ্যের একটি কাঠামো তৈরি হয়। এই কাঠামোর ওপর নির্ভর করে পরবর্তীতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গরূপ নির্মিত হয়। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এবং উইলিয়াম কেরীর 'কথোপকথন' ভিন্ন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অন্যান্য গ্রন্থগুলি মূলত অনুবাদমূলক; সংস্কৃত, আরবি, ফারসি এবং ইংরেজি সাহিত্য থেকে গৃহীত।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা পরবর্তী বাংলা গদ্যের চলন, বৈশিষ্ট্য, স্বরূপ বোঝার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরী, ফারসি ভাষার দক্ষ, কেরী সাহেবের মুন্সি রামরাম বসু এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ রচিত সাহিত্য সংরূপগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব। সাহিত্যিকদের রচিত সাহিত্যকর্মগুলি বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে উনিশ শতকের প্রাথমিক পর্বের বাংলা ভাষাচর্চার ধারাটি বিশ্লেষণের বোঝার চেষ্টা করব।

১১.৪.৩ রামরাম বসুর জীবন ও কর্ম:

রামরাম বসু বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগের অন্যতম প্রধান গদ্য লেখক। রামরাম বসু জন্মগ্রহণ করেন ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে। মৃত্যু হয় ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে। তিনি উইলিয়াম চেম্বার্সের মুনশি ছিলেন। কালক্রমে রামরাম বসুর সঙ্গে পরিচয় হয় উইলিয়াম কেরীর; কুড়ি টাকা মাসিক বেতনের বিনিময়ে কেরী সাহেবের মুনশি নির্বাচিত হন। যাঁদের সহযোগিতায় কেরী বাংলা গদ্যে উপযোগী পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলে তাঁদের মধ্যে অন্যতম রামরাম বসু। সেকালের সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত ভদ্রলোকের মতো রামরাম বসুও ছিলেন ফারসি ভাষার দক্ষ মুনশি। সংস্কৃতে দক্ষতা না থাকলেও সেকালের প্রচলিত নিয়মে বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনায় মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন রামরাম বসু।

রামরাম বসু রচিত দুটি প্রধান গ্রন্থ 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এবং 'লিপিমালা'।

১১.৪.৪ রামরাম বসুর সাহিত্যকর্ম:

'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র': সাধারণ পরিচয়

প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে বংশপরম্পরায় বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত ছিল, যা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন রামরাম বসু। এছাড়াও ফারসিতে প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে যা কিছু লেখা ছিল তার ওপর ভিত্তি করেই 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রচনা করেন লেখক। তবে এই বইটি একটি মৌলিক রচনা। ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ নয়।

রচনারীতির বৈশিষ্ট্য:

বইটিতে শাসনকার্য্য বা রাজস্ব বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে আরবি-ফারসি শব্দের আধিক্য লক্ষণীয়। অনেকেই

এই আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারকে লেখকের রচনাশৈলীর দোষ হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন। বইটির ভাষা সাধু বাংলা এবং কিছু অংশ চলিত কথকতার ভঙ্গিতে রচিত। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বাংলা গদ্যে রচিত একটি দীর্ঘ মৌলিক রচনা। এই বইতে বাংলা ভাষার বহুমাত্রিক রূপের সমাবেশ ঘটেছে। এই বইতে আরবি, ফারসি, বাংলা, সংস্কৃত পাশাপাশি অবস্থানের ফলে এক মিশ্র ভাষাশৈলী তৈরি হয়। মনে রাখতে হবে এই পর্বে বাংলা গদ্যের কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ফারসি ভাষার মুনশি রচিত এই গদ্যগ্রন্থে ফারসি শব্দের বাহুল্য লক্ষণীয়। উদাহরণ-

'যে কালে দিল্লির তক্তে হোমাঙ্গু- বাদশাহ তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল বঙ্গ বিহারের নবাব পরে হোমাঙু বাদশাহের ওফাত হইলে হেন্দোস্তানে বাদসাহ হইতে'

পদবিন্যাস নীতির জটিলতা এবং বিশৃঙ্খলা এ বাক্যে লক্ষণীয়।

'লিপিমালা':

'লিপিমালা' একটি প্রবন্ধ পুস্তক। এই বইটি পত্রাকারে লিখিত হলেও এটিকে চিঠি বলা যাবে না। আলোচকদের মতে এটিকে চিঠির আকারে রচিত কাহিনি বা প্রবন্ধ বলাই শ্রেয়। এই বইতে বিভিন্ন কাহিনির বর্ণনা রয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'পরীক্ষিতের কাহিনি', 'গৌরাঙ্গের উপাখ্যান', 'বাইবেলের অনুবাদ ও খ্রিস্টীয় ধর্ম প্রচারকদিগের কথা', 'শিব-সতী কাহিনি', 'শ্রীগৌরঙ্গের জীবনী', 'কালযবন ও মুচকুন্দের কাহিনি', 'সাগর ও ভগিরথ কাহিনি' ইত্যাদি।

'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'-এর তুলনায় 'লিপিমালা'-র ভাষা অনেক বেশি কথ্য ভাষার অনুসারী। এই রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি শিক্ষার্থীকে দেশিয় ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করানো। রামরাম বসু বইয়ের ভূমিকাতেই লিখেছেন

'এখন এ স্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এদেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজক্রিয়াক্ষম হইতে পারেন না ইহাতে তাহদিগের আকিঞ্চন এখনকার চলন ভাষা ও লেখাপড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ববিধ কার্য্যক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে এ ভূমীর যাবতীয় লেখাপড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপিমালা নাম পুস্তক রচনা করা গেল।'

'একি তুমি কোন মানুষ যে কটক পাঁচনী কর এ অঞ্চলের উপর এ তোমার কি প্রকার ইতর বিবেচনা কোতা শুনিয়াছ শুনি আহারে শার্দুল স্থকিত হও। এ সামান্য বিষয় প্রযুক্ত এখানকার কোপের বাহুল্য হয় না শৃগালের গর্জনে কেশরী নহি রোষে যদিতু হইল তবে তোমার কি গতিক হইবেএখানকার ক্রোধ যদি হয় তবে অতি ইন্দ্র সখ্য করিলে ওনা পাবে রক্ষা বৈরিদমা সেনা মোর যদ্যপি কোপে সসৈন্যোতে সংহার করিবে।'

১১.৪.৫ রামরাম বসুর গদ্যশৈলী:

রামরাম বসুর রচনায় বেশকিছুক্ষেত্রে শব্দের প্রাচীন প্রয়োগ লক্ষণীয়। বাক্য গঠনের জটিলতা অবশ্য লক্ষণীয়। প্রাচীন শব্দের পাশাপাশি আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারও লক্ষ করা যায় রামরাম বসুর রচনায়। যেমন-

তবকি, তক, তাগিদ, নালিশ, আদালত, ফর্দ, মহিনা, কাগজ ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে রামরাম বসু ছিলেন ফার্সি ভাষার মুনসি, কেরী সাহেবের ফারসি ভাষা শিক্ষক। রামরাম বসুর রচনাশৈলী মূলত সাধু ভাষার অনুবর্তী হলেও এটি কথকতার ভাষণরীতির অনুগামী।

প্রধান গুণ ভাষার সরলতা; এছাড়াও প্রচলিত শব্দ, পদ এবং ইডিয়ম ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষণীয়। শব্দের বানান সর্বত্র শুদ্ধ নয়। তবে এই গুণাবলীগুলি সত্ত্বেও সমকালের বাংলা গদ্য-এর প্রকাশ্যে বিকাশে রামরাম বসুর মতো মৌলিক গদ্য লেখকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১১.৪.৬ উইলিয়াম কেরীর জীবন ও কর্ম:

উইলিয়াম কেরী ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করেন এবং ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে এসে পৌঁছান। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে অন্যান্য মিশনারিদের সহায়তায় শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় থেকেই কেরীর জীবনে এক নতুন অধ্যায় সূচনা হয়। শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে শ্রীরামপুর প্রেস প্রতিষ্ঠার সূত্রে বাংলা বইয়ের প্রচারে-প্রসারে জোয়ার আসে। মূলত বাংলায় ধর্ম চর্চার প্রয়োজনে বাংলা গদ্য রচনার সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তী পর্যায়ে বিদেশি কর্মচারীদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে, দেশিয় বাঙালিকে আধুনিক শিক্ষায়-চিন্তনে সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে পাঠ্যপুস্তক নির্মাণ সূত্রে বাংলা গদ্যচর্চার বিকাশ ঘটে।

১১.৪.৭ উইলিয়াম কেরীর সাহিত্যচর্চা:

উইলিয়াম কেরী রচিত অন্যতম দুটি গ্রন্থ 'ইতিহাসমালা' এবং 'কথোপকথন'। কেরী সাহেবের এই দুটি বই ছাড়াও ১৮০১ সালে ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণ বই, ইংরেজি অভিধান সংকলন করেন। কেরী ১৮১৮ সালে ইংরেজি ভাষায় একটি মাসিক পত্র পরিচালনা করেন, যার নাম দ্যা ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া। পত্রিকা পরিচালনার কাজে সহযোগীর ভূমিকা পালন করেন জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড।

'ইতিহাসমালা':

'ইতিহাসমালা' রচনাকাল, এবং লেখক পরিচিতি নিয়ে নানান মতানৈক্য রয়েছে। তবে বেশিরভাগ আলোচকদের মতে এই গ্রন্থটি ১৮১২ সালে রচিত; অবশ্য এটি কেরীর নিজস্ব রচনা নয়, তিনি সংকলকমাত্র। নানা মতানৈক্য পেরিয়ে আলোচকরা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে কেরীর নির্দেশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতরা নানান সূত্র থেকেই গল্পগুলি সংগ্রহ করেছিলেন।

সাধারণ পরিচয়:

পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বত্রিশ সিংহাসন, বেতাল পঞ্চবিংশতি, পুরুষপরীক্ষা, ঈশপের গল্প, জাতক, মঙ্গলকাব্য, ইতিহাস, সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদের উপর ভিত্তি করে 'ইতিহাসমালা' গড়ে উঠেছে। গল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য নীতিশিক্ষা প্রদান। ইতিহাসমালা প্রায় দেড়শত গল্পের সংকলন। বাংলা এবং ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম গল্প সংগ্রহ হিসাবে 'ইতিহাসমালা'-র গুরত্ব অবশ্য আলোচ্য। সম্ভবত গল্পসংগ্রহ হওয়ার কারণেই সাধু

ভাষা রচিত হওয়া সত্ত্বেও এই গ্রন্থের রচনা অনেক বেশি প্রাঞ্জল। ভাষার দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণ হয় চলিত বাংলা গদ্য প্রচলনের আগেই উনিশ শতকের বহুপূর্বেই মানুষের কথ্য বাংলা অনেক বেশি সরল, সহজ এবং শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

উদাহরণ —

'এক রাজার দুই সন্তান কিন্তু উভয় মূর্খতম (১) রাণী পতিব্রতা (২) পরে রাজা আপন তনয়ের দিগের বিদ্যার নিমিত্তে শাস্ত্রজ্ঞ একজন পণ্ডিত রাখিয়া পুত্র দিগকে সমর্পণ করিলেন।'

'এক গৃহশেতর চার ভাই একত্র আছে। আর মধ্যে বড় যে ব্যক্তি সে ব্যবসা করে একদিন সে বলদ লইয়া বাণিজ্যে যায় সেই সময় তত্ত্ব করিয়া দেখিল যে গুণসূচি নাহি। পরে অনেক অন্বেষণ করিল এবং বাটীর প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিল কোন প্রকার পাইল না অতয়েব সে বড় বিরক্ত হইয়া বলিল হায় হায় আমার যদি পঞ্চাশ টাকা ক্ষতি হইত তাহাতেও এমন দুঃখী হইতাম না।' সরল গদ্যে, কথ্যরীতির আশ্রয়ে অনৈতিহাসিক, লৌকিক, পৌরাণিক নানান গল্প সংকলিত হয়েছে। যেমন

'কাশ্মীর দেশেতে মন্দো বুদ্ধি নামে এক সেকচিল্লী থাকে সে নগরে মোট বহিয়া মজুরি করিয়া খায় এমোতে কতক দিন যায়। এক দিবস কোন সিপাই হস্তিনা নগর হইতে সেখানে আসিয়া এক ঘরা ঘৃত খরিদ করিয়া মজুর তল্লাস করিতে ঐ মন্দবুদ্ধ বলিল যে আমি এই ঘৃতকুম্ভ লইয়া যাইতেও পথিমধ্যে বলে বিচার করিতে লাগিল ঐ যে সিপাহীর ঠাঁই মজুরি পাইব তাহাতে প্রথমে মুরগী খরিদ করিব তাহার অনেক বাচ্চা হইলে পাল বাড়িলে মুরগী বেঁচিয়া বকরী কিনিব'

গদ্যবৈশিষ্ট্য:

একটি অংশগুলি পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই এখানে সাধু শব্দ ব্যবহৃত হলেও তার মধ্যে সংস্কৃত শব্দের আড়ম্বর নেই। বরং বাক্য গঠন পদ্ধতি জটিলতা মুক্ত।

'কথোপকথন':

বইটি মূলত দ্বিভাষিক। কথোপকথনগুলি অধিকাংশই বিদেশিদের ব্যবহারের স্বার্থে শিক্ষার উপযোগী হিসেবে রচিত হয়েছিল। এই বই-এ মূলত সাধু ভাষা ব্যবহৃত হলেও কিছু ক্ষেত্রে রচনারীতি কথ্য ভাষার অনুরূপ। অনেকেই চলিত গদ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হিসেবে কেরীর গুরুত্ব স্বীকার করেছেন।

উদাহরণ—

দুইজন স্ত্রীলোকের কথাবার্তা অংশের উদাহরণ -

'১মা- ওলো তোর ভাতার কারে কেমন ভালোবাসি বল শুনি।

২য়া- আহা তাহার কথা কহ কেন? এখন আর আমাদের কি আদর আছে? নতুনের দিকে মন ব্যতিরেকে পুরাণের দিকে কে চাহে?'

১১.৪.৮ উইলিয়াম কেরীর গদ্যবৈশিষ্ট্য:

কেরী এবং তাঁর সহযোগীরা কেউ সংস্কৃত রীতি, কেউ ফারসি রীতি, কেউ ইংরেজি রীতি কেউবা মুখের কথাকেই সাহিত্য রচনার শৈলী স্বরূপ ব্যবহার করতে চেয়েছেন। সমকালের গদ্যের কোন নিদর্শন না থাকায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বাংলা গদ্যের একটি প্রামান্য কাঠামো তৈরির চেষ্টা করেছিলেন। তবে তাঁরা কেউই বাংলা বাক্যের আদর্শ গঠন নিরূপণ করতে পারেননি।

১১.৪.৯ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের জীবন ও কর্ম:

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ১৮০১ সালে মাসিক দুশো টাকা বেতনের বিনিময়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত হিসেবে যোগদান করে। ১৮০৫ সালে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকের পদেও আসীন হন। রামমোহনের সমসাময়িক বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী ধারার লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাংলা সাহিত্যচর্চার প্রথম ধারার অন্যতম আলোচ্য নাম। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হাত ধরে গোলকনাথ শর্মা, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ মুন্সি, রামরাম বসু প্রমুখের সঙ্গে নতুন বাংলা ভাষা-সাহিত্য চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। উইলিয়াম কলেজের অন্যান্য লেখকদের তুলনায় বিদ্যালঙ্কার মহাশয় রচিত পুস্তকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত বইগুলি, 'বত্রিশ সিংহাসন', 'রাজাবলি', 'হিতোপদেশ', 'বেদান্ত চন্দ্রিকা', 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'।

১১.৪.১০ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সাহিত্যকর্ম:

'বত্রিশ সিংহাসন':

"হে মহারাজ শুন রাজলক্ষ্মী কখন কাহাতেও স্থির হইয়া থাকেন না। রক্তমাংস মলমূত্র নানাবিধ ব্যাধিময় এ শরীরও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয় অতএব এ সকলে অত্যান্তিক প্রীতি করা উপযুক্ত নয় প্রীতি যেমন সুখদায়ক বিচ্ছেদে ততোধিক দুঃখদায়ক হন অতএব নিত্য বস্তুতে মনোভিনিবেশ জ্ঞানীর কর্তব্য।"

"রাজা বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে যোগী যে বিষয় অবশ্য ভবিতব্য তাহার অন্যথা কদাচ হয় না। পুরুষের চেষ্টাতে কি হয়। ইহা শুনিয়া যোগী কহিলেন হে মহারাজ তুমি যে পুরুষ কহিলা এ নীতি শাস্ত্র বিরুদ্ধ নীতি শাস্ত্রের মতে যে পুরুষ উদ্যোগ সর্বদা করে সেই উত্তম পুরুষের আর ভবিতব্যই হয় যে ভবিতব্য নয় সে নানা যত্নেতেও হয় না এ কাপুরুষের কতা অতএব কোন কর্ম পুরুষার্থ ব্যতিরেকে হয় না।"

এই অংশে যতিচিহ্নের স্বল্পতার কারণে অর্থবোধে খানিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

'হিতোপদেশ':

এটি একটি আক্ষরিক অনুবাদ। আমরা জানি এই সময় বিভিন্ন সাহিত্য থেকে অনুবাদ গ্রন্থ রচনা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। মূলের গদ্যরীতি অনুসরণ বা অনুকরণের প্রবণতা বাংলা গদ্য ধারায় লক্ষণীয়। হিতোপদেশের ক্ষেত্রেও সংস্কৃত থেকে অনুবাদের কারণে বাক্যরীতি সংস্কৃত অনুসারী।

যেমন—

'দ্বারবতী নামে পুরীতে কোন গোপের বন্ধু থাকে সে ভ্রষ্টা গ্রামের কোটালের এবং তাহার পুত্রের সহিত ক্রীড়া করে পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন কাষ্ঠেতে অগ্নি হয় না নদীতে সমুদ্র তৃপ্ত হয় না প্রাণিতেও যম তৃপ্ত হয় না।' 'মগধদেশে চম্পকাবতী নামে এক বন থাকাতে তাহাতে হরিণ ও কাক দুই জন বহুকাল বড় স্নেহেতে বাস করে সেই হরিণ আপন ইচ্ছামত ভ্রমণ করত হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হইয়া কোন শৃগাল কতৃক দৃষ্ট হইল তাহাকে দেখিয়া শৃগাল চিন্তা করিল আঃ কি প্রকারে এই উত্তম ললিত মাংস খাইব'

'রাজাবলি':

'রাজাবলি' বাংলা ভাষায় ভারতবর্ষের প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস। এই গ্রন্থের উদাহরণ

'যে সিংহাসনে অমূল্য রত্নময় কিরীটধারী রাজারা বসিতেন সেই সিংহাসনে জটাধারী বসিল। যে সিংহাসনস্থ রাজাদের নিকটে অনাবৃত অঙ্গে কেহ যাইতে পারিত না সেই সিংহাসনে স্বয়ং দিগম্বর রাজা হইল।'

'বেদান্তচন্দ্রিকা':

রামমোহন রায়ের 'বেদান্তগ্রন্থ'-এর প্রতিবাদে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এই গ্রন্থ রচনা করেন। এখানে দুই বিরুদ্ধ মতের অবতারণা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হয় মৃত্যুঞ্জয় এবং রামমোহনের উদ্যোগে বাংলা ভাষা শাস্ত্র নির্ভর আলোচনার আধার হয়ে ওঠে। তথ্য-তত্ত্বে সমৃদ্ধ বই হওয়ার কারণে 'বেদান্তচন্দ্রিকা'-র শব্দচয়ন,ভাষা গঠন খানিক জটিলতাপূর্ণ। যেমন—

'পরমার্থদর্শী ধার্মকি সৎ পুরুষদের নিস্মলজলবদ্‌বুদ্ধিতে বেদান্ত সিদ্ধান্ত বিস্তারার্থে তৈলকণাবত বেদান্তসিদ্ধান্তলেশমাত্র প্রক্ষেপ করা গেল আর যেমিন মরি পথে ঘাটে পড়িয়া থাকে না কিন্তু তৎপরীক্ষকেরা উত্তম সংপুটেতে অতি যত্নে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখেন'

গদ্যবৈশিষ্ট্য:

রামমোহনের চিন্তার উল্টো দিকে রক্ষণশীল মতামত প্রকাশ করেছিলেন, ভাবনা প্রকাশের পাশাপাশি ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও রক্ষণশীলতা লক্ষণীয়। এই অংশে ভাষা ব্যবহারে প্রাঞ্জলতা, সাবলীলতার অভাব লক্ষণীয়।

'প্রবোধচন্দ্রিকা':

এই বইটি শ্রীরামপুর প্রেস থেকে প্রকাশ পায়; অনেকেই এই বইটির রচনাকাল সম্পর্কে মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন। তবে জানা যায়, এই বই যখন মুদ্রিত হয় তার বহু পূর্বে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু ঘটে। সূচনায় ক্লার্ক মার্শম্যান লিখিত একটি ভূমিকা উল্লেখ্য। গ্রন্থের বিষয়বস্তু চারটি স্তবকে বিভক্ত, প্রত্যেকটি স্তবক কয়েকটি কুসুম-এ বিভক্ত। মুখবন্ধ, কাব্য লক্ষণ, গদ্য, আখ্যায়িকা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছিল এই কুসুম গুলির অভ্যন্তরে। বিভিন্ন কুসুমে নীতিশিক্ষামূলক কাহিনির পরিচয় দেখতে পাওয়া যায়।

'প্রবোধচন্দ্রিকা'-য় মূলত তিনটি রচনা নীতি অনুসৃত হয়েছে। বইটি বেশিরভাগই সাধুরীতিতে রচিত হলেও

কতগুলি লোক প্রচলিত গল্প বর্ণনায় কথ্যরীতির আশ্রয় নিয়েছেন লেখক। সংস্কৃত থেকে অনুবাদের ক্ষেত্রে সংস্কৃত রীতির ব্যবহার, আলংকারিক প্রয়োগ লক্ষণীয়।

সাধুরীতির উদাহরণ

"পঞ্চকোট বন মধ্যে এক ব্যাঘ্র এবং ব্যাঘ্রী সুখে বাস করে। কাল প্রভাবে ওই বাঘিনীর কাল হওয়াতে ব্যাঘ্র স্ত্রীবিয়োগে অতিকাতর হইয়া বিবাহাথ উন্মত্ত প্রায় হইল। স্বয়ং অনেক অন্বেষণ করিয়া কোথাও কন্যা না পাইয়া পথিকেরদিগকে ভক্ষণ করিয়া বস্ত্রালঙ্কার স্বর্ণরূপাদ যথেষ্ট সামগ্রী লইয়া রাত্রি কালে একঘটক ব্রাহ্মণের গৃহদ্বারে আসিয়া গভীর স্বরে ডাকিয়া কহিল ঘটক ঠাকুর তোমরা সকলে সম্বন্ধে নির্ণয় করিয়া বিবাহের মধ্যস্থ হইয়া পরের অংশ কিছু পাইয়া শুভ কর্ম লগ্নানুসারে সম্পন্ন করিয়া থাক...।"

গদ্যবৈশিষ্ট্য:

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সাধুরীতি রচনার ক্ষেত্রে কিছু কিছু অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার করেছেন অনেক ক্ষেত্রেই। এই বাক্যে সাধুরীতির সঙ্গে কিছু চলিত রীতির মিশ্রণ লক্ষণীয়। যেমন প্রথম বাক্যে ক্রিয়াপদ হিসেবে 'করে' ব্যবহার করেছেন যা একটি চলিত রূপ, আবার দ্বিতীয় বাক্যে 'হইল' ক্রিয়াপদের সাধুরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে দীর্ঘ বাক্য গঠন খানিক জটিল হলেও অর্থবোধগমনে কোন অসুবিধা হয় না।

মৌখিক রীতির উদাহরণ:

'তাহার স্ত্রী কপালে করাঘাত করিয়া বলিল ওমা একি হইল শিয়ালের কামড় বড় মন্দ না জানি মোর ভাগ্যে কি আছে অভাগিনী জনম দুখিনী মুই। মোরা চাস করিব ফসল পাবো রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছর শুদ্ধ অল্প করিয়া খাবো ছেলেপুলে গুলি পুষিব। যে বছর শুকা হাজারে কিছু খন্দ হয় না সে বছর বড় দুঃখের দিন কাটি কেবল উড়ি ধানের মু মিটর মসুর শাক পাত শাবক গুগলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি খড়কুটা কাটা শুকনা পাতা কঞ্চী তুষ ও বিলঘুটিয়া কুরাইয়া জ্বালানি করি।'

১১.৪.১১ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গদ্যবৈশিষ্ট্য:

অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবোধচন্দ্রিকা' সম্পর্কে বলেন 'প্রবোধচন্দ্রিকার কোনো কোনো স্থলে একটু দুরহ সংস্কৃত বাহুল্য আছে। কিন্তু তা বাদ দিলে তার গদ্যগ্রন্থে একইসঙ্গে গুরুগাম্ভীর ক্লাসিক রীতি সরল পরিচ্ছন্ন সাধু ভাষা এবং স্থানীয় উপভাষার প্রভাব দেখা যায়।'

সুকুমার সেনের মতে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কথ্য এবং সাধু উভয় রীতিতেই রচনা কৌশল দেখিয়েছেন তবে তার রচনাও যুগের সাধারণ দোষ থেকে মুক্ত নয়। তিনি আরো বলেন যে সংস্কৃত অনুসারী হওয়ায় ভাষা সর্বত্র সুগম নয় এবং কথ্য ভাষার অংশগুলি প্রাঞ্জল।

বাংলা লিখতে বসে সাধু, চলিত এই দুই রীতির পার্থক্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্য রচনা মূলত শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রয়োজনেই রচিত হয়েছিল। ফলে বাস্তব জীবনের সঙ্গে, সমাজ পরিমণ্ডলের সঙ্গেও রচনাকারদের যোগাযোগ ছিল খুব ক্ষীণ। তবু একথা বলা যায়

বাংলা গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কর্মকাণ্ড পরবর্তী বাংলায় লেখকদের রচনার পথকে প্রশস্ত করেছিল। আমরা রামরাম বসু, উইলিয়াম কেরী ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখের সাহিত্যরীতি আলোচনা সূত্রে বাংলা গদ্য চর্চায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকার প্রেক্ষিতটি বোঝার চেষ্টা করলাম।

১১.৫ রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের গদ্য

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হাত বাংলা গদ্যচর্চার পথচলা শুরু হয়। এই সময় ফারসি মুনশি, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সাহিত্যচর্চার ওপর নির্ভর করেই বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা, ভাষাশিক্ষার সূত্রপাত ঘটে। এই সময় যে দুজন মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলা ভাষা সাহিত্য প্রাথমিক যুগের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে পেরেছিল তাঁরা- রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রামমোহন রায় বা বিদ্যাসাগরের গদ্য বর্তমানের পাঠকের নজরে কঠিন, জটিল, সংস্কৃত শব্দবহুল হলেও সমকালে এই দুজনই বাংলা ভাষাকে যৌক্তিক গদ্য নির্মাণের উপযোগী রূপে গড়ে তুলেছিলেন। সর্বোপরি, রামমোহন রায় বা বিদ্যাসাগর মহাশয়দের সামনে বাংলা গদ্যচর্চার কোন নিদর্শন ছিল না। নানান পরীক্ষা, নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বাংলা গদ্যচর্চার ধারাটি পুষ্টিলাভ করেছে। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যচর্চা থেকে, সমাজ-সংস্কারমূলক গদ্যরচনা, শাস্ত্রচর্চার আধার হয়ে উঠেছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য।

আমরা রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গদ্যচর্চার নিদর্শন আলোচনা সূত্রে তাঁদের গদ্যশৈলী, সমকালের গদ্যচর্চার ধারটি বোঝার চেষ্টা করব।

১১.৫.১ রাজা রামমোহন রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী:

১৭৭৪ মতান্তরে ১৭৭২ সালে হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন রামমোহন রায়, তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৩৩ সালে, বিদেশে।

তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে রামমোহন রায়ের ভাবনা চিন্তন তাঁকে একজন আধুনিক মানুষের তকমা দিয়েছিল। রামমোহন রায় দিল্লির বাদশাহ ও দ্বিতীয় আকবরের কাছ থেকে 'রাজা' উপাধিটি পান। রামমোহন রায় ভারতবর্ষকে, ভারতের চিরন্তন দর্শন, ভাবনাকে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপিত করেছিলেন।

১১.৫.২ রামমোহন রায়ের সমকাল:

আঠারো শতকের শেষ লগ্ন থেকে মূলত উনিশ শতক জুড়ে বাঙালির চিন্তনে মননে এক নব উদ্দীপনা, জাগরণ সঞ্চারিত হয়। ইংরেজ আগমন সূত্রেই পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শন, বিজ্ঞান চর্চা, আধুনিক মতবাদ-মতাদর্শের প্রসার ঘটে। আধুনিক শিক্ষার হাত ধরে আবির্ভাব ঘটে আধুনিক চিন্তন সম্পন্ন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি শ্রেণির। সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্যের বিভিন্ন প্রথাবদ্ধতাকে প্রশ্ন করার স্বাভাবিক প্রবণতা তৈরি হয়।

উনিশ শতকে প্রাথমিকভাবে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের স্বার্থে, বাংলা ভাষাশিক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষিত বাঙালির হাত ধরে এক নতুন সাহিত্য সম্ভার তৈরি হয়। ষোড়শ, সপ্তদশ শতকে বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজে, চিঠিপত্র দলিল দস্তাবেজে গদ্যচর্চার নিদর্শন দেখা গেলেও, সাহিত্য মাধ্যম হিসেবে গদ্যচর্চার প্রসার ঘটে মূলত উনিশ

শতকে। প্রাথমিকপর্বে পর্তুগিজ মিশনারি, বিভিন্ন ধর্মযাজকদের ধর্মচর্চার উদ্দেশ্যে, কখনো ব্যক্তিগত উৎসাহে, ইংরেজ রাজকর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়ে বাংলা গদ্যচর্চার সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীতে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর মহাশয়দের ঐকান্তিক আগ্রহে বাংলা ভাষা-সাহিত্যচর্চার সম্প্রসারণ ঘটে।

১১.৫.৩ বাংলা গদ্যচর্চায় রামমোহন রায়ের ভূমিকা:

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হাত ধরে বাংলা গদ্যচর্চা সূচনা হলেও রামমোহন রায়ের উদ্যোগে বাংলা গদ্যের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়। আজকের আধুনিক বাংলার বিচারে রামমোহনের গদ্য জটিল হলেও সমকালের সাপেক্ষে রামমোহন সাধারণ মানুষের উপজীব্য বাংলা গদ্য রচনা করতে চেয়েছিলেন। তবে রামমোহনের গদ্য সংস্কৃত বহুল, আড়ষ্ট, জটিল আন্বয়িক গঠন সম্পন্ন।

সমাজ সংস্কার থেকে আধুনিক গদ্য রচনায় রামমোহনের অবদান পর্যালোচনা সাপেক্ষ; এসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন — 'কী রাজনীতি কী বিদ্যা শিক্ষা, কী সমাজ, কী ভাষা আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহা সূত্রপাত করিয়া যান নাই।'

আবার উনিশ শতকের বহুল আলোচিত সম্পাদক, লেখক ঈশ্বর গুপ্ত রামমোহন রায় প্রসঙ্গে বলেন — 'দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাব সকল স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইত।'

রামমোহন রায় গদ্যকে তর্ক-বিতর্ক, মীমাংসার বাহন হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। গদ্যকে যুক্তিতে, তর্কে, চিন্তায় সজ্জিত করে চিন্তাশীল মননের উপযোগী করে তোলেন। রামমোহনের গদ্য ঋজুগতি, তীক্ষ্ণ, যৌক্তিক পারম্পর্য্যে সুগঠিত।

১১.৫.৪ রামমোহন রায়ের সাহিত্যচর্চার ধারা:

রামমোহনের রচনাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় - ধর্ম ও তত্ত্বমূলক আলোচনা এবং সামাজিক আচার ও প্রথা বিষয়ক

ধর্ম ও তত্ত্বমূলক আলোচনা বিষয়ক পর্বটিকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে

একেশ্বরবাদের স্বপক্ষে, ধর্ম বিষয়ক দ্বন্দ্ব-তর্ক, উপনিষদের অনুবাদ

একেশ্বরবাদের সপক্ষে:

তিনি যুক্তিতর্কের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। রামমোহন শাস্ত্রকে পাথেয় করে যুক্তিবাদী গদ্য গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। একেশ্বরবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে উপনিষদ অনুবাদ করেন। একেশ্বরবাদের স্বপক্ষে রামমোহনের প্রথম রচনা'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫) এবং 'বেদান্তসার' (১৮১৬)। এই 'বেদান্ত গ্রন্থ'-এর ভূমিকার সমকালীন বাংলা গদ্যের অস্পষ্টতা, অনুন্নত অবস্থার কথা উল্লেখ করে বাংলা গদ্য গঠন সম্পর্কে আলোচনা করেন রামমোহন রায়।

রামমোহনের ধর্ম বিষয়ক আলোচনা:

ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার (১৮১৭) (মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র উত্তরে রাজা রামমোহন রায় 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' নাম্নী একটি ৬৪ পাতার পুস্তিকা রচনা করেন।), 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮), 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০), 'ব্রাহ্মণ সেবধি ও ব্রাহ্মণ মিশনারী সম্বাদ' (১৮২১) ইত্যাদি।

তিনি বেশ কতকগুলি সংস্কৃত উপনিষদের অনুবাদও করেন। যেমন কেনোপনিষদ (১৮১৬), ঈশোপনিষদ (১৮১৬), কঠোপনিষদ (১৮১৭), মুণ্ডকোপনিষদ (১৮১৯) ইত্যাদি।

সামাজিক আচার ও প্রথা বিষয়ক:

শাস্ত্রকে হাতিয়ার করে সামাজিক বিভিন্ন সংস্কার, আচার সম্পর্কে রামমোহন লিখিত মৌলিক রচনার হদিশ পাওয়া যায়। এই রচনাগুলিতে রামমোহন রায় যৌক্তিক গদ্য রচনার নজির প্রকাশ করেছিলেন। এই রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখ্য 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তকের সম্বাদ' (১৮১৮), 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' (১৮১৯), 'সুব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার' (১৮২০), 'কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার' (১৮২৬)।

সমাজ-সংস্কারমূলক গদ্যের উদাহরণ:

শাস্ত্রকে হাতিয়ার করে সমাজ সংস্কারের যজ্ঞে শামিল হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। এই সূত্রেই রামমোহন গদ্যকে যুক্তিতে, তর্কে, চিন্তায় সজ্জিত করে আধুনিক চিন্তাশীল মনের উপযোগী করে তোলেন। 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক বিবর্তকের সম্বাদ' আলোচনা করলে তার প্রমাণ মেলে 'তুমি যে কহিতেছ সহমরণ ও অনুমরণ বিধায়ক অঙ্গিরা প্রভৃতির যে স্মৃতি তাহা মনুস্মৃতির বিপরীত হয় এ কথা আমরা অঙ্গীকার করি না যেহেতু মনু যে কর্ম করিতে বিধি দেন নাই তাহা অন্য স্মৃতিকারেরা বিধি দিলে মনুর বিপরীত হয় না যেমন মনু সন্ধ্যা করিতে বিধি দিয়েছেন হরি সংকীর্তন করিতে কহেন নাই কিন্তু ব্যাস হরি সংকীর্তন করিতে কহিয়াছেন সে ব্যাসবাক্য মনুর বিপরীত নহে এবং হরি সংকীর্তন করা নিষিদ্ধ না হয় সেইরূপ এখানেও জানিবে যে মনু বিধবাকে ব্রাহ্মচর্য্যের বিধি দিয়াছেন এবং বিষ্ণু প্রভৃতি ঋষিরা ব্রহ্মচর্য্য এবং সহমরণ উভয়ের বিধি দিয়াছেন অতএব মনুস্মৃতি সহমরণের অভাব পক্ষে জানিবে।'

রামমোহনের গদ্যে সঠিকভাবে যতি চিহ্নের ব্যবহার না থাকায় দীর্ঘ বাক্যের জটিলতা বহু ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়।

অন্যান্য সাহিত্যকর্ম:

এছাড়াও রামমোহন ১৯২৬ সালে একটি বাংলা ব্যাকরণ বই রচনা করেন, বইটিকে আমরা 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩ বঙ্গাব্দ) নামই জানি। উনিশ শতকের আধুনিক মানুষ রামমোহন রায় ব্রাহ্মণ সেবধি, সম্বাদ কৌমুদী নাম্নী দুটি সংবাদপত্র পরিচালনার কাজে যুক্ত ছিলেন। মূলত খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মচর্চা, হিন্দু ধর্মের বিরোধিতার প্রতিবাদে ব্রাহ্মধর্মতত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে, সমাজ সংস্কারমূলক বার্তা প্রচারের উদ্দেশ্যে রামমোহন রায় এই পত্রিকা দুটি পরিচালনা করেন। ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রামমোহনের যাবতীয় বাংলা পুস্তিকা প্রকাশ পায়, প্রায় ৩০ খানা।

গৌড়ীয় ব্যাকরণ বইটির পরিচয়:

রামমোহন রচিত 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' বাঙালির লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ। গৌড়ীয় ব্যাকরণ চারটি অধ্যায় বিভক্ত। এই বইতে রামমোহন রায় বর্ণ, অক্ষর, উচ্চারণ পদ্ধতি, লিঙ্গ, প্রত্যয়, কারক-বিভক্তি, সমাস, ছন্দ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

উপনিষদ চর্চা:

রামমোহন পাঁচটি উপনিষদের অনুবাদ করেন এবং উপনিষদের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন 'সর্বপ্রকার দুঃখ নিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তির জন্য উপনিষদ অধ্যয়নের প্রয়োজন হয়। আর উপনিষদের সহিত মুক্তির জন্য জনক ভাবসম্বন্ধ উপনিষদের জ্ঞানের দ্বারা সর্ব দুঃখ নিবৃত্তিরূপ যে মুক্তি তাহা হয়।'

উনিশ শতকের প্রাথমিক পর্যায়ে রামমোহন রায় নিজ প্রতিভা বলে বাংলা গদ্যে নিজস্ব স্টাইল তৈরি করেছিলেন। যদিও তাঁর গদ্যে আন্বয়িক জটিলতা বর্তমান, শব্দচয়ন সর্বত্র সাবলীল নয় তবু প্রথম যুগের গদ্য হিসেবে এক স্বকীয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মুখরিত।

১১.৫.৫ রামমোহন রায়ের গদ্যের বৈশিষ্ট্য:

রামমোহনকে আমরা মূল ধর্ম সংস্কারক সমাজ সংস্কারক রূপেই চিনি। রামমোহনের গদ্যে আন্বয়িক জটিলতা, সাবলীলতার অভাব, কঠিন শব্দচয়নের সমালোচনা বহু ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। তবে এ কথা ভুলে গেলে চলবে না রামমোহনের আগে বাংলা গদ্যের কোন সুনির্দিষ্ট কাঠামো ছিল না।

বিরাম চিহ্নহীন, গঠনহীন বাংলা গদ্যকে যতি চিহ্নের সাহায্যে একটি কাঠামোয় বাধার চেষ্টা করেছিলেন রামমোহন। রামমোহন প্রাথমিক পর্যায়ে খ্রিস্টধর্ম, মিশনারিদের ধর্মচর্চা, রক্ষণশীল গোষ্ঠীর ধর্মমত প্রচারের বিরুদ্ধে নিজস্ব মতামত প্রচার করেন। ধর্মমত প্রচারের ক্ষেত্রে বাংলা গদ্যকে যুক্তিতে তর্কে চিন্তায় সজ্জিত করে আধুনিক গদ্যের উপযোগী করে তোলেন। বাংলা গদ্যকে শৈশব অবস্থা থেকে নিজের প্রয়োজনের সাপেক্ষে আধুনিক চলনের উপযোগী করে তোলেন।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন যে রামমোহন রায় বাংলা গদ্যকে নিমজ্জনদশা থেকে উদ্ধার করে শক্ত গ্রানাইট স্তরের উপর প্রতিষ্ঠা করেন।

রামমোহন সাহিত্য সৃষ্টির অভিপ্রায়ে রচনা কার্য্যে যুক্ত হননি। মূলত ব্যবহারিক প্রয়োজনে নব্য দর্শন, ধর্ম, চিন্তন প্রসারের স্বার্থে গদ্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। ফলত রামমোহনের গদ্যে সেভাবে রস সঞ্চারের সম্ভাবনা কম সূচিত হয়েছে। গদ্য গঠনের নানান জটিলতা সত্ত্বেও এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে তিনি তাঁর গদ্যের মাধ্যমে বিতর্কের ভাষা, যৌক্তিক গদ্য ধারার প্রচলন করেছিলেন। রামমোহন রায়ের হাত ধরে বাংলা গদ্য চিন্তন মনন প্রকাশের উপযোগী, ঋজুগতি সম্পন্ন হয়ে ওঠে।

১১.৫.৬ রামমোহন রায়ের গদ্য সম্পর্কে আলোচকদের মতামত:

রামমোহন রায়ের গদ্য সম্পর্কে গোপাল হালদার বলেন 'প্রথমত, 'হইবাক' প্রভৃতি পদ তখনও পরিত্যক্ত

হয়নি। দ্বিতীয়ত দাঁড়ি, কমা, সেমিকলের অভাবে লেখা পাঠে বাধা সৃষ্টি হয়। তৃতীয়ত, তাঁর সুদীর্ঘ জাটিল বাক্যের অন্বয় পরিষ্কার নয়। চতুর্থত যে পণ্ডিতি বিচার পদ্ধতিতে তিনি পাকা, সে পদ্ধতি সংস্কৃতের ঐতিহ্যে গঠিত, বাংলা ভাষার স্বভাব অনুযায়ী রামমোহন তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি।'

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনের গদ্য সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন

'বাংলা গদ্য তাঁর হাতে আয়ুধে পরিণত হয়েছিল। সুললিত সাহিত্যিক গদ্য তাঁর ততটা আয়ত্তে না এলেও গুরুতর তত্ত্বালোচনায় গদ্যকে ব্যবহার করে তিনি বিতর্ক ও বিচারে সংযত ভাষা সৃষ্টি করেছিলেন। এইজন্য তিনি বাংলা গদ্যের ইতিহাসে দিক নির্দেশক স্মারকস্তম্ভ রূপে দীর্ঘকাল বিরাজ করবেন।'

১১.৫.৭ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংক্ষিপ্ত জীবনী:

মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ১৮২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মৃত্যু ঘটে ১৮৯১ সালে। ১৮৪১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাসিক ৫০ টাকা বেতনের বিনিময়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজে শিক্ষক রূপে, পরবর্তীতে ১৮৫১ সালে অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি প্রাচীন সংস্কৃত বইগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং মুদ্রণের দায়িত্ব নেন।

আধুনিক শিক্ষাচর্চা, সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা আধুনিকতার সাক্ষ্য বহন করে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিচরণকালে সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, চেতনায় দ্রুত পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছিল। এই সময় সমাজ-সংস্কারের স্বার্থে, জনশিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে, পাঠ্যপুস্তক নির্মাণ, প্রচারমূলক প্রবন্ধ, অনুবাদ সাহিত্য রচনার কাজে নিযুক্ত হন বিদ্যাসাগর।

১১.৫.৮ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমকাল:

ইংরেজ রাজকর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও বাংলা গদ্যনির্মাণের সূত্রপাত ঘটে। এই বাংলা খুব রসময় না হলেও প্রাথমিক ভাব প্রকাশের উপযোগী ছিল। রামমোহন রায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, চণ্ডীচরণ মুন্সী, রামরাম বসু, উইলিয়াম কেরী প্রমুখের হাত ধরে বাংলা গদ্যচর্চার সূত্রপাত ঘটলেও এই পর্বটি ছিল টানা জটিলতায় আবর্তিত, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্ব। পরবর্তীতে অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের হাত ধরে এমন এক গদ্যের জন্ম হয় যা সাহিত্য সৃষ্টির উপযোগী রূপে প্রকাশ পায়। রামমোহন বাংলা গদ্যের যে ভিত্তি স্থাপনা করেছিলেন বিদ্যাসাগর তাতে প্রাণ ও সৌন্দর্য সঞ্চার করে বাংলা গদ্যকে সাহিত্য রচনার উপযোগী করে তোলেন।

১১.৫.৯ বাংলা ভাষাচর্চায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভূমিকা:

বিদ্যাসাগরকে একদিকে যেমন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, বিভিন্ন অনুবাদ গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে চিনি, তেমনি মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবশ্যই উল্লেখ্য। বাংলা ভাষা গঠনে বিদ্যাসাগরের অবদান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন

'তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখনো সাহিত্য সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননী রূপে মানব সভ্যতার ধাত্রীগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয় - যদি এই ভাষা পৃথিবীর সুখ দুঃখের মধ্যে এক নতুন সান্ত্বনা স্থল সংসারের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে এক মহত্ত্বের আদর্শলোক দৈনন্দিন মানব জীবনের অবসাদ ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে সৌন্দর্য্যের এক নিভৃত নিকুঞ্জ বন রচনা করিতে পারে তবেই তাঁহার কীর্তি তাঁহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে।' সাহিত্যিক গদ্যের প্রথম শিল্পী হিসেবে বিদ্যাসাগরের অবদান আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য।

১১.৫.১০ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক কর্ম:

বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভারকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায় অনুবাদমূলক রচনা এবং মৌলিক রচনা।

অনুবাদকর্ম:

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরেজি এই তিন ভাষা থেকেই অনুবাদ করেন।

সংস্কৃত থেকে অনুবাদ:

১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগর ভাগবতের কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে 'বাসুদেবচরিত' রচনা করেন। 'বাসুদেবচরিত' ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পাঠ্যপুস্তক রূপে পড়ানো হত। এই বইটির ভাষা জানবার কোন উপায় নেই, কারণ বর্তমানে এই বইটি পাওয়া যায় না।

কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' অবলম্বনে 'শকুন্তলা', ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' ও বাল্মিকী 'রামায়ণ'-এর উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে 'সীতার বনবাস' (১৮৬০) রচনা করেন।

হিন্দি বইয়ের অনুবাদ:

১৮৪৭ সালেই হিন্দি 'বেতাল পচচীসী' অবলম্বনে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' রচনা করেন বিদ্যাসাগর।

ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ:

শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত 'কমেডি অফ এররস' অবলম্বনে দেশীয় পটভূমিতে 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯) রচনা করেন।

- এছাড়াও মার্শম্যানের 'History of Bengal' এর অনুবাদ 'বাঙ্গলার ইতিহাস' (১৮৪৮)
- চেম্বার্স এর 'Biographies' অবলম্বনে 'জীবনচরিত' (১৮৪৯)
- 'Rudiment of Knowledge' অবলম্বনে 'বোধোদয়' (১৮৫১)
- ঈশপের 'ফেবেলস'-এর অনুবাদ 'কথামালা' (১৮৫৬) রচনা করেন বিদ্যাসাগর।

সমকালে অনুবাদ সাহিত্য রচনা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল, তার প্রমাণ বিদ্যাসাগরের রচনাতে লক্ষণীয়। তবে বিদ্যাসাগর কেবল অনুবাদসাহিত্য রচনাই করেননি তার পাশাপাশি বেশ কিছু মৌলিক গ্রন্থের নজির দেখতে পাওয়া যায়।

মৌলিক গ্রন্থ:

'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' বাঙালি রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস। 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (প্রথম ও দ্বিতীয়), 'প্রভাবতী সম্ভাষণ', 'ব্রজবিলাস' উল্লেখযোগ্য মৌলিক রচনা।

'প্রভাবতী সম্ভাষণ' বাংলা সাহিত্যের প্রথম শোকগ্রন্থ। বিদ্যাসাগর মহাশয় বন্ধু রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের কন্যা প্রভাবতীর স্মরণে এই গ্রন্থ রচনা করেন।

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা বহুল আলোচিত। সমাজ সংস্কারমূলক আলোচনাগুলি একদিকে যেমন সমাজের জনমত প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তেমনি এ রচনাগুলি প্রারম্ভিক পর্বের বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম উদাহরণ হিসেবে প্রতিভাত হয়। এই গদ্যগুলিতে লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে যৌক্তিক গদ্য নির্মাণের দৃষ্টান্ত তুলে দজরেছিলেন বিদ্যাসাগর। সমাজ সংস্কারমূলক আলোচনার জন্য বিদ্যাসাগরকে বহুক্ষেত্রে সমালোচনা, কুৎসার সম্মুখীন হতে হয়। এই সময় বিদ্যাসাগর 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোষ্য' ছদ্মনামে এই কুৎসাগুলির প্রতিবাদ করতে শুরু করেন। সমাজ-সংস্কারমূলক উল্লেখযোগ্য পুস্তিকাগুলি 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল', 'ব্রজবিলাস' ইত্যাদি। নবদ্বীপের ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের বিধবা বিবাহ বিরোধী বক্তৃতার উত্তরে 'ব্রজবিলাস' রচনা করেন বিদ্যাসাগর।

সমাজ-সংস্কারমূলক গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য:

বিদ্যাসাগরের সংস্কারমূলক লেখাগুলি যুক্তিবাদী গদ্য সাহিত্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। রচনাগুলিতে লেখকের অভ্রান্ত যুক্তি, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের প্রতিভা, সক্ষমতা প্রকাশ পায়। সমাজের সমস্যা সম্পর্কিত লেখাগুলিতে রক্ষণশীল, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ সম্পর্কে এক ধরনের ব্যঙ্গ, উইটের উপস্থিতি চোখে পড়ে। ব্যঙ্গের কষাঘাতে সামাজিক সংস্কারের মূলে আঘাত করেছেন বিদ্যাসাগর। সাহিত্যক্ষেত্রে এই ব্যঙ্গের ব্যবহার পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রহসন, নকশার হাত ধরে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

১১.৫.১১ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্যের উদাহরণ:

বিদ্যাসাগরের রচনার উদাহরণের সাহায্যে আমরা বিদ্যাসাগরীয় গদ্যের ধরন, বৈশিষ্ট্য, ভাষাশৈলীগুলি বোঝার চেষ্টা করব।

অনুবাদকর্ম:

বিদ্যাসাগর রচিত অনুবাদ কর্মগুলির মধ্যে অন্যতম 'কমেডি অফ এররস' অবলম্বনে রচিত 'ভ্রান্তিবিলাস'।

এই রচনায় বিদ্যাসাগর অনুবাদ সাহিত্যকে এক অনন্য মাত্রা প্রদান করেছিলেন। এই অনুবাদ আক্ষরিক অনুবাদ নয়, দেশিয় প্রেক্ষাপটে, দেশিয় চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থটি রচনা করেন বিদ্যাসাগর।

যেমন-

'আপনারে লইয়া না গেলে আমার লাঞ্ছনার এক শেষ হইবেক। অতএব বিনয় করিয়া বলিতেছি, সত্তর গৃহে চলুন। তিনি ও তাহার ভগিনী নিতান্ত আকুল চিত্তে আপনকার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

এই সকল কথা শুনিয়া, কোপে কম্পান্বিত কলেবর হইয়া, চিরঞ্জিত কোহিলেন, অরে দূরাত্মন! তোমার কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।'

গদ্যবৈশিষ্ট্য:

এই রচনায় খানিক সহজ শব্দ প্রয়োগ, সহজ বাক্য গঠনের প্রবণতা লক্ষণীয়। যতিচিহ্নের ব্যবহার আধুনিক বাক্যগঠন পদ্ধতির অনুরূপ।

সমাজ-সংস্কারমূলক রচনা:

বিদ্যাসাগরের গদ্যের অন্যতম সাক্ষ্য বহন করছে সমাজ-সংস্কারমূলক রচনাগুলি, এগুলি মৌলিক রচনার উদাহরণ। এই রচনাগুলির মাধ্যমে যুক্তিবাদী, প্রচারমূলক গদ্যশৈলী নির্মাণ করেন বিদ্যাসাগর। প্রচারমূলক গদ্য রচনার ক্ষেত্রে সহজ বাক্যগঠনের পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন বিদ্যাসাগর, কারণ প্রচারের ক্ষেত্রে সকল স্তরের মানুষের কাছে বক্তব্য উপস্থাপনের দায় থাকে।

যেমন-

'হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ। আর কতকাল তোমরা মোহনিদ্রায় অনিভূত হইয়া প্রমাদ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে। একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পূণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণ হত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে।'

'কলি যুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্র বিহিত কর্তব্যকর্ম স্থির হইল। এক্ষণে এই বিবেচনা করা আবশ্যক অথবা পুনর্বার বিবাহিত হইলে তৎগর্ভজাত পুত্রের পৌণর্ভব সংজ্ঞা হইবে কিনা ...পরাশর কলিযুগে ঔরস দত্তক ত্রিবিধ পুত্রের বিধি দিতেছেন। কিন্তু যখন বিধবা বিবাহের বিধি দিয়াছেন তখন বিবাহিতা বিধবার গর্ভজাত পুত্রকে পুত্রবলিয়া পরিগ্রহ করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে।'

গদ্যবৈশিষ্ট্য:

রামমোহন রায়দের হাত ধরে বাংলা গদ্যচর্চার সূত্রপাত হয়, তবে এই সময় বাংলা গদ্যের কোন নিদর্শন ছিল না। ফলে বাক্যগঠন পদ্ধতি ছিল জটিলতা পূর্ণ, যতিচিহ্নের ব্যবহারের দুর্বলতাও বাক্যে আন্বয়িক জটিলতার অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা গদ্যের গঠনকে সুবিন্যস্ত করেন, যতিচিহ্ন ব্যবহারও সুসংহত হয়।

পাঠ্যপুস্তক:

অনুবাদমূলক গ্রন্থ এবং মৌলিক রচনার পাশাপাশি শিক্ষার বিস্তারে শিশু শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তক নির্মাণ বিদ্যাসাগরের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, সংস্কৃত ব্যাকরণ উপক্রমণিকা বইগুলি

শিশু শিক্ষার ভিত্তি স্থাপনে শিশু মনস্তত্ত্ব নির্মাণে, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। শিশুপাঠ্য থেকে আধুনিক সাহিত্য সৃজনের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের দুর্বোধ্যতা দূর করে সরল সুষম একপ্রকার বাক্যভঙ্গি তৈরি চেষ্টা করেন।

১১.৫.১২ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্যচর্চায় বিবর্তন:

বিদ্যাসাগরের গদ্য সব ক্ষেত্রে জটিলতা বর্জিত নয়। সাধু ভাষার প্রয়োগ, সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার আজকের পাঠকের চোখে খানিক জটিল মনে হলেও সমকালের বিচারে তিনি এক আধুনিক গদ্যশৈলীর নির্মাণের চেষ্টা করেছিলেন। বিভিন্ন সাহিত্য অনুযায়ী বিদ্যাসাগরের ভাষা ব্যবহারের পার্থক্য চোখে পড়ে।

যেমন- 'সীতার বনবাস'-এ ভাষার যে সাড়ম্বর চোখে পড়ে 'শকুন্তলা' বা 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর ক্ষেত্রে তা অনেক সহজ, সরল। সমালোচকদের মতে 'শকুন্তলা'য় সাধুভাষার ক্রিয়াপদ ব্যবহার করলেও কথোপকথনের ভাষা অনেক বেশি আধুনিক, চলিত গদ্যেরীতির কাছাকাছি। সমাজ সংস্কারমূলক রচনাগুলিতে সহজ ভাষায় যৌক্তিক গদ্য প্রকাশের প্রবণতা চোখে পড়ে। অনেকের মতে বিদ্যাসাগরের রচনায় বাংলা সাধু ভাষার আদি রূপ থেকে আধুনিক গদ্যশৈলীর হদিশ মেলে। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের একজন সচেতন শিল্পী তাঁর রচনায় যেমন সাধু গদ্যের কাঠামো নির্মাণের প্রবণতা লক্ষণীয় তেমনি চলিত রীতির কিছু সম্ভাবনাও সূচিত হয়েছিল।

১১.৫.১৩ পূর্বসূরীদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির পার্থক্য:

উনিশ শতকের প্রথম পর্বে রামমোহন রায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখের হাত ধরে বাংলা গদ্যের পথচলা শুরু হয়। এই গদ্যশৈলী অনেক ক্ষেত্রেই ছিল জটিল, গম্ভীর, যতিচিহ্নবিহীন। বিদ্যাসাগরের হাত ধরে বাংলা বাক্য গঠন রীতিতে পরিবর্তন সংঘটিত হয় এবং আন্বয়িক জটিলতা অনেকাংশেই লাঘব হয়।

বিদ্যাসাগরের গদ্যের নিজস্বতা:

বিদ্যাসাগরের পরিভাষা বদল, সংস্কৃতানুগ বাংলা শব্দ ব্যবহার একাংশে যেমন গৃহীত হয় তেমনি সমালোচিত হয়। তবে এ কথা বললেও অত্যুক্তি হয় না যে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষাকে সুবিন্যস্ত, সুষ্ঠ, সুসংহত করে একটি সহজ গতি প্রদান করেন।

বাংলা বাক্যের গঠনে নিজস্ব শৈলী:

বাংলা বাক্য গঠনের একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা বিন্যাস তৈরি করেন বিদ্যাসাগর। ভাষার ক্ষেত্রে কর্তা, কর্ম, ক্রিয়ার অবস্থানের একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকে। বাংলা বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর একটি নিয়ম প্রয়োগ করেন, যা বাংলা ভাষাকে সুন্দর, সাবলীল এবং গতি সম্পন্ন করে তোলে।

যতিচহ্নের ব্যবহার:

উপযুক্ত যতিচিহ্নের অভাবে পূর্ববর্তীস্তরের বাংলা ভাষায় একপ্রকার আন্বয়িক বা গঠনগত জটিলতা ছিল। যেমন রামমোহন রায়ের রচনাতে দেখেছি দু-তিনটে বাক্যের পর একসঙ্গে পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করা হত। ফলে একাধিক বাক্যের কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া মিলিয়ে স্বাভাবিকভাবে এক জটিলতা তৈরি হত। বিদ্যাসাগর মহাশয়

উপযুক্ত জায়গায় যতিচিহ্ন ব্যবহার করে বাংলা গদ্য পাঠকে সহজ করে তোলেন পাঠকের জন্য। উপযুক্ত জায়গায় ছেদ পড়ায় বাংলা গদ্যভাষার ক্ষেত্রেও একটি ছন্দ তৈরি হয়।

১১.৫.১৪ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনারীতি:

বিদ্যাসাগর মহাশয় মূলত সাধু ভাষার কাঠামোয় বাংলা গদ্য রচনা করলেও সেই ভাষা এক শ্রুতিমাধুর্য তৈরি করে। শ্রুতিমাধুর্য্যের কথা অপুর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সীতার বনবাস' পড়ে অপুর মুগ্ধতার কথা আমাদের অবশ্যই স্মরণে রয়েছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্যের গঠনশ্রী, মৌলিকতা প্রকাশ পায় তাঁর গদ্যে

এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরিশিখর দেশ আকাশ পথে সতত সঞ্চারমাণ জলধর মণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড়, নীলিমায় অলঙ্কৃত। আধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বন-পদপাদসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্ন সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে।' বিদ্যাসাগরের গদ্যধারা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন 'বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষায় প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন।ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধার মাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারণ কতগুলা বক্তব্য বিষয়ে পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া সুন্দর করিয়া এবং সুশৃংখল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে।'

১১.৫.১৫ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্যশৈলীর বহুমাত্রিকতা:

সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজি গদ্যের প্রাঞ্জলতা, প্রসাদ গুণ বিদ্যাসাগরকে মুগ্ধ করেছিল। সংস্কৃত এবং ইংরেজি এই দুই ধারার সম্মিলনে বিদ্যাসাগর আধুনিক বাংলা গদ্যের স্টাইল নির্মাণের চেষ্টা করেন। বাংলা গদ্যসাহিত্য নির্মাণে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে স্বীকার করতেই হয় যে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে সুর, তাল, লয়, যতি সংযোজনের মাধ্যমে সাহিত্যে এক প্রবাহমানতা এনেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের গদ্য আজকের দিনে দাঁড়িয়ে খানিক কঠিন মনে হয় কারণ গদ্যে সমাসবদ্ধ পদ, সংস্কৃত শব্দের ভাবগাম্ভীর্য বর্তমান। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই বহুক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগরের শব্দ প্রয়োগ, তৎসম শব্দের গাম্ভীর্য, সংস্কৃত ভাষার প্রসাদ গুণ এক সুরঝংকার তৈরি করেছিল। যেমন কিছু ক্ষেত্রে সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করেছেন, আবার অনেক ক্ষেত্রেই সহজ সরল রূপে বাংলা গদ্যকে উপস্থাপিত করেছেন পাঠকের দরবারে। গদ্যকে যুক্তি-তর্কের ভার বহনের পক্ষে সক্ষম করে তোলেন।

যতিচিহ্নের ব্যবহার দ্বারা বাংলা বাক্য গঠনকে যেমন সুসংহত করেছেন তেমনি অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা জটিল বাক্যবন্ধনের প্রবণতা বিদ্যাসাগরীয় গদ্যের রীতি। আবেগমূলক গদ্য রচনা থেকে লঘু চালের সংলাপ রচনা, শাস্ত্রকে উপলক্ষ করে যুক্তিবাদী গদ্য রচনা বিদ্যাসাগরের গদ্য বহুমাত্রিক প্রকাশের সাক্ষী। রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয় প্রমুখের হাত ধরে ভাষার যে ভিত্তি স্থাপিত হয় তাকে বিবিধ ভাব প্রকাশের উপযোগী বাহন হিসেবে গড়ে তোলেন বিদ্যাসাগর।

সুকুমার সেন বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে বলেন 'বিদ্যাসাগরের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তিনি প্রচলিত ফোর্ট উইলিয়াম পাঠ্যপুস্তকের বিভাষা, রামমোহন রায়ের পণ্ডিতি ভাষা এবং সমসাময়িক সংবাদপত্রের অপভাষা কোনটিকেই একান্তভাবে অবলম্বন না করিয়া তাহা হইতে যথাযথ গ্রহণ-বর্জন করিয়া সাহিত্যের ও সংসারকার্য্যের সবরকম প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ্য হইল।'

বাংলা ভাষাকে কেবল মাত্র ব্যবহারযোগ্য করে তোলেই তিনি বিরত হননি। বাংলা ভাষাকে সুন্দর, শোভন করে তোলার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। বাংলা ভাষা গঠনে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন

'বিদ্যাসাগরের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তিনি প্রচলিত ফোর্ট উইলিয়াম পাঠ্যপুস্তকের বিভাষা, রামমোহন রায়ের পণ্ডিতি ভাষা এবং সমসাময়িক সংবাদপত্রের অপভাষা কোনটিকেই একান্তভাবে অবলম্বন না করিয়া তাহা হইতে যথাযথ গ্রহণ-বর্জন করিয়া সাহিত্যের ও সংসারকার্য্যের সবরকম প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ্য হইল।'

বিদ্যাসাগরের অনুবাদ প্রাথমিক পর্বের জটিলতাকে পেরিয়ে স্বাধীন ভাষান্তরের উদাহরণ। যা সমকালের পাঠককে অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে যেমন পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। তেমনি বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা বাংলা ভাষাকে সহজ, সরল আকারে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছিল। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়দের গদ্যধারা, স্টাইল, ভাষারীতি আলোচনার সাপেক্ষে আমরা বাংলা ভাষার প্রাথমিক পর্বের ভাষারীতি এবং বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে জানতে পারি।

১১.৬ নক্‌শাজাতীয় গদ্য এবং উনিশ শতকের নক্‌শাকার

উনিশ শতকের নয়া শিক্ষা, চিন্তা-চেতনার হাত ধরে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে এক পালাবদল সংগঠিত হয়। শিক্ষা প্রসারে সূত্রে বাঙালির জনজীবনে, চিন্তনে-মননে এক নবচেতনার উন্মেষ ঘটে। সামাজিক রাজনৈতিক পালাবদলের ধারাতেই সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও নানান পরিবর্তন ঘটে। এই সময় সমাজ সংস্কারমূলক ভাবনা প্রবর্তনে বিভিন্ন মতাদর্শ মতবাদ প্রচারে, প্রসারে বাংলা সাহিত্যকে হাতিয়ার করেছিলেন তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালি সমাজ। এই সময় বেশ কতকগুলি সাহিত্য আঙ্গিক বা প্রকরণের উদ্ভব ঘটে। যেমন উনিশ শতকে বাংলা গদ্যচর্চা বিকাশ লাভ করে। এই সূত্রে গদ্যনির্ভর বিভিন্ন প্রকরণের আবির্ভাব সম্পন্ন হয়। এগুলির মধ্যে অন্যতম নক্‌শা জাতীয় সাহিত্য।

১১.৬.১ নক্‌শা কাকে বলে?

নক্‌শা বলতে আমরা যেসব রচনাকে নির্দেশ করছি, উনিশ শতকের পূর্বে সেগুলির কোন অস্তিত্ব ছিল না। সাহিত্যের বিচিত্র রসাস্বাদমূলক প্রকরণ নক্‌শা। নক্‌শা বলতে বোঝায় পাঠককে সচেতন করার লক্ষ্য নিয়ে গদ্যে রচিত লঘু রসাত্মক বা রঙ্গ-বঙ্গমূলক রচনা। বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির পূর্বে সমকালের পাঠককে সচেতন করার লক্ষ্য নিয়ে বাংলা গদ্যকে হাতিয়ার করে রঙ্গ ব্যঙ্গের আধারে সমাজ জীবনের সমস্যার রূপ তুলে ধরেন একদল সাহিত্যিক। এই রচনাকে নক্‌শা সাহিত্য বলা হয়।

১১.৬.২ নক্‌শাজাতীয় গদ্য সৃষ্টির পূর্ববর্তী সাহিত্য ধারা:

বাংলা গদ্যচর্চার প্রাথমিক পর্বে সূত্রপাত ঘটে ষোড়শ শতাব্দীতে। ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ, বৈষ্ণব কারিকার সূত্রে বাংলা গদ্যচর্চার সূত্রপাত ঘটে। এই গদ্য সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী ছিল না।। পরবর্তীতে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে, রাজ কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলা গদ্য রচনার প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা সূত্রে বাংলা গদ্যগ্রন্থ অনুবাদ ও রচনার কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়-দের হাত ধরে বাংলায় বেদবেদান্ত চর্চা, উপনিষদ চর্চা, শাস্ত্রকে হাতিয়ার করে সংস্কার মূলক গদ্যচর্চা, অনুবাদ সাহিত্যচর্চার বিকাশ ঘটে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হাত ধরে বাংলা গদ্যচর্চার যে পথ চলা শুরু হয়েছিল তা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ-দের হাত ধরে বিকাশ লাভ করে।

উনিশ শতকে বহুমাত্রিক গদ্য আঙ্গিক এবং গদ্যশৈলীর বিকাশ ঘটে। এই পর্বের বিশেষ আলোচিত, অন্যতম একটি সাহিত্য মাধ্যম নক্‌শাজাতীয় সাহিত্য।

১১.৬.৩ সমকালীন পরিস্থিতি:

পলাশীর প্রান্তরে নবাবী আমলের পতনের পর ইংরেজ শাসকের নেতৃত্বে নয়া শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই সময় নতুন শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। যারা তৎকালের বাঙালি বাবু। এদের সেরকম শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল না। নতুন জমিদারি এবং ব্যবসার দৌলতে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হয়ে ওঠেন বাঙালি বাবুরা। এই সময় এই হঠাৎ বাবুদের দৌলতে কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে এক নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমদানি ঘটে। নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পাশাপাশি নতুন সংস্কৃতি চর্চার আমদানি ঘটে। শহরে এক শ্রেণির মোসাহেব, মধ্যসত্ত্বভোগীদের আবির্ভাব ঘটে। বাবুদের বড় অংশ ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল, ভ্রষ্ট, রক্ষণশীল পুরাতন ধ্যান-ধারণা বিশ্বাসী। অনেকেই পাশ্চাত্যের ভাবনা দর্শনকে অনুকরণ করেছেন স্বেচ্ছাচারিতার কারণে। বেশ্যালয়ে গমন ভ্রষ্টাচার মদ্যপানের মতো সামাজিক সমস্যাগুলির প্রাদুর্ভাব ঘটে এই পর্বে। উপরন্তু এই কাজগুলিকে নৈতিক কাজ স্বরূপ, অধিকার রূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন এই বাবু এবং তার মোসাহেবের দল।

এই সময় সমাজ-সংস্কারকগণ, চিন্তানায়কগণ এক নতুন উন্নত সমাজ গঠনের যজ্ঞে সামিল হয়েছিলেন। একদিকে হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি যেমন বাবু শ্রেণির জন্ম দিয়েছিল তেমনি আধুনিক শিক্ষার হাত ধরে শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবী শ্রেণির জন্ম হয়। তারা জাতীয় জীবনের মানোন্নয়ন, আধুনিক সমাজ গঠনের প্রয়োজনে সমাজ সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনে, প্রচলিত কথাবদ্ধতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন করার স্বার্থে, আধুনিক সমাজ সংস্কৃতি নির্মাণে সাহিত্যকে বারবার হাতিয়ার করেছিলেন উনিশ শতকের শিক্ষিত সমাজ।

১১.৬.৪ নক্‌শা জাতীয় রচনায় আলোচিত বিষয়:

হিত সাধনের চেষ্টা

আদর্শ সমাজ গঠন

নীতি নৈতিকতার শিক্ষা

নক্‌শা জাতীয় রচনার অন্যতম দুই উদ্দেশ্য সমাজের অসুস্থতা, অনৈতিকতার প্রতি কষাঘাত এবং সুস্থ সমাজ গঠনের প্রয়াস।

নক্‌শা জাতীয় রচনার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সমাজ, দেশ তথা জাতীয় জীবনের হিত সাধনের ইচ্ছা। বলা যায় হিত সাধনের আকাঙ্ক্ষা থেকেই শিক্ষামূলক সাহিত্যচর্চার আবির্ভাব ঘটে। সমস্ত সাহিত্য প্রকরণের ওপরই সমকালীন সামাজিক-আর্থিক-সাংস্কৃতিক ঘটনাবলির প্রভাব থাকে। বিভিন্ন সাহিত্য আঙ্গিকে সমাজ-কল্যাণ, সমাজ-সংস্কারের অবদান থাকলেও আর অন্যতম লক্ষ্য রসসঞ্চার। অন্যদিকে নক্‌শা জাতীয় সাহিত্যে রসসঞ্চার ঘটলেও তার মূল উদ্দেশ্য সামাজিক শিক্ষা প্রদান, সমাজের কল্যাণ সাধন। নক্‌শার রচয়িতা সমাজের ভুল ত্রুটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। নক্‌শাইয় প্রয়োজন সাপেক্ষে লেখক ব্যঙ্গ শ্লেষ, উইট, স্যাটায়ারের আশ্রয় নিয়েছেন। ব্যঙ্গের কষাঘাতে সমাজকে আন্দোলিত করার প্রবণতা নক্‌শা জাতীয় সাহিত্যের অন্যতম বিষয়বস্তু।

১১.৬.৫ বাংলা নক্‌শাজাতীয় সাহিত্যের দৃষ্টান্ত:

বাংলায় প্রথম নক্‌শা সাহিত্যের উদাহরণ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস' (১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ)। এছাড়াও ভবানীচরণের 'নববিবি বিলাস' (১৮২৫), 'কলিকাতা কমলালয়', প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' (১৮৬২, ১৮৬৪), ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'আপনার মুখ আপনি দেখ' (১৮৬৩), ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'সমাজ কুচিত্র', চুনিলাল মিত্রের 'কলকাতার নুকোচুরি' (১৮৬৯) ইত্যাদি।

নক্‌শা জাতীয় রচনার সাহিত্যধারা, গদ্যশৈলী প্রসঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা প্যারীচাঁদ মিত্র এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যধারা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের নক্‌শা জাতীয় রচনা আলোচনার প্রেক্ষিতে উনিশ শতকের নক্‌শা জাতীয় গদ্যের ধারাটি বোঝার চেষ্টা করব।

১১.৬.৬ প্রথম নক্‌শা ও নক্‌শাকার:

মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে বাংলা নক্‌শা জাতীয় গদ্যের প্রবর্তক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্যশৈলী সম্পর্কে সংক্ষেপে জানবার চেষ্টা করব। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজি ও ফারসি ভাষায় দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষিত হওয়ায় ভারতীয় দর্শন, শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বকথা অনুভব করতে পেরেছিলেন। উপরন্তু বাংলা ভাষার ওপর স্বাভাবিক দখলের কারণে রচনার পথ সুগম হয়।

তিনি সংবাদ কৌমুদী(১৮২১), সমাচার চন্দ্রিকা (১৮২২), এর মতো পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ভবানীচরণের সমকালে সমাজ-সংস্কৃতি-জীবনচর্চার ধারা খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি সমাজের অনৈতিকতার বিরুদ্ধে

আন্দোলনে সামিল হন। তবে মনে রাখতে হবে এইসময় শিক্ষিত বাঙালি তার আদর্শ-দর্শনকে দু ভাবে প্রয়োগ করেছিলেন; রক্ষণশীল পন্থা ও প্রগতিশীল পন্থা। রামমোহন বিদ্যাসাগর-রা যেমন প্রগতির পক্ষে সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রকে হাতিয়ার করেছিলেন তেমনি ভবানীচরণরা বিবিধ আধুনিক চলনের বিরুদ্ধে ভারতীয় সনাতন আদর্শ ও সনাতন ধর্ম-সংস্কৃতিকে মাধ্যম করে সমাজ জীবনে শৃঙ্খলা আনতে চেয়েছিলেন। নক্‌শা জাতীয় রচনায় বাবুসমাজের দুর্দশা, নীতিহীনতা, রুচিহীনতা, কোলাহলময় জীবনের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গের বাণ হেনেছেন।

নববাবুর বিষাদময় জীবনচিত্র অঙ্কন করে সমকালের উশৃংখল কোলাহলময় জীবনাচরণে অভ্যস্ত বাবুদের ও পাঠকদের সচেতন করার প্রচেষ্টা করেছেন লেখক। নববিবিবিলাসেও নববাবুর চরিত্র দোষে নববিবির উদ্ভব, সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়ে বেশ্যাবৃত্তি, দাসীবৃত্তি করতে বাধ্য হওয়া নববিবির দুর্দশার ছবি তুলে ধরেছেন লেখক। ‘কলিকাতা কমলালয়’ সমকালীন কলকাতার ঐতিহাসিক দলিল। গল্পকথনের ভঙ্গিতে এক গ্রামীণ ব্যক্তিকে শহর সম্পর্কে বলার মাধ্যমে কলিকাতা শহরের রীতিনীতির পরিচয় তুলে ধরেছেন ভবানীচরণ। এই গদ্যের নমুনা

‘এই কলিকাতা মহানগরের স্থূল বৃত্তান্ত বিবরণ করিয়া কলিকাতা কমলালয় নামক গ্রন্থকরণে প্রবর্ত হইলাম। এতদ্‌ গ্রন্থ পাঠে বা শ্রবণে অনায়াসে এখানকার ব্যবহার ও রীতি ও বাক্‌চাতুরী ইত্যাদি আশু জ্ঞাত হইতে পারিবেন।’

‘যাঁহারা সুবোধ অথচ রসিক বাবু, তাঁহারা কাহারো কাবু না হইয়া নববাবু ও নববিবি উভয়েরি নষ্ট চরিত্র দেখিয়া আপন২ চরিত্র পবিত্র করিতে পারিবেন যেহেতুক বিচক্ষণ লোক অন্যের দোষ বিলক্ষণ রূপে সমীক্ষণপূর্বক আপন দোষ পরিহার করিয়া সাবধান হয়েন।’

গদ্যবৈশিষ্ট্য:

ভবানীচরণের গদ্য মূলত সাধুরীতির গদ্য হলেও সহজ বাক্য গঠনের প্রবণতা লক্ষণীয়। এই জাতীয় গদ্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজ গঠন সম্পর্কে সাধারণকে সচেতন করা। লেখক এখানে বাক্য গঠনে অহেতুক জটিলতা সৃষ্টি করেননি। সাধারণ গ্রহণযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যেই সহজ বাক্যগঠন রীতি অনুসৃত হয়েছে।

১১.৬.৭ প্যারীচাঁদ মিত্র:

উনিশ শতকের গদ্যচর্চার ধারার অন্যতম এক উল্লেখযোগ্য নাম প্যারীচাঁদ মিত্র। জন্ম ১৮১৪ সালে, মৃত্যু ১৮৮৩। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্যই মানুষটি নীতি আদর্শে পুষ্ট, শৃঙ্খলাপরায়ণ একটি আধুনিক সমাজ গঠনের সংকল্প করেছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের বেশিরভাগ রচনাই তত্ত্বধর্মী, নীতিকথামূলক। সমাজ সংগঠন মূল উদ্দেশ্য হলেও সমাজ-সংস্কৃতি নির্মাণে সাহিত্যকেই মাধ্যম করেছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। বিষয়গত, প্রকরণগত ভিন্নতার জায়গা থেকে প্যারীচাঁদের রচনাগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

লঘু রস বা ব্যঙ্গ জাতীয় নক্‌শাধর্মী সাহিত্য

'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯)

নীতি আদর্শ প্রচারমূলক আখ্যান--

স্ত্রীলোকদের আদর্শবাদী রূপে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রচারিত তত্ত্বকথামূলক আলোচনা 'রামা রঞ্জিকা' (১৮৬০), 'বামাতোষিনী' (১৮৮১)

ঈশ্বর বিষয়ক তত্ত্বকথা 'যৎ কিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), 'অভেদী' (১৮৭১), 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০)

প্রবন্ধ জাতীয় রচনা 'কৃষিপাঠ' (১৮৬১), 'ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত' (১৮৭৮), 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক দিগের পূর্বাবস্থা' (১৮৭৯)

কাব্যজাতীয় রচনা 'গীতাঙ্কুর' (১৮৬১)

১১.৬.৮ 'আলালের ঘরের দুলাল': বিষয় সংক্ষেপ

বাবা-মায়ের অতিরিক্ত আদর ও বদসঙ্গে মতিলালের জীবন কীভাবে বিপর্যস্ত হল তাই আকর্ষণীয় রূপে কাহিনি আকারে তুলে ধরেছেন লেখক। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য একে উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন একাংশের গবেষক। অন্যদিকে আরেকদল এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা ও করেছেন। বইটিতে সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট নক্‌শা আকারে গ্রন্থিত হয়েছে।

বাবুরাম বাবু একমাত্র সন্তান মতিলালের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, ফারসি ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু শিক্ষকের অযোগ্যতা, পরিবার অভিভাবকদের অজ্ঞতা, বদসঙ্গে মতিলাল অমানুষ হয়ে ওঠে। মতিলালের জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে ভোগ বিলাস এবং উশৃঙ্খলতা। পিতৃবিয়োগের পরে উশৃংখলতা পূর্ণতা পায়, সমস্ত হারিয়ে নিঃস্ব হন মতিলাল। এক্ষেত্রে ঠক চাচা ও বাঞ্ছারামদের মতো মোসাহেবদের চরিত্র অঙ্কনের মধ্যে দিয়ে সমকালের বাবুসংস্কৃতির বহুমাত্রিক দিকগুলি তুলে ধরেছেন লেখক। পরিশেষে মতিলাল নিজ জীবনে অশিক্ষা কুসঙ্গের জন্য বিবেক দংশন করে কাশীতে এক সন্ন্যাসীর আশ্রয়ে শিক্ষা লাভ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। কাহিনি শেষ হয় পরিবারের সঙ্গে মিলনের মধ্যে দিয়ে।

এইসময় যে বাবুসংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তা এক অমার্জিত, অশিষ্টাচার, অপসংস্কৃতির আমদানি করেছিল। এই পরিস্থিতিতে প্যারীচাঁদ আধুনিক নাগরিক নির্মাণের স্বার্থে শিশুর প্রকৃত শিক্ষা প্রচারের কথা ভেবেছিলেন। কাহিনিতে দেখিয়েছেন সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা ও উপযুক্ত পারিবারিক প্রতিবেশ। নতুন বড়লোক শ্রেণি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও অভিজ্ঞতার অভাবে উপযুক্ত সুস্থ শিক্ষার প্রতিবেশ গড়ে তুলতে পারেননি। মতিলালের জীবনের বিপর্যয় বর্ণনার মাধ্যমে সমকালে তরুণ সমাজকে সাবধান হওয়ার বার্তা দিয়েছেন লেখক।

গদ্যচর্চা:

কাহিনিতে নীতি-উপদেশের ছলে বেশ কিছু কথা প্রকাশ পেয়েছে। এই উদাহরণগুলি আলোচনার মাধ্যমে আমরা প্যারীচাঁদ মিত্রের গদ্য রচনা স্টাইল বা ভঙ্গিটি পর্যালোচনার চেষ্টা করব। যেমন

'ছেলেকে সৎ করিতে হইলে আগে বাপের সৎ হওয়া উচিত।'

'শিশু দিগের প্রতি এমন নিয়ম করিতে হইবেক যে তাহারা খেলাও করিবে- পড়াশুনাও করিবে। ক্রমাগত খেলা করা অথবা ক্রমাগত পড়াশুনা করা ভালো নহে।'

'লেখাপড়া শিখিবার তাৎপর্য এই যে, সৎ স্বভাব ও সৎ চরিত্র হইবে - সুবিবেচনা জন্মিবে ও যে ২ বিষয় কর্মে লাগিতে পারে, তাহা ভালো করিয়া শেখা হইবে। এই অভিপ্রায় অনুসারে বালকদিগের শিক্ষা হইলে তাহারা সর্ব প্রকারের ভদ্র হয় ও ঘরে বাইরে সকল কর্ম ভালোরূপে বুঝিতেও পারে'

প্যারীচাঁদ মিত্রের গদ্যে আরবি-ফারসি শব্দের সাবলীল প্রয়োগ লক্ষণীয়।

'...মোর উপর এত না টিটকারী দিয়া বাত হচ্ছে কেন? মুই তো এ সাদি করতে বলি একটা নামজাদা লোকের বেটি না আসলে আদমির কাছে বহু শরমের বাত।'

গদ্যরীতি:

প্যারিচাঁদ মিত্র মূলত সাধু গদ্যরীতি ব্যবহার করেছেন। ক্রিয়াপদগুলির সাধুরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সহজ বাক্য গঠন কাহিনিগুলির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে পাঠ-উপযোগী গদ্য রচনা চেষ্টা করেছিলেন প্যারীচাঁদ।

১১.৬.৯ 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯)

সমকালে বাবুসংস্কৃতি উন্মেষের সূত্রে জাতের বিভিন্ন আদব-কায়দার অন্ধ অনুকরণ শুরু হয়। তার মধ্যে অন্যতম মদ্যপান। উনিশ শতকের বহুল রচনায় মদ্যপানের বিরোধিতা খুব স্পষ্ট। এই সময়েই সমাজ সংস্কারকদের একাংশ মদ্যপান নিবারণী সভা গঠন করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র নক্‌শায় মূলত দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন মদ্যপানের ধ্বংসাত্মক দিক, সমকালে জাতরক্ষার নামে ভ্রষ্টচারিতার দিক। লেখক রঙ্গ ব্যঙ্গ উপদেশের ছলে পাঠকের সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করেছিলেন। লেখক সমকালের ভ্রষ্টাচারিতা, উশৃংখলতা, বেল্লেলাপনার ভয়ঙ্কর, বিচিত্র দৃশ্য কাহিনির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

গদ্যচর্চা:

'মদ্য পানে যে কেবল শরীর নষ্ট হয় এমত নহে, শরীরের সঙ্গে বুদ্ধি ও ধনও যায়।'

'বিদ্যা শিক্ষার সময় ধর্ম বিষয়ে উপদেশ না হইলে বড় অহংকার হয়, কেবল ইংরাজী চলন, ইংরাজী কথোপকথন ও ইংরাজী ভজন করিতে ইচ্ছা হয়।'

'পিতা যৎকিঞ্চিৎ যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন ক্রমে ২দশ জনে লুটেপুটে লইতে আরম্ভ করিল একদিন তাঁহার পক্ষাঘাত হইল, এক হাত ও এক পা অবশ হইয়া পড়িল, কেবল কথা জড়িয়ে যায় নাই।"

গদ্যরীতি:

লেখক সাধুরীতি, গুরুগম্ভীর সংস্কৃত রীতির বিরোধিতা করে কথ্যভাষায় সাহিত্য রচনার যজ্ঞে সামিল হয়েছিলেন। তবে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের ক্ষেত্রে সাধুরূপের প্রয়োগ লক্ষণীয়। তাঁর রচনায় ভাষা ব্যবহারে এক ধরনের সংমিশ্রণ ঘটেছিল।

প্যারীচাঁদ মিত্রের কথ্যরীতি ব্যবহার প্রসঙ্গে বঙ্কিমের ভাবনা উল্লেখ্য। বঙ্কিম নিজে সাধুরীতিতে সাহিত্য রচনা করলেও তিনি অহেতুক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের বিরোধিতা করেছেন। বঙ্কিম বলবার ও লেখার ভাষাকে সমসময় পৃথক করেই রেখেছিলেন কারণ তার মতে লেখার উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন, কথনের উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞাপন। তিনি কথ্য ভাষাকে লেখার ভাষারূপে স্বীকৃতি না দিলেও টেকচাঁদ ঠাকুরের গদ্যচর্চার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বঙ্কিমের মতে

'এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা ও সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল, এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত। ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়া ছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় "আলালের ঘরের দুলাল" প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।'

১১.৬.১০ কালীপ্রসন্ন সিংহ:

কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বল্পায়ু একজন মানুষ। মাত্র ত্রিশ বছর জীবিত ছিলেন। জন্ম ১৮৪০ এবং মৃত্যু ১৮৭০সালে। স্বল্পকালীন জীবদ্দশায় তিনি সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যোৎসাহিনী সভা, বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা, বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও সর্বতত্ত্বপ্রকাশিকা বিবিধার্থ সংগ্রহ-এর মতো পত্রিকা সম্পাদনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। স্কুলে ইংরেজি শিক্ষার জন্য মাসিক প্রদান, বিধবাবিবাহকারীদের সাম্মানিক প্রদান, মেঘনাদবধ কাব্য রচনার জন্য মধুসূদনকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন, নীলদর্পন প্রকাশের অপরাধে রেভারেণ্ড লং-এর জরিমানা হলে অর্থপ্রদান কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনের উল্লেখযোগ্য কাজ। এই সমস্ত কাজের সূত্রে জীবনের শেষ প্রান্তে অর্থ কষ্ট ভুক্ত হয়েছিল কালীপ্রসন্ন সিংহকে। তাঁর অন্যতম সাহিত্যিক কীর্তি মহাভারত অনুবাদ।

'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' বাংলা সাহিত্যের এক অন্যতম আলোচ্য, সমালোচিত গ্রন্থ। নক্শা জাতীয় রচনার এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। কালীপ্রসন্ন সিংহ এই বইটির রচয়িতা তবে তিনি মূলত হুতোম প্যাঁচা ছদ্মনামে কাহিনি রচনা করেন। লেখক এক সময় এই নক্শাটির নাম রাখতে চেয়েছিলেন 'আরসি'; অর্থাৎ আয়না বা দর্পণ। লেখকের উদ্দেশ্য ছিল এই আয়নার মাধ্যমে বাঙালি নিজের ছবি খুঁজে পাবে নক্শায়। পরবর্তীতে নামকরণ পরিবর্তন

করেন।

১১.৬.১১ 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' রচনার উদ্দেশ্য:

'হুতোম' ছদ্মনামে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের ছলে কালীপ্রসন্ন সিংহ সুকঠোর বাক্‌কৌশলে সমাজ সম্পর্কে বলিষ্ঠ মতামত প্রকাশ করেন।

বাঙালি সমাজের নিচতা, অধঃপতনের পরিচয় দিতে গিয়ে বাকভঙ্গির মধ্যে এক প্রকার অসহিষ্ণুতা, উগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে যা অনেকাংশে পরিমিতিবোধকেও অতিক্রম করে গেছে।

অধিকাংশ নক্‌শাকারদের অন্যতম উদ্দেশ্যই সমাজের নিচতা, অধঃপতনের মূলে কুঠারাঘাত।

কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনীকার মন্মথ ঘোষ রচনার প্রেক্ষিত, উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলেছেন

'ইহা কেবল নক্সা বলিয়াই তৎকালে আদৃত হয় নাই, অনেক ভণ্ড সমাজদ্রোহীর পৃষ্ঠে ইহা যে তীব্র কশাঘাতপূর্বক তাঁহাদিগকে সৎ পথে প্রবৃত্ত করিয়া সমাজ সংস্কার সাধন করিয়াছিল'

হুতোম প্যাঁচা কেন?

পেঁচা যেমন টুদ্রত্ম ঋত্রনন এর সাহায্যে রাতের পৃথিবীকে দেখতে পায় তেমনি লেখকও সমকালের কলকাতার মন্দ অন্ধকার দিকগুলি স্পষ্ট রূপে দেখতে পেয়েছিলেন। সমাজের বিভিন্ন আঙ্গিক, বৈশিষ্ট্যগুলি নক্‌শার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। আরেকটি মত অনুযায়ী পেঁচা দ্বস্ত্মদ্রদ্ব এর প্রতীক। এখানে হুতোম প্যাঁচা প্রাজ্ঞজনের মতো সমাজের অন্ধকার দিকগুলি নির্দেশ করে পাঠককে সচেতন করতে চেয়েছেন।

১১.৬.১২ 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'-র ভাষার ব্যবহার:

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'-র পটভূমি উনিশ শতকের বাংলা। ফলত সমকালীন কলকাতার সামাজিক নানা অনৈতিকতা, হুজুকপ্রিয়তা, অন্ধ বিশ্বাস, বুজরুকি বাবুসংস্কৃতির অশ্লীল দিকগুলি প্রকাশ পেয়েছে এই নক্‌শায়। এই চিত্রগুলি পাঠকের কাছে তুলে ধরে পাঠকের নীতি জাগ্রত করা, আধুনিক মনন সমৃদ্ধ সমাজ গঠনই ছিল কালীপ্রসন্ন সিংহের মূল উদ্দেশ্য। নক্‌শা জাতীয় রচনার ক্ষেত্রে সহজ, সরল ভাষা ব্যবহারের রীতি লক্ষণীয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ সমাজের সত্যকার রূপ তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এবং সুস্থ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে নক্‌শা জাতীয় সংরূপকেই হাতিয়ার করেছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের নক্‌শা আলোচনার ক্ষেত্রেও আমরা কথ্য ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করেছি। তবে কালীপ্রসন্ন সিংহ কলকাতার মৌখিক কথ্যরীতিকে সাহিত্যের ভাষা হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। সমকালে ভাষাচর্চা প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র ভূমিকা বলেছেন

'আজকাল বাঙ্গালী ভাষা আমাদের মত মূর্তিমান কবিদলের অনেকেরই উপজীব্য হয়েছে, বেওয়ারিস লুচীর ময়দা বা তইরি কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্মা ছেলেমাত্রেই একটা না একটা পুতুল তইরি করে খ্যালা করে, তেম্‌নি বেওয়ারিস বাঙ্গালী ভাষাতে অনেকে যা মনে যায় কচ্চেন; যদি এর কেউ ওয়ারিসান থাক্‌তো, তাহলে ইস্কুল বয় ও আমাদের মত গাধাদের দ্বারা নাস্তা নাবুদ হতে পেতো না'

গদ্যচর্চা:

'জাহাজ থেকে নতুন সেলার নামলেই যেমন পাইকেরে ছেঁকে ধরে সেই রকম পাড়াগেঁয়ে বড় মানুষ সহরে এলেই প্রথমে দালাল পেস হন। দালাল, বাবুর সদর মোক্তারের অনুগ্রহে বাড়ি ভাড়া করা, গাড়ির যোগাড় করা, খ্যামটা নাচের বায়না করা, প্রভৃতি রকমওয়ারি কাজের ভার পান ও পলিটীকেল এজেন্টের কাজ করেন।'

'গুরুদাসের পোসাকটিও নিতান্ত মন্দ হয় নি, তিনি এক খানি সরেস গুল্‌দার উরুনী গায় দিয়েছিলেন, উড়ুনী খানি চল্লিশ টাকার কম নয়- কেবল কাটের কুচো বাঁদবার দরুন চার পাঁচ জায়গায় একটু একটু খোঁচে গেছ্‌লো তাঁর গায়ে একটি লাল বিলিতি ঢাকা প্যাটনের পিরান ছিল, তার ওপর বুলু রঙ্গের একটি হাপ চায়না কোট- তিনি "বেঁচে থাকুক বিদ্দেসাগর চিরজীবী হয়ে" পেড়ে এক শান্তিপুরে ফরম্যেসে ধুতি পড়েছিলেন, জুতো জোড়াটিতেও রূপোর বকলসদেওয়া ছিল।'

'জয়কেতুরা ভদ্র লোকের ছেলে, অনেকে লেখা পড়াও জানেন তবে কেউ কেউ মূর্তিমতী মা! এঁদের অধিকাংশই পৌত্তলিক, কুলীন বামুন, কায়স্থ কুলীন বেকার পেনসুনে ও ব্রোকই বিস্তর।'

'ছেলে বেলা থেকেই আমাদের বাঙ্গলা ভাষার উপর বিলক্ষণ ভক্তি ছিল, শেখবারও নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল না। আমরা পূবর্বেই বলিছি যে আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা আমাদের ঘুমবার পূর্বে নানা প্রকার উপকথা কইতেন।'

কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনার মূল গদ্যরীতি কথ্যভাষার রীতি। এর পাশাপাশি খুব সাবলীল ভাবে ইংরেজি, আরবি, ফারসি শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। 'গুলদার উরুনী', 'মোক্তার' প্রভৃতি আরবি-ফারসি শব্দের পাশাপাশি 'বুলু রঙ', 'পেনসুনে', 'পলিটীকেল এজেন্ট' প্রভৃতি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন লেখক।

১১.৬.১৩ প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের ভাষারীতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য:

প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' কথ্যরীতিতে, সহজ ভাষায় লেখা হলেও এর কাঠামোটি সাধুরীতির। প্রয়োজন সাপেক্ষে গ্রাম্য বুলি ও কলকাতা শহরে চলিত বুলি ব্যবহৃত হলেও প্যারীচাঁদ মিত্রের গদ্যে মূলত সাধু এবং চলিত গদ্যের সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। অন্যদিকে হুতোম অবিমিশ্র চলিত গদ্যে রচিত। তিনি মুখের ভাষা, কথার মুদ্রাদোষ, উচ্চারণ পদ্ধতিগুলিকেও হুবহু অনুকরণ করেছিলেন তাঁর গদ্যে। পরবর্তীতে প্রমথ চৌধুরীর হাত ধরে চলিত গদ্যরীতি প্রচলিত হয়, প্রসার লাভ করে। তবে এই ভাষা ভদ্রজনের ব্যবহারযোগ্য মার্জিত, গুরুভারসম্পন্ন।

উনিশ শতকের গোঁড়াতেই হুতোম তথা কালীপ্রসন্ন সিংহ পরবর্তী লেখকদের জন্য গদ্যরীতির এক বিকল্প ধারার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। কলকাতার সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার পাশাপাশি এই নক্‌শা পাঠের মাধ্যমে কলকাতার তৎকালীন কথ্যরীতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে পাঠকের। মৌখিক ভাষার চলনকে অবিকৃত রেখে সাহিত্যে তাকে প্রয়োগের অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী কালীপ্রসন্ন সিংহ।

হুতোমি ভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন 'হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দ ধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয় সেখানে পবিত্রতা শূন্য। হুতোমি

ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে। যিনি হুতোম পেঁচা লিখিয়া ছিলেন তাঁহার রুচি বা বিবেচনার আমরা প্রশংসা করি না।'

এই ভাষার নিন্দা প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজেই বলেন'হুতোমের নক্শা ব্যঙ্গ সাহিত্যের নূতন গহনা ও সমাজের পক্ষে নূতন হেঁয়ালি; যদি ভালো করে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া না হয়, তাহলে সাধারণ এর মর্ম বহন কত্তে পাত্তেন না ও হুতোমের উদ্দেশ্য বিফল হতো।'

১১.৭ বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য

উনিশ শতকের প্রাথমিকপর্বে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ভাষাশিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বাংলা গদ্য নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীতে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখের হাত ধরে বাংলা গদ্যের প্রাথমিক পর্বের নির্মাণ সংগঠিত হয়। বাংলা গদ্য নির্মাণের প্রাথমিক পর্বটি নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হয়েছে। প্রাথমিক পর্বের পরবর্তী পর্যায়ে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি নির্মাণে যাঁদের নাম অনস্বীকার্য, তাঁদের মধ্যে অন্যতম আলোচ্য নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত সাহিত্য সংরূপগুলি আলোচনার প্রেক্ষিতে লেখকের গদ্যচর্চার স্টাইল বা ভঙ্গিটি বোঝার চেষ্টা করব। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যরীতি আলোচনা সাপেক্ষে বাংলা গদ্য সংগঠনে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান পর্যালোচনাও আমাদের উদ্দেশ্য।

১১.৭.১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাধারণ পরিচয়:

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম ২৬ শে জুন ১৮৩৮ সালে (১৩ই আষাঢ় ১৪৪৫ বঙ্গাব্দ) এবং মৃত্যু ৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪ সালে। ব্রিটিশ সরকার অধীনে কর্মরত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। জাতীয় চেতনা গঠনে, জাতীয়তাবাদের প্রকাশে, বিকাশে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উনিশ শতকে সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি সংগঠনের এই যজ্ঞে বাংলা সাহিত্য উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

জাতীয়তাবাদ চর্চায় বঙ্কিমী সাহিত্যের গুরুত্ব বহুল আলোচিত হলেও ব্রিটিশ রাজশক্তি সম্পর্কে বঙ্কিমের অবস্থান বিভিন্ন সময় সমালোচিত হয়েছে। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হয়, বাঙালি জাতিসত্তা নির্মাণে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১১.৭.২ বিবর্তনের ধারা:

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, রামমোহন রায় থেকে পরবর্তীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়, অক্ষয় দত্ত থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারিচাঁদ মিত্র প্রমুখের হাত ধরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বহুমাত্রিক চর্চা-চর্যার বিকাশ ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একজন পরিত্রাতার মতো বাংলা ভাষা-সাহিত্যকে দুর্দশা, অবহেলার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। বিবর্তনের ধারাতেই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্য সংগঠনে আমূল পরিবর্তন সংগঠিত করেছিলেন। যেমন- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস সংরূপটি বিকাশ লাভ করে। বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ও

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অবস্থান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন

'রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়া ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলি-মৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন, বাংলা ভাষা কেবল বাসযোগ্য নয়, উর্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছ।'

১১.৭.৩ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচর্চার ধারা

ছাত্র জীবনে কবিতা রচনার মধ্যে দিয়ে সাহিত্য জীবনে অনুপ্রবেশ ঘটে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। পরবর্তীতে উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্য রচনা-কে হাতিয়ার করে দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। ঐতিহাসিক, সামাজিক, ব্যঙ্গ-কৌতুক, ধর্মীয়-সংস্কৃতি প্রচারমূলক বিষয়ে রচনার নিদর্শন লক্ষণীয়। উপন্যাসের জনক, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমের বহু বিখ্যাত উপন্যাসের সঙ্গে আমরা পরিচিত; তবে বঙ্কিমের উপন্যাস রচনার সূত্রপাত ঘটে একটি ইংরেজি উপন্যাসের মাধ্যমে; 'টুথদ্দদ্বদ্রস্তুদ্র''ন্দ্বত্র'.

সাহিত্যভাণ্ডার:

বঙ্কিম রচিত বিখ্যাত উপন্যাসগুলি 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'রাজসিংহ', 'মৃণালিনী', 'দেবী চৌধুরানী', 'চন্দ্রশেখর', 'ইন্দিরা', 'রজনী', 'সীতারাম', 'রাধারানী' ইত্যাদি। বঙ্কিম রচিত প্রবন্ধ সাহিত্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য- 'লোকরহস্য', 'বিজ্ঞান রহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'সাম্য', 'বিবিধ প্রসঙ্গ', 'ধর্মতত্ত্ব' ইত্যাদি।

এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৭ সালে 'বন্দেমাতরম্' রচনা করেন; যা সেই সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়। লেখক-সম্পাদক-সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিকাশে, আত্মপ্রকাশে বঙ্গদর্শন পত্রিকার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

১১.৭.৪ গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গদ্য মূলত সাধু গদ্য। তবে সাধু গদ্যকে তিনি সহজ, সুললিত, সুসংবদ্ধ রূপে গড়ে তুলেছিলেন। বঙ্কিমের প্রবন্ধের ভাষা ঋজু, যুক্তিনিষ্ঠ, যৌক্তিক পারম্পর্য্যে সুগঠিত ও সুললিত। তবে বিষয় অনুযায়ী গদ্যরীতির পার্থক্য লক্ষণীয়। শাণিত, যুক্তিবাদী গদ্যরীতির পাশাপাশি শ্লেষপূর্ণ, ব্যঙ্গাত্মক প্রকাশকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ উইট, স্যাটায়ারের প্রয়োগ যেমন বাংলা সাহিত্যে অভিনবত্বের আমদানি করেছিল; অপরদিকে যুক্তিবাদী গদ্যচর্চার ধারায় সুনিবন্ধ, দৃঢ় ভিত্তি প্রকাশ পেয়েছিল। বঙ্কিমের গদ্যরীতি প্রাঞ্জল, রসাস্বাদী ও মনোহর। বঙ্কিমচন্দ্র সাধু গদ্যরীতি ব্যবহার করলেও এক নিজস্ব স্টাইল আমদানি করেছিলেন। বঙ্কিমের গদ্যরীতি যা 'বঙ্কিমী রীতি' বা 'বঙ্কিমী স্টাইল' নামে পরিচিত; বহুদিন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে অনুসৃত হয়েছে।

বঙ্কিম যেমন লেখার ভাষা ও কথ্য ভাষার মধ্যেকার পার্থক্য সম্পর্কে সর্বদা সচেতন ছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যরীতির সমালোচনা শোনা যায়। অপরদিকে অহেতুক সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের বিরোধিতাও লক্ষণীয়।

সংস্কৃতধর্মী বাংলা ভাষা চর্চার বিরোধীতায় বঙ্কিম বলেন

'...গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক না বাড়ুক, ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পড়িলেই অলংকার পড়ার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্তারাও তেমনই জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক না হউক, দুর্বোধ্য সংস্কৃতবাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল।'

বাংলা ভাষার স্বরূপ কেমন হওয়া উচিত:

বঙ্কিম বাংলা ভাষার স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত আলোচনায় মূলত বোধগম্য রচনা, গদ্যের সৌন্দর্য সংগঠনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রয়োজন অনুযায়ী সরল গদ্য গঠনের কথা যেমন বলেছেন, তেমনই উদ্দেশ্য সিদ্ধির স্বার্থে সংস্কৃত বহুল ভাষা প্রয়োগের কথাও বলেছেন। প্রয়োজন সাপেক্ষে, বিষয় অনুযায়ী বিদ্যাসাগর থেকে টেকচাঁদি, হুতোমি গদ্য ব্যবহারে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন লেখক।

ভাষা গঠন সম্পর্কে লেখকের মতামত '...বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা ও স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে।'

বিষয় অনুযায়ী গদ্যরীতির পার্থক্য বঙ্কিমের সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ ব্যঙ্গ-উইট, শ্লেষের ঝঙ্কার যেমন শোনা যায় তেমনই 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-এর গদ্যরীতি সাবলীল, গতিময়। অপরদিকে বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় যুক্তিবাদী গদ্যচর্চার নিদর্শন লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় কতগুলি নতুন রচনারীতি বা আঙ্গিকের আমদানি ঘটেছিল। এগুলির মধ্যে তুলনামূলক সাহিত্য রচনারীতি, ব্যঙ্গাত্মক রচনারীতি ইত্যাদি আঙ্গিকগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আমরা কতকগুলি উদাহরণের সাহায্যে বঙ্কিমের রচনারীতির বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝার চেষ্টা করব।

১১.৭.৫ বঙ্কিমের গদ্যচর্চা:

ক) প্রবন্ধসাহিত্য

তুলনামূলক সাহিত্য আলোচনারীতি 'জয়দেব বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা, বিশেষতঃ চণ্ডীদাসাদির কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত।জয়দেবের গীত, রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ; বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা। জয়দেবের কবিতা, উৎফুল্লকমলজালশোভিত, বিহঙ্গমাকুল, স্বচ্ছ বারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর; বিদ্যাপতির কবিতা, দূরগামিনী বেগবতী তরঙ্গসঙ্কুলা নদী। জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার, বিদ্যাপতির কবিতার রুদ্রাক্ষমালা। জয়দেবের গান, মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠ গীতি; বিদ্যাপতির গান সায়াহ্নসমীরণের নিশ্বাস।'

গদ্যবৈশিষ্ট্য:

'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থটির "জয়দেব ও বিদ্যাপতি" প্রবন্ধ সাধুগদ্যরীতির উদাহরণ। সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা সংক্রান্ত এই প্রবন্ধে স্বভাবতই তৎসম শব্দ, সমাসবদ্ধ পদের প্রাধান্য লক্ষণীয়। যেমন উৎফুল্লকমলজালশোভিত, বিহঙ্গমাকুল, মুরজবীণাসঙ্গিনী ইত্যাদি। তবে পূর্ববর্তী যুগের তুলনার বাংলা বাক্যগঠনরীতি অনেক সাবলীল। বাংলা ভাষায় সুসংহত বাক্য রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমের অবদান অবশ্য উল্লেখ্য। বিপরীতধর্মী শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে এক ধ্বনিমাধুর্য্য সৃষ্টি হয়েছে, প্রবন্ধপাঠে অহেতুল জটিলতা সৃষ্টি হয় না।

এই ধারার আরেকটি উদাহরণ "শকুন্তলা মিরান্দা ও দেস্‌দিমোনা"।

'...শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার সঙ্গে তুলনীয়া এবং তুলনীয়াও নহে। তুলনীয়া নহে কেন না, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তুতে তুলনা হয় না। সেক্ষপীয়ারের এই নাটক সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকাননতুল্য। কাননে সাগরে তুলনা হয় না। যাহা সুন্দর, যাহা সুদৃশ্য,যাহা সুগন্ধ, যাহা সুরব, যাহা মনোহর, যাহা সুখকর তাহাই এই নন্দনকাননে অপর্যাপ্ত, স্তুপীকৃত, রাশি রাশি, অপরিমেয়। আর যাহা গভীর, দুস্তর, চঞ্চল, ভীমনাদী, তাহাই এই সাগরে।'

ব্যঙ্গাত্মক রচনারীতি:

সমাজ সম্পর্কিত ভাবনা প্রকাশে, পাঠকের সামনে সমাজের স্বরূপ তুলে ধরার উদ্দেশ্যে খানিক সহজ, সরল ভাষায় প্রকাশ এই অংশের লেখায় দেখতে পাওয়া যায়। সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে হাস্যরসের ছলে পাঠককে সমাজ সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছেন লেখক। এই আলোচনাগুলিতে বুদ্ধিদীপ্ত হাসির ঝলক বা উইটের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষণীয়।

যেমন—

'ছোব্‌ড়া, স্ত্রীলোকের রূপ। ছোব্‌ড়া যেমন নারিকেলের বাহ্যিক অংশ, রূপও স্ত্রীলোকের বাহ্যিক অংশ। দুই বড় অসার; পরিত্যাগ করাই ভাল। তবে ছোব্‌ড়ায় একটি কাজ হয় উত্তম রজ্জু প্রস্তুত হয়, তাহাতে জাহাজ বাঁধা যায়। স্ত্রীলোকের রূপের কাছিতেও অনেক জাহাজ বাঁধা গিয়াছে। তোমরা যেমন নারিকেলের কাছিতে জগন্নাথের রথ টান, স্ত্রীলোকেরা রূপের কাছিতে কত ভারি ভারি মনোরথ টানে।' ('কমলাকান্তের দপ্তর' "মনুষ্যফল")

'আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম "থাম ! থাম মার্জারপণ্ডিতে ! তোমার কথাগুলি ভারী সোশিয়ালিষ্টিক সমাজ বিশৃঙ্খলার মূল। যদি যাহার যত ক্ষমতা সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জালায় নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয় যত্ন করিবে না। হাতে সমাজে ধনবৃদ্ধি হইবে না।' ('কমলাকান্তের দপ্তর' "বিড়াল")

'দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে ? বরং যোড়হাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব ? তবে

আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? তা ত নয় তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতির রোগ, দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝেনা।' ('কমলাকান্তের দপ্তর' "বিড়াল")

'আমি বহুকাল ঐ লৌহজালাবৃত প্রকোষ্ঠে বাস করিলাম। ইচ্ছা ছিল না যে, সে সুখ ত্যাগ করিয়া আসি। কিন্তু স্বদেশ-বাৎসল্য প্রযুক্ত থাকিতে পারিলাম না। আহা! যখন এই জন্মভূমি আমার মনে পড়িত, তখন আমি হাউ হাউ করিয়া ডাকিতে থাকিতাম। হে মাতঃ সুন্দরবন! আমি কি তোমাকে কখনো ভুলিতে পারিব? আহা তোমাকে যখন মনে পড়িত তখন আমি ছাগ মাংস ত্যাগ করিতাম মেষমাংস ত্যাগ করিতাম! (অর্থাৎ অস্থি এবং চর্ম মাত্র ত্যাগ করিতাম)...' ('লোকরহস্য' "ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল")

গদ্যবৈশিষ্ট্য:

সমাজের ধনবৈষম্য, সামাজিক অবস্থান, মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে এত সহজ ভাষায় পাঠককে অবগত করার নজির খুব বেশি দৃষ্ট হয় না। সামাজিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি উইটের প্রয়োগ এবং যুক্তিবাদী গদ্যচর্চার ধারা সমান্তরাল ভাবে অবস্থান করছে। ব্যঙ্গধর্মী আলোচনার ক্ষেত্রে রূপকের আশ্রয়ে সমাজের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পেয়েছে।

বঙ্কিম এখানে অবলীলায় ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন, পরিভাষা বদলের অহেতুক কষ্ট স্বীকার করেনি। যেমনসোশিয়ালিষ্টিক অপরদিকে তৎসম শব্দও ব্যবহার করেছেন। মুলো গদ্যভঙ্গিতে সাধুরীতির প্রকাশ লক্ষণীয়। মনুষ্যফল প্রবন্ধে 'ছোবড়া' শব্দটিকে রূপক অর্থে ববহার করা হয়েছে। এই শব্দটি অনার্য গোষ্ঠীর ভাষা। এই অংশে সাধু গদ্যরীতি ব্যবহৃত হলেও এক বোধগম্য, তরল, সহজ সাধুরীতির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা:

ধর্মতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক নিজেই এ কথা স্বীকার করেছেন যে এই অংশের বিষয় 'নীরস' এবং 'দুরূহ' এই অংশের ভাষার ব্যবহার, বাক্যগঠন পদ্ধতিও খানিক জটিল। যেমন 'তাহারা দেখলেন যে, জগতের যে অনন্ত কারণভূত চৈতন্যের অনুসন্ধানে তাহারা প্রবৃত্ত তাহা অতিশয় দুর্জয়ে। সেই ব্রহ্ম জানিতে পারিলে সেই জগতের অন্তরাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ এবং জগতের সঙ্গেই বা তাহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে পারিলে, বুঝা যাইতে পারে যে, এ জীবন লইয়া কি করিতে হইবে।' ('ধর্মতত্ত্ব')

অন্যান্য উদাহরণ:

'বাহ্য প্রকৃতির শোভার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ভবভূতির আর একটি গুণ। সংসারে যেখানে যাহা সুদৃশ্য, সুগন্ধ বা সুখকর, ভবভূতি অনবরত তাহার সন্ধানে ফিরেন। মালাকার যেমন পুষ্পদান হইতে সুন্দর সুন্দর কুসুমগুলি তুলিয়া সভামণ্ডপ রঞ্জিত করে, ভবভূতি সেই রূপ সুন্দর বস্তু অবকীর্ণ করিয়া এই নাটকখানি শোভিত করিয়াছেন। যেখানে সুদৃশ্য বৃক্ষ, প্রফুল্ল কুসুম, সুললিত সুবাসিত বারি, যেখানে নীল মেঘ, উত্তুঙ্গ পর্বত, মৃদুনিনাদিনী নির্ঝরিণী, শ্যামল কানন, তরঙ্গসঙ্কুলা নদী যেখানে সুন্দর বিহঙ্গ, ক্রিড়াশীল করিশাবক, সরল স্বভাব কুরাঙ্গ সেইখানে কবি দাঁড়াইয়া একবার তাহার সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন।' ('বিবিধ প্রসঙ্গ' "উত্তরচরিত")

'উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহারা নিবারণজন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দম পান করিতেছে; ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা যাইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে উহারা ভাঙ্গা পাতরে রাঙা রাঙা বড় বড় ভাত, নুন, লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে।' ('বিবিধ প্রসঙ্গ' "বঙ্গদেশের কৃষক")

'মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট। স্ত্রীগণও মনুষ্য জাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। যে যে কার্য্যে পুরুষের অধিকার আছে স্ত্রীগণেরও সেই কার্য্য অধিকার থাকা ন্যায় সঙ্গত। কেহ কেহ উত্তর করিতে পারেন যে, স্ত্রীপুরুষে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে; পুরুষ বলবান, স্ত্রী অবলা, পুরুষ সাহসী, স্ত্রী ভীরু; পুরুষ ক্লেশসহিষ্ণু, স্ত্রী কোমলা ইত্যাদি ইত্যাদি; অতএব যেখানে স্বভাবগত বৈষম্য আছে, সেখানে অধিকারগত বৈষম্য থাকাও বিধেয়।' ('সাম্য')

প্রবন্ধ সাহিত্যের এই উদাহরণগুলিতে মূলত সাধুগদ্যরীতি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে বাক্যগঠনের সাবলীলতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাক্যের অর্থবোধগম্যতার প্রশ্নে, রসসংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় না।

খ) উপন্যাস:

'বর্ধমানে উপনীত হইয়া রাজা দেখিলেন যে, সৈয়দ খাঁ আসেন নাই, কেবলমাত্র দূত দ্বারা এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, সৈন্যাদি সংগ্রহ করিতে তাঁহার বিস্তর বিলম্ব-সম্ভবনা; এমন কি, তাঁহার সৈন্যসজ্জা করিয়া যাইতে বর্ষাকাল উপস্থিত হইবে; অতএব রাজা মানসিংহ আপাততঃ বর্ষাশেষ পর্যন্ত শিবির সংস্থাপন করিয়া থাকিলে, তিনি বর্ষাপ্রভাতে সেনা সমভিব্যাহারে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইবেন।' ('দুর্গেশনন্দিনী')

'কুন্দ তৎসঙ্কেতানুসারে দেখিল, নীল গগনপটে এক দেবনিন্দিত পুরুষমূর্তি অঙ্কিত হইয়াছে। তাঁহার উন্নত, প্রশস্ত প্রশান্ত ললাট, সরল, সকরুণ কটাক্ষ; তাঁহার মরালবৎ দীর্ঘ ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা এবং অন্যান্য মহাপুরুষলক্ষণ দেখিয়া, কাহারও বিশ্বাস হইতে পারে না যে, ইহা হইতে আশঙ্কা সম্ভবে।'

মস্তক নমিত হওয়াতে অলকবন্ধ হইতে দুই একটি কর্ণবিলম্বি কুরুবক কুসুম খসিয়া পড়িতেছে; বক্ষ হইতে বসন ঈষৎ ত্রস্ত হইতেছে, দূর হইতে মন্মথ সেই সময়ে, বসন্তপ্রফুল্লবনমধ্যে অর্ধলুক্কায়িত হইয়া এক জানু ভূমিতে রাখিয়া, চারু ধনু চক্রাকার করিয়া, পুষ্পধনুতে পুষ্পশর সংযোজিত করিতেছেন।' ('বিষবৃক্ষ')

'নানা রঙের বস্ত্রের বাহার; নানাবিধ রত্নের অলঙ্কারের বাহার; নানাবিধ উজ্জ্বল কোমল বর্ণের কমনীয় দেহরাজি, কেহ মল্লিকাবর্ণ, কেহ পদ্মরক্ত, কেহ চম্পকাঙ্গী, কেহ নবদূর্বাদলশ্যামাখনিজ রত্নরাশিকে উপহাসিত করিতেছে। কেহ তাম্বুল চর্বণ করিতেছে, কেহ আলবোলাতে তামাকু টানিতেছে কেহ বা নাকের বড় বড় মতিদার নথ দুলাইয়া ভীমসিংহের পদুমিনী রানীর উপাখ্যান বলিতেছেন, কেহ বা কাণের হীরকজড়িত কর্ণভূষা দুলাইয়া পরনিন্দায় মজলিস জাঁকাইতেছেন।' ('রাজসিংহ')

'মাণিকলাল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আসিবার সময়ে নিহত মোগল সওয়ারদিগের বস্ত্র মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলঝনাত করিয়া পিসীর কাছে গোটাকতক আশরাফি ফেলিয়া দিল, পিসীমা আনন্দে

পরিপ্লুত হইয়া তাহা কুড়াইয়া লইয়া পেটরায় তুলিয়া রাখিয়া বিবাহের উদ্যোগ করিতে বাহির হইলেন।' ('রাজসিংহ')

'তারপর যেমন করিয়া শরন্মেঘ-বিলুপ্ত চন্দ্রমা ক্রমে ক্রমে মেঘদল উদ্ভাসিত করিয়া, আপনার সৌন্দর্য্য বিকশিত করে, যেমন করিয়া প্রভাতসূর্য্য তরঙ্গাকৃত মেঘমালাকে ক্রমে ক্রমে সুবর্ণীকৃত করিয়া আপনি প্রদীপ্ত হয়, দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করে, জল স্থল কীটপতঙ্গ প্রফুল্ল করে, তেমনি সেই শবদেহে জীবনের শোভার সঞ্চার হইতেছিল।' ('আনন্দমঠ')

'আমি সেদিন নৌকা পথে রথ দেখিতে আসিয়াছিলামপাছে কেহ জানিতে পারে, এই জন্য ছদ্মবেশে রুক্মিণীকুমার রায় পরিচয়ে লুকাইয়া আসিয়াছিলামঅপরাহ্নে ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় বোটে থাকিতে সাহস না করিয়া একা তটে উঠিয়ে আসিয়াছিলাম।'('রাধারাণী')

গদ্যবৈশিষ্ট্য:

উপন্যাসের উদাহরণগুলিতেও আমরা সাধুরীতির প্রভাব, তৎসম শব্দ, সংস্কৃতগন্ধী শব্দ, সমাসবদ্ধ পদের স্বাভাবিক ব্যবহার দেখতে পাই। যেমন 'তৎসঙ্কেতানুসারে' (তৎ- সংকেত- অনুসারে; তিনটি শব্দের সমাহার), 'মরালবৎ' (মরালের মতো- হাঁসের মতো), 'শরন্মেঘ-বিলুপ্ত চন্দ্রমা' (শরৎ মেঘ হীন চাঁদ), 'পুষ্পধনুতে পুষ্পশর', 'মল্লিকাবর্ণ', 'নবদূর্বাদলশ্যামা' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। পাশাপাশি রাজসিংহ উপন্যাসে 'সওয়ার', 'আশরাফি'র মতো আরবি-ফারসি শব্দের প্রাধান্যও লক্ষণীয়।

আজকের পাঠকের নিরিখে বঙ্কিমের গদ্যের শব্দচয়ন খানিক কঠিন হলেও সমকালের প্রেক্ষিতে বঙ্কিমের বাংলা আধুনিক বাংলা। বঙ্কিম তাঁর সমকালের যুবসমাজকে বাংলা সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পেরেছিলেন। বঙ্কিমের হাত ধরেই বাংলা সাহিত্য শিক্ষিত মধ্যবিত্তের রসাস্বাদনের উপযোগী হয়ে উঠেছিল।

গ) বঙ্গদর্শন পত্রিকা

বঙ্কিমের সাহিত্য প্রতিভার উন্মেষে, লেখক, সাহিত্যিক, সম্পাদক বঙ্কিমের বিকাশে বঙ্গদর্শন পত্রিকার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকার কিছু দৃষ্টান্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা বঙ্কিমের সাহিত্য রীতির স্বরূপটি বোঝার চেষ্টা করব।

বঙ্গদর্শন-এর কিছু উদাহরণ

'যিনি ইহা আদ্যোপান্ত মনোযোগে পাঠ করিবেন, তিনি বুঝবেন যে নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্য জাতির গৌরব পৃথিবীর কোন জাতির গৌরবের অপেক্ষা ন্যূন নহে। এমন কোন নৈতিকত্ত্ব কোন দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে বা নীতিশাস্ত্রে নাই, যাহা প্রাচীন হিন্দুগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত, উক্ত ও প্রচারিত হয় নাই।' ('হিন্দু ধর্মনীতিশাস্ত্র'-এর সমালোচনা)

'মহাকাব্যের সম্পূর্ণাবস্থা না হইলে, তাহার দোষগুণ নির্বাচন সাধ্য নহে; অর্ধনির্মিত অট্টালিকা দেখিয়া কেহ অট্টালিকার ভাবী উৎকর্ষ সম্বন্ধে স্থির কথা বলিতে পারেন না; শাখা বা কাণ্ড মাত্র দেখিয়া কেহই বৃক্ষের শোভা

বুঝিতে পারেন না; অঙ্গমাত্র দেখিয়া ব্যক্তিবিশেষকে সুন্দর বা কুৎসিত বলা যায় না। তবে অসমাপ্ত কাব্য করিয়া আমাদিগের যে সুখোদয় হইয়াছে, পাঠকগণকে সেই সুখের ভাগী করিবার জন্য গ্রন্থের কিছু পরিচয় দিব।' (হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার'-এর সমালোচনা)

'দুর্গা' প্রবন্ধে বঙ্কিম বলেন, 'শ্রীকৃষ্ণ ও দুর্গা এই বঙ্গদেশের প্রধান আরাধ্য দেবতা। ইঁহাদিগের পূজা না করে, এমত হিন্দু প্রায়ই বঙ্গদেশে নাই। কেবল পূজা নহে, কৃষ্ণভক্তি ও দুর্গাভক্তি এদেশের লোকের সর্ব কর্মব্যাপী হইয়াছে। প্রভাতে উঠিয়া শিশুরা "দুর্গা" "দুর্গা" বলিয়া গাত্রোত্থান করে। যে কিছু লেখাপড়া আরম্ভ করিতে হইলে আগে দুর্গানাম লিখিত হয়।'

গদ্যবৈশিষ্ট্য:

এই অংশগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যরীতির সহজাত রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। তবে উল্লেখ্য বিষয়গত তারতম্যের ভিত্তিতে শব্দচয়ন, বাক্যগঠন রীতিতে পার্থক্য সূচিত হয়েছে। 'কমলাকান্তের দপ্তর' বা 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল'-এর রীতিতে যে ব্যঙ্গাত্মক প্রকাশ, উইট স্যাটায়ারের ঝলক, খানিক সহজ বাক্য গঠনের রীতি দেখতে পাওয়া যায়, ধর্মশাস্ত্র সংক্রান্ত আলোচনায় তা অনুসৃত হয়নি। বিষয়গত পার্থক্য ভাষা ব্যবহারের পার্থক্য সূচিত করেছে।

১১.৭.৬ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ:

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যরীতি, সাহিত্য প্রতিভা সমকালে বহু সাহিত্যিকদের দ্বারা অনুসৃত হয়েছে। তৎকালে বঙ্কিম সম্পর্কে বহু আলোচকদের মতামত বঙ্কিমের সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা তৈরিতে সাহায্য করে। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন

'তৎপূর্বে বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত-পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজি-পণ্ডিতেরা তাহাকে বর্বর জ্ঞান করিতেন। বাংলা ভাষায় যে কীর্তি উপার্জন করা যাইতে পারে, সে কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। এইজন্য কেবল স্ত্রীলোক ও বালকদের জন্য অনুগ্রহপূর্বক দেশীয় ভাষায় তাঁহারা সরল পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতেন। এমন সময় তখনকার শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত অনুরাগ, সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সংকুচিত বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন; ...'

তিনি আরো বলেন

'...বঙ্কিম সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যে যেখানে যাহা-কিছু অভাব ছিল সর্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কী কাব্য, কী বিজ্ঞান, কী ইতিহাস, কী ধর্মতত্ত্ব, যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।'

রবীন্দ্রনাথ ভাষার যৌবনপ্রাপ্তি, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান সম্পর্কে বলেন

'...মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী, পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা

প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। ... বঙ্গভাষার সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।

১১.৮ রবীন্দ্রনাথের ভাষাশৈলী:

উনিশ শতকের নয়া শিক্ষা-চিন্তা-চেতনার হাত ধরে বাংলা ও বাঙালির আর্থ-সামাজিক জীবন থেকে সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি সংগঠন ক্ষেত্রে নানান বদল সংগঠিত হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে রাজকর্মচারীদের ভাষাশিক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষা-সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীতে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালির হাত ধরে বাংলা ভাষা-সাহিত্য চর্চার সম্প্রসারণ ঘটে। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন প্রকরণ-সংরূপের প্রসার ঘটে।

বাংলা ভাষা-সাহিত্য চর্চার ধারায় রবীন্দ্রনাথের অবদান ব্যতিরেকে আলোচনা শেষ করা অসম্ভব।

উনিশ-বিশ শতক জুড়ে বিভিন্ন আঙ্গিক, সংরূপচর্চা সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চার সম্প্রসারণ ঘটে। রবীন্দ্রসৃষ্ট সাহিত্য আঙ্গিকগুলির দৃষ্টান্ত আলোচনার সাপেক্ষে আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাষাশৈলী, বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব।

১১.৮.১ রবীন্দ্রসৃষ্টি:

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা প্রকাশ পায় ১২৮৩ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে, জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব পত্রিকায়।

প্রবন্ধটির নাম 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখ সঙ্গিনী'। তিনটি কবিতার বইয়ের সমালোচনা প্রকাশ পায় এই প্রবন্ধটিতে। প্রথম গদ্যের নিদর্শন এর সাহিত্যিক মূল্য নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

'মনুষ্য হৃদয়ের স্বভাব এই যে, যখনই সে সুখ দুঃখ শোক প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সে ভাব বাহ্যে প্রকাশ না করিলে সে সুস্থ হয় না। যখন কোনো সঙ্গী পাই, তখন তাহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করি, নহিলে সেইভাব সঙ্গীতাদির দ্বারা প্রকাশ করি। এইরূপে গীতিকাব্যের উৎপত্তি। আর কোন মহাবীর শত্রুহস্ত বা কোন অপকার হইতে দেশকে মুক্ত করিলে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক যে গীতি রচিত ও গীত হয় তাহা হইতেই মহাকাব্যের জন্ম।'

বাংলা সাহিত্যের প্রায় সমস্ত সংরূপ রচনাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্বাক্ষর প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ রচিত কবিতা, গদ্য, নাটক, উপন্যাস আলোচনার সাপেক্ষে আমরা গদ্যচর্চার ধারা, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। রবীন্দ্রনাথ এক দীর্ঘ সময় ব্যাপী বাংলা ভাষা-সাহিত্যচর্চা করেছেন। কালগত ভিন্নতার প্রেক্ষিতে সাহিত্যের ধারায়, ভাষাশৈলীতে যে পরিবর্তন সূচিত হয়, তা রবীন্দ্রসাহিত্যেও দৃষ্ট। রবীন্দ্রনাথ সাধুরীতিতে সাহিত্য রচনা করলেও সবুজপত্র পত্রিকার হাত ধরে চলিত গদ্য ধারায় সাহিত্য সৃজনে অংশ নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিষয়গত, কালগত পার্থক্যের প্রেক্ষিতে আমরা রবীন্দ্র সাহিত্যের বহুমাত্রিকতা, ভাষার

পরিবর্তমানতার স্বরূপ প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

ক) কবিতা:

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' প্রভাতসঙ্গীত, অগ্রহায়ণ, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ

'আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা;
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া,
দিব রে পরাণ ঢালি।'

'সুরদাসের প্রার্থনা', মানসী, ২২-২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫ বঙ্গাব্দ/১৮৮৮

'আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত
প্রভাতরশ্মিসম
লও, বিঁধে দাও বাসনাসঘন
এ কালো নয়ন মম।
এ আঁখি আমার শরীরে তো নাই,
ফুটেছে মর্মতলে
নির্বাণহীন অঙ্গারসম
নিশিদিন শুধু জ্বলে।
সেথা হতে তারে উপাড়িয়া লও
জ্বালাময় দুটো চোখ
তোমার লাগিয়া তিয়াষ যাহার
সে আঁখি তোমারি হোক।'

'সোনার তরী', সোনার তরী, বোট, শিলাইদহ, ফাল্গুন ১২৯৮ বঙ্গাব্দ

'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণগগন ঘিরে
          ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
          শূন্য নদীর তীরে
          রহিনু পড়ি
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।'

'ধুলামন্দির', গীতাঞ্জলী, ২৭ আষাঢ় ১৩১৭ বঙ্গাব্দ

'মুক্তি? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে!
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে
বাঁধা সবার কাছে।
রাখ্ রে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক ঝরে।'

বৈশিষ্ট্য:

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ মূলত সাধুরীতি ব্যবহার করেছেন, তবে কবিতার ছন্দ মিলের প্রয়োজনে বেশ কিছু চলিত শব্দের প্রয়োগও লক্ষণীয়। তবে কাব্যেরক্ষেত্রে কবির এই স্বাধীনতা থাকে। কবিতায় সাধু-চলিতের এই সহাবস্থান, কবিতার সৌন্দর্য্যের কারণে, তাই একে ভাষা সংমিশ্রণ বলা যায় না। যেমন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় ক্রিয়াপদে মূলত সাধুরূপের প্রভাবই লক্ষণীয়। আবার 'সুরদাসের প্রার্থনা'-য় 'দাও'-'লও'-'চোখ'-'আঁখি' শব্দগুলির সহাবস্থান দেখা যায়।

'শা-জাহান', বলাকা, এলাহাবাদ, ১৪ কার্তিক ১৩২১ বঙ্গাব্দ

'এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,

কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।

শুধু তব অন্তরবেদনা

চিরন্তন হয়ে থাক্ সম্রাটের ছিল এ সাধনা।

রাজশক্তি বজ্র সুকঠিন

সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন,

কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস

নিত্য-উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ,

এই তব মনে ছিল আশ।'

'ওরা কাজ করে', আরোগ্য, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ

'রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,

জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে,

রক্তমাখা অস্ত্রহাতে যত রক্ত-আঁখি

শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।

ওরা কাজ করে

দেশে দেশান্তরে,

অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে,

পাঞ্জাবে বোম্বাই-গুজরাটে।'

বৈশিষ্ট্য:

এই কবিতাগুলিতে তৎসম, সংস্কৃতগন্ধী, সমাসবদ্ধ পদের স্বাভাবিক প্রকাশ লক্ষণীয়। যেমন- 'সন্ধ্যারক্তরাগসম', 'জয়স্তম্ভ মূঢ়সম' ইত্যাদি।

'ফাঁকি', পলাতকা, ১৯১৮

'যাত্রীঘরে বিছানাটা দিলেম পেতে।

বলে দিলেম, "বিনু, এবার চুপটি করে ঘুমোও আরামেতে।"

প্ল্যাটফরমে চেয়ার টেনে,

পড়তে শুরু করে দিলেম ইংরেজি এক নভেল কিনে এনে।

গেল কত মালের গাড়ি, গেল প্যাসেঞ্জার,

ঘণ্টা তিনেক হয়ে গেল পার।

এমন সময় যাত্রীদের দ্বারের কাছে

বাহির হয়ে বললে বিনু, 'কথা একটা আছে।'

বৈশিষ্ট্য:

'পলাতকা', 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে মূলত গদ্যকবিতার প্রকাশ লক্ষণীয়। এই ফাঁকি কবিতায় চলিত গদ্যরীতি ব্যাবহারের পাশাপাশি সাবলীলভাবে ইংরেজি শব্দ নভেল, প্ল্যাটফর্ম, প্যাসেঞ্জার ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

খ) নাটক:

গীতিনাট্য

'মায়ার খেলা' (১৮৮৮)

'অমরের মনে ক্রমে প্রমদার প্রতি প্রেম প্রবল হইয়া উঠতে লাগিল। প্রমদারও হৃদয়ের ব্যাকুলতা বাড়িয়া উঠিল, বাহিরের চঞ্চলতা দূর হইয়া গেল। সখীরা প্রমদার অবস্থা বুঝিতে পারিল। কিন্তু পূর্বদৃশ্যে অমরের অস্পষ্ট উত্তর এবং ভাব গতিক দেখিয়া অমরের প্রতি সখীদের বিশ্বাস নাই।'

বৈশিষ্ট্য:

এই অংশে সাধুরীতির ব্যবহার লক্ষ করি, মায়ার খেলা রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচনা, পরবর্তী পর্যায়ের নাটকে ভাষারীতি বদলে যেতে দেখা যাবে। রবীন্দ্রনাথ বিবর্তনের ধারায় নিজের ভাষাশৈলীকে বারবার পরিবর্তন করেছেন, তারই সাক্ষ্য বহন করছে তাঁর রচিত সাহিত্য।

'অচলায়তন' (১৯১২)

'মহাপঞ্চক- এই বানরটার উপর রাগ করাও শক্ত। দেখো পঞ্চক তুমি তো আর বালক নও- তোমার এখন বিচার করে দেখার বয়স হয়েছে।'

'পঞ্চক - সচেষ্ট করবার তো কথা নয়। তুমি যে নিজের গুনেই দৃষ্টান্ত হয়ে বসে আছ। ওর মধ্যে আমার চেষ্টার তো কিছু মাত্র দরকার হয় না'

'দ্বিতীয় ছাত্র — পঞ্চক, তুমি আর বৃথা সময় নষ্ট কোরো না। তোমার কাছে কেউ বেশি আশা করেনা। অন্তত শৃঙ্গভেরিব্রত, কাকচক্ষুপরীক্ষা, ছাগলোমশোধন, দ্বাবিংশপিশাচভয়ভঞ্জন এগুলো তো জানা চাইই; নইলে তুমি অচলায়তনের ছাত্র বলে লোক সমাজে পরিচয় দেবে কোনলজ্জায়?'

'মুক্তধারা' (১৯২২)

'...প্রজাদের মনের ভাব আপনার জানা চাই। যুবরাজকে খুঁজে পেতে যতই বিলম্ব হচ্ছে ততই তাদের অধৈর্য্য এত বেড়ে উঠেছে যে, যখন তাঁকে পাওয়া যাবে তখন তারা শাস্তির জন্য অপেক্ষা করবে না।'

চণ্ডালিকা (১৯৩৩)

'প্রকৃতি- সমস্ত শ্রাবস্তীনগরে আর কি কোথাও জল ছিল না, মা। এলেন কেন এই কুয়োরই ধারে। একেই তো বলি নতুন জন্মের পালা। আমাকে দান করতে এলেন মানুষের তৃষ্ণা মেটাবার শিরোপা। এই মহাশূন্যই খুঁজছিলেন।'

বৈশিষ্ট্য:

এই নাটকগুলিতে চলিত রূপের ব্যবহার লক্ষণীয়। সহজ বাক্য গঠন রীতি এই নাটকটিতে অনুসৃত হয়েছে। বিষয় অনুযায়ী, কর্তা অনুযায়ী বাক্যগঠন প্রণালীর ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

কাব্যনাট্য

'বিসর্জন' (১৮৯০)

'গোবিন্দমাণিক্য।

ক্ষুদ্র ছাগ শিশু
দরিদ্র এ বালিকার স্নেহের পুত্তলি,
তারে নাকি কেড়ে আনিয়াছ মা'র কাছে
বলি দিতে? এ দান কি নেবেন জননী
প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে?'

'জয়সিংহ।

তোমার মন্দিরে এ কী নূতন সংগীত
ধ্বনিয়া উঠিল আজি, হে গিরিনন্দিনী,
করুণাকাতর কণ্ঠস্বরে! ভক্তহৃদি
অপরূপ বেদনায় উঠিল ব্যাকুলি।
হে শোভনে, কোথা যাব এ মন্দির ছেড়ে?
কোথায় আশ্রয় আছে?'

বৈশিষ্ট্য:

কাব্যনাট্য কাব্যের ভঙ্গি বা স্টাইলে রচিত নাটক। এই অংশেও সাধু ও চলিত রীতির সহাবস্থান লক্ষ করি। যেমন- জয়সিংহের বয়ানে আছে, ছেড়ে, ধ্বনিয়া, উঠিল প্রভৃতি শব্দ পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে।

গ) গদ্য:

'জীবনস্মৃতি'

"ঘর ও বাহির" (১৩১৯ বঙ্গাব্দ)

'পুষ্করিনী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমাদের সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলো ঝুড়ি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রমক্রমে বিশ্বের নিয়ম ঠেকে গেছে। দৈবাৎ সেখানে যেন স্বপ্নযুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে।'

'আমাদের পরিবারে যে ধর্ম সাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না- আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই। আমি কেবল আমার হৃদয়াবেগের চুলাতে হাপর করিয়া করিয়া মস্ত একটা আগুন জ্বালাইতেছিলাম। সে কেবল অগ্নি পূজা; সে কেবলি আহুতি দিয়া শিখাকেই বাড়াইয়া তোলে; তাহার আর কোনো লক্ষ্য ছিল না।'

'জাপান যাত্রী' (সবুজপত্র-এ প্রকাশ বৈশাখ ১৩২৩ বঙ্গাব্দ থেকে বৈশাখ ১৩২৪ বঙ্গাব্দ)

'পৃথিবীর অধিকাংশ জাতি মিথ্যা করেও আপনার রক্তের অবিমিশ্রতা নিয়ে গর্ব করে; জাপানিদের মনে এই অভিমান কিছু মাত্র নেই, জাপানিদের সঙ্গে ভারতীয় জাতির মিশ্রণ হয়েছে, এ কথার আলোচনা তাদের কাগজে দেখেছি এবং তা নিয়ে কোনো পাঠক কিছুমাত্র বিচলিত হয়নি।'

'...যে জাতির যেদিকে যতখানি বড় হবার শক্তি আছে সেদিকে তাকে ততখানি বড়ো হয়ে উঠতে দিতে বাধা দেওয়া যে স্বজাতিপূজা থেকে জন্মেছে তার মতো এমন সর্বনেশে পূজা জগতে আর কিছুই নাই। এমন বর্বর জাতির কথা শোনা যায় যারা নিজের দেশের দেবতার কাছে পরদেশের মানুষকে বলি দেয়; আধুনিককালের স্বজাতীয়তা তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ানক জিনিস, সে নিজের ক্ষুধার জন্যে এক-একটা জাতিকে-জাতি, দেশকে-দেশ দাবি করে।'

'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩০)

'মস্কৌতে একটি কৃষি ভবন দেখতে গিয়েছিলুম, ওটা ওদের ক্লাবের মতো। রাশিয়া সমস্ত ছোটো বড়ো শহরে এবং গ্রামে এরকম আবাস ছড়ানো আছে। এ-সব জায়গায় কৃষিবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে উপদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে; যারা নিরক্ষর তাদের পড়াশোনা শেখানোর উপায় করেছে; এখানে বিশেষ বিশেষ ক্লাসে বৈজ্ঞানিক রীতিতে চাষ করার ব্যবস্থা কৃষাণদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়।'

'তাই যখন শুনলুম রাশিয়াতে জনসাধারণের শিক্ষা প্রায় শূন্য অঙ্ক থেকে প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেছে, তখন

মনে মনে ঠিক করলুম, ভাঙা শরীর আরো যদি ভাঙে তো ভাঙুক, ওখানে যেতেই হবে। এরা জেনেছে অশক্তকে শক্তি দেবার একটিমাত্র উপায় শিক্ষা অন্ন স্বাস্থ্য শান্তি সমস্তই এরই পরে নির্ভর করে। ফাঁকা Law and Order নিয়ে না ভরে পেট, না ভরে মন। অথচ তার দাম দিতে গিয়ে সর্বস্ব বিকিয়ে গেল।'

বৈশিষ্ট্য:

এই তিনটি গদ্যের উদাহরণ পাঠ করলেই বোঝা যাবে সময়ের বিবর্তনের ধারায় কীভাবে রবীন্দ্রনাথের রচনাশৈলী পরিবর্তিত হয়েছে। 'জীবনস্মৃতি'তে যেমন সাধু গদ্যরীতির প্রভাব দেখতে পাই, তেমনি 'জাপানযাত্রী' বা 'রাশিয়ার চিঠি' তে চলিত গদ্যরীতির প্রভাব লক্ষ করি।

ঘ) গল্প:

'পোস্টমাস্টার' (১২৯৮ বঙ্গাব্দ)

'যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষা বিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল। তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন, একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল।'

'শাস্তি' (১৩০০ শ্রাবণ)

সর্বজ্ঞ কথক - 'ছিদাম বাতায়ন হইতে এই অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত প্রতিদিনের পৃথিবীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, সমস্তই স্বপ্নের মতো বোধ হইতেছে।'

জজসাহেব -'জজ সাহেব তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন "তুমি যে অপরাধ স্বীকার করিতেছ তাহার শাস্তি কী জান?" '

চন্দরা- 'চন্দরা কহিল "ওগো তোমার পায়ে পরি তাই দাও না সাহেব, তোমাদের যাহা খুশি করো আমার তো আর সহ্য হয় না।" **'স্ত্রীর পত্র' (শ্রাবণ ১৩২১)**

'আমার মেয়েটি তো সন্ধ্যাতারার মতো ক্ষণকালের জন্য উদয় হয়েই অস্ত গেল। আবার আমার নিত্যকর্ম এবং গরু বাছুর নিয়ে পড়লুম। কিন্তু বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশথ গাছের অঙ্কুর বের করে; শেষকালের সেইটুকু থেকে ইঁটকাঠের বুকের পাঁজর বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমার সংসারের পাকা বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোটো একটুখানি জীবনের কণা উড়ে এসে পড়ল; তারপর থেকে ফাটল শুরু হল।'

'ল্যাবরেটরি' (আশ্বিন ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ)

'অধ্যাপক বলিলেন "ওজন ঠিক রেখে চলা, মরালগামিনীদের ধাতে নেই। ওরা এদিকে ঝুঁকবে, ওদিকে ঝুঁকবে। কিছু মনে কোরো না মিসেস মল্লিক, ওদের মধ্যে দৈবাৎ মেলে যারা খাড়া রাখে মাথা, চলে সোজা চালে।"

'সেতো পূর্বেই বলেছি। মেট্রিয়ার্কি রক্তের মধ্যে হাম্বাধ্বনি জাগিয়ে তোলে, হতবুদ্ধি হয়ে যায় বৎসরা। এ তো হল নাম্বার ওয়ান। তারপরে রেবতী যখন সরকারের বৃত্তি নিয়ে কেমব্রিজে যাবে স্থির হল, আবার এসে পড়ল সেই পিসিমা হাউহাউ শব্দে। রেবতীকে খুব খানিকটা গাল দিলুম, বললুম স্টুপিড, বললুম ডান্স বলল ইম্‌বেসীল। ব্যস ইখানেই খতম। রেবু এখন ভারতীয় ঘানিতে ফোঁটা ফোঁটা তেল বার করছেন।'

বৈশিষ্ট্য:

প্রথম দুটি উদাহরণের ক্ষেত্রে সাধু গদ্যরীতির প্রকাশ লক্ষণীয়, 'স্ত্রীর পত্র' এবং 'ল্যাবরেটরি' চলিত রীতিতে রচিত। 'স্ত্রীর পত্র'-এ রাঢ়ী উপভাষার কথ্যরীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন 'পড়লুম'। সমগ্র গল্প জুড়েই মৃণালের আত্মকথনে ক্রিয়াপদের এই রূপ ব্যবহৃত হয়েছে। আমার 'ল্যাবরেটরি'তে বিষয়গত চাহিদার কারণে বেশ কিছু ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন মেট্রিয়ার্কি, স্টুপিড, ইম্‌বেসীল। পাশাপাশি 'মরালগামিনী'-র মতো তৎসম শব্দের ব্যবহারও লক্ষণীয়। সময় পরিবর্তনের ধারায় রবীন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গি কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়। 'পোস্টমাস্টার'-এ তৎসম শব্দ ব্যবহার, জটিল বাক্য গঠনের যে রীতি লক্ষ করা যায় তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে।

ঙ) উপন্যাস

'চোখের বালি' (১৯০৩ সালে গ্রন্থ আকারে প্রকাশ)

বিনোদিনী- 'ঠাকুরপো, কোথায় তোমার ব্যথা লাগিতেছে, তাহা আমি জানি কিন্তু যাহার শ্রদ্ধা আমি পাইয়াছিলাম এবং যাহার ভালোবাসা পাইলে আমার জীবন সার্থক হইত, তাহার কাছে এই রাত্রে ভয়-লজ্জা সমস্ত বিসর্জন দিয়ে ছুটিয়া আসিলাম, সে যে কত বড়ো বেদনায় তাহা মনে করিয়া একটু ধৈর্য্য ধরো। আমি সত্যই বলিতেছি, তুমি যদি আশাকে ভালো না বাসিতে, তবে আমার দ্বারা আজ আশার এত বড় সর্বনাশ হইত না।'

'চতুরঙ্গ' (১৯১৬)

'জগমোহনের নাস্তিক ধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল যে, নাস্তিকের পক্ষে লোকের ভালো করার মধ্যে অন্য যে-কোন রস থাক একটা প্রধান রস এই ছিল যে, নাস্তিকের পক্ষে লোকের ভালো করার মধ্যে নিছক নিজের লোকসান ছাড়া আর কিছুই নাই- তাহাতে না আছে পুণ্য, না আছে পুরস্কার, না আছে কোনো দেবতা বা শাস্ত্রের বকশিশের বিজ্ঞাপন বা চোখরাঙানি।'

'আর একবার দামিনী যখন এমনি করিয়াই নত হইয়াছিল তখন শচীশ তার মধ্যে কেবল মাধুর্য্যকেই দেখিয়াছিল, মধুরকে দেখে নাই। এবারে স্বয়ং দামিনী তার কাছে এমন সত্য হইয়া উঠিয়াছে যে গানের পদ, তত্ত্বের উপদেশ সমস্তকে ঠেলিয়া সে দেখা দেয়, কিছুতেই তাকে চাপা দেওয়া চলে না।'

বৈশিষ্ট্য:

এই দুটি উপন্যাসে সাধু গদ্যরীতি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে অহেতুক, গম্ভীর তৎসম শব্দ প্রয়োগের আতিশয্য দেখা যায় না।

'শেষের কবিতা' (গ্রন্থপ্রকাশ ১৯২৯ সাল)

'অমিত অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে, তাদের সৌন্দর্য পূর্ণিমা রাত্রির মতো, উজ্জ্বল অথচ আচ্ছন্ন; লাবণ্যর সৌন্দর্য সকালবেলার মতো, তাতে অস্পষ্টতার মোহ নেই, তার সমস্তটা বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। তাকে মেয়ে করে গড়বার সময় বিধাতা তার মধ্যে পুরুষের একটা ভাগ মিশিয়ে দিয়েছেন; তাকে দেখলেই বোঝা যায় তার মধ্যে কেবল বেদনার শক্তি নয় সেইসঙ্গে আছে মননের শক্তি।'

'চার অধ্যায়' (১৯৩৪)

'এতক্ষণে সেই মেয়ের প্রকাশ হল, যে মেয়েটি রিয়ল এইটুকুতেই ধরা পড়ে দেশোদ্ধারের রঙ্গমঞ্চে তুমি রোম্যান্টিক। যে সংসারে কাঁসার থালায় দুধভাত মাছের মুড়ো তারই কেন্দ্রে বসে আছ তালপাতার পাখা হাতে।'

বৈশিষ্ট্য:

এই দুটি উপন্যাসে চলিত গদ্যরীতি ব্যবহৃত হয়েছে। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে ইংরেজি শব্দের ব্যবহারও লক্ষণীয়। বিবর্তনের ধারায় রবীন্দ্রনাথের ভাষারীতির পার্থক্যের স্বরূপটি বোঝার চেষ্টা করলাম।

চ) প্রবন্ধ:

"বাংলা শব্দতত্ত্ব", 'ভাষার কথা', (বৈশাখ ১৩২৩ বঙ্গাব্দ)

'এমন সময় যারা শিক্ষার সঙ্গে ভাষার মিল ঘটাইতে বসিলেন বাংলার চলিত গদ্য লইয়া কাজ চালানো তাদের পক্ষে অসম্ভব হইল। শুধু যদি শব্দের অভাব হইত তবে ক্ষতি ছিল না কিন্তু সবচেয়ে বিপদ এই যে, নূতন শব্দ বানাইবার শক্তি প্রাকৃত বাংলার মধ্যে নাই। তার প্রধান কারণ বাংলায় তদ্ধিত প্রত্যয়ের উপকরণ ও ব্যবহার অত্যন্ত সংকীর্ণ। 'প্রার্থনা' সংস্কৃত শব্দ তার খাটি বাংলা প্রতিশব্দ 'চাওয়া'। 'প্রার্থিত' 'প্রার্থনীয়' শব্দের ভাবটা যদি ওই খাঁটি বাংলায় ব্যবহার করিতে যাই তবে অন্ধকার দেখিতে হয়। আজ পর্যন্ত কোনো দুঃসাহসিক 'চায়িত' ও 'চাওনীয়' বাংলায় চালাইবার প্রস্তাব মাত্র করেন নাই। মাইকেল অনেক জায়গায় সংস্কৃত বিশেষ্যপদকে বাংলার ধাতুরূপের অধীন করিয়া নূতন ক্রিয়াপদে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু বাংলায় এ পর্যন্ত তাহা আপদ আকারেই রহিয়া গেছে, সম্পদরূপে গণ্য হয় নাই।'

"প্রাচীন সাহিত্য", 'শকুন্তলা' (আশ্বিন ১৩০৯)

'টেম্পেস্টে শক্তি, শকুন্তলায় শান্তি, টেম্পেস্টে বলের দ্বারা জয়, শকুন্তলায় মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধি; টেম্পেস্টে অর্ধপথে ছেদ, শকুন্তলায় সম্পূর্ণতায় অবসান। টেম্পেস্টের মিরান্দা সরল মাধুর্যে গঠিত, কিন্তু সে সরলতার প্রতিষ্ঠা অজ্ঞতা-অনভিজ্ঞতার উপরে।'

"প্রাচীন সাহিত্য", 'কাদম্বরী' (মাঘ ১৩০৬)

'তাঁহারা দেখিলেন, আর্যবেশধারী ধবলবসন একটি বৃদ্ধ চণ্ডাল অগ্রে আসিতেছে, তাহার পশ্চাতে কাকপক্ষধারী

একটি বালক স্বর্ণশলাকানির্মিত পিঞ্জরে বিহঙ্গকে বহন করিয়া আনিতেছে। এবং তাহার পশ্চাতে নিদ্রার ন্যায় লোচনগ্রাহিণী এবং মূর্ছার ন্যায় মনোহারা একটি তরুণ যৌবনা কন্যা অসুরগৃহীত অমৃত অপহরণের জন্য কপটপটুবিলাসিনী বেশধারী ভগবান হরির ন্যায় সে শ্যামবর্ণা, যেন একটি সঞ্চারিণী ইন্দ্রনীলমণিপুত্তলিকা; ...।'

"লোকসাহিত্য", 'ছেলে ভুলানো ছড়া ১', (আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১)

'আমরা ছড়াকে মেঘের সঙ্গে তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল। বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ু স্রোতের যদৃচ্ছাভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলাবিচার শাস্ত্রের বাহির, মেঘ- বিজ্ঞানও শাস্ত্র নিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে।'

"কালান্তর", 'হিন্দুমুসলমান' (শ্রাবণ, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ)

(শ্রী কালিদাস নাগকে লিখিত চিঠি)

'আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে। আমি যখন প্রথম আমার জমিদারি-কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম, কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বসতে দিতে হলে জাজিমের এক প্রান্ত তুলে দিয়ে সেইখানে তাকে স্থান দেওয়া হত। ভারতবর্ষের এমনই কপাল যে, এখানে হিন্দুমুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচার প্রবল, আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল।'

বৈশিষ্ট্য:

'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধ ছাড়া প্রতিটি প্রবন্ধেই ভাষার সাধুরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। তবে বিষয়গত ভিন্নতার নিরিখে শব্দ প্রয়োগ বাক্য গঠনের ভিন্নতা লক্ষণীয়। 'ভাষার কথা', 'ছেলে ভুলানো ছড়া' এবং 'কাদম্বরী'-র ভাষা ব্যবহারের পার্থক্য থেকেই স্পষ্ট হয় যে বিষয়গত ভিন্নতার নিরিখে বাক্য গঠন আলাদা হয়। কাদম্বরী প্রবন্ধে বহুল পরিমাণে তৎসম, সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন 'কপটপটুবিলাসিনী', 'ইন্দ্রনীলমণিপুত্তলিকা', 'স্বর্ণশলাকানির্মিত' ইত্যাদি।

১১.৮.২ রচনাশৈলী, ভাষাচর্চার ধারা:

এক দীর্ঘ সময় ধরে রবীন্দ্রনাথের ভাষা-সাহিত্যচর্চার ধারা প্রবাহিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় ভাষাশৈলীর বহুমাত্রিকতা, ভাষাবৈচিত্র্য, গদ্যভঙ্গির বৈচিত্র্য স্বভাবতই লক্ষণীয়। কালগত-বিষয়গত-পর্যায়গত-সংরূপগত বৈচিত্র্য রচনারীতির ক্ষেত্রে পার্থক্য সূচিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রাথমিক পর্বে সাধু গদ্যরীতি ব্যবহার করেছেন। তবে এই সাধু গদ্যরীতি ব্যবহারের নানান মাত্রা ভেদ, পার্থক্য লক্ষণীয়।

পরবর্তীতে সবুজপত্র পত্রিকা ও প্রমথ চৌধুরীর হাত ধরে বাংলা সাহিত্যে চলিত গদ্যরীতি ব্যবহারের সূচনা ঘটে। এই পর্বের রবীন্দ্রনাথ চলিত ভাষারীতি ব্যবহারের এক নতুন পর্যায়, নতুন দিক উন্মোচন করেন। চলিত

ভাষায় সাহিত্যিক গদ্য নির্মাণের পথ সুচারু এবং সুগম হয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গি, রচনাশৈলী সমকালীন সাহিত্যিকদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। বহুক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের গদ্য-পদ্যচর্চার স্টাইল অনুকরণের প্রবণতাও লক্ষণীয়। এই সূত্রে রবীন্দ্র-অনুসারী সাহিত্যিক সমাজের আবির্ভাব ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ রচিত বিভিন্ন সংরূপগুলির কিছু নির্বাচিত দৃষ্টান্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাষাশৈলী, বাংলা ভাষাচর্চার ধারা, বিবর্তনের স্বরূপটি বোঝার চেষ্টা করলাম।

১১.৯ বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র গদ্যচর্চা:

ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপনের সূত্রে বাংলা ও বাঙালির শিক্ষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতি চর্চায়, আর্থ-সামাজিক চিন্তা, চেতনায় এক নবযুগের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। উনিশ শতকের এক নবচেতনা, আধুনিক শিক্ষা সম্প্রসারণের সূত্রে মধ্যযুগীয় চিন্তা, কুসংস্কার, অজ্ঞতা, অন্ধ আনুগত্য, প্রথাবদ্ধতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন করার মানসিকতা তৈরি হয়। এই আধুনিক শিক্ষা, পাশ্চাত্য দর্শন চিন্তন-মনন, প্রগতিশীল ভাবনা সমাজ-জীবনে বহু সংস্কার এবং পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছিল। ইতিহাস সাক্ষী নতুনের নির্মাণ যজ্ঞে প্রবীণ এবং নবীনের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। একদিকে কলুষতামুক্ত সমাজ গঠন, শিক্ষার প্রসার, যুক্তিবাদী-প্রগতিশীল সমাজ গঠনের বাসনা, অন্যদিকে রক্ষণশীল সমাজ কর্তৃক প্রচলিত প্রথা, সংস্কার রক্ষার তাগিদে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে।

এই সময় বিবিধ মতের প্রকাশ প্রচারের জন্য প্রয়োজন হয় একটি গণমাধ্যমের। শিক্ষিত বাঙালি সমাজের বহুমাত্রিক চিন্তন-আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যেই অনিবার্য হয়ে ওঠে সংবাদ-সাময়িকপত্রের জন্ম। উনিশ-বিশ শতক জুড়ে সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি সংগঠনে সাময়িকপত্র অন্যতম প্রধান গণমাধ্যমের ভূমিকা পালন করেছিল। বাঙালির সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি সংগঠনে সংবাদ-সাময়িকপত্রের গুরুত্ব আলোচনার প্রেক্ষিতে সাময়িকপত্রের ভাষার গঠন সম্পর্কে আলোচনা করব। আমরা বোঝার চেষ্টা করব সংবাদ-সাময়িকপত্রের ভাষায় কোন নিজস্বতা প্রকাশ পেয়েছে নাকি সমকালের ভাষাভঙ্গিই অনুসৃত হয়েছে।

সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি সংগঠনে সংবাদ-সাময়িকপত্রের ভূমিকা প্রসঙ্গে গবেষকদের মতামত:

বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র সংক্রান্ত আলোচনার অন্যতম গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রকে 'রেনেসাঁসের ফল' বলেই মনে করছেন। তিনি বলেছেন,

'... ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সকল দিক্ সম্বন্ধেই সে-যুগের সংবাদপত্রের মধ্যে বহু অমূল্য উপকরণ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।'

আনিসুজ্জামান 'মুসলমান বাংলার সাময়িকপত্র' গ্রন্থে সমাজ-সংস্কৃতি সংগঠনে সাময়িকপত্রের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছেন

'দেড়শ বছর ধরে সমাজ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলা সাময়িকপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলা গদ্যের বিকাশে, সাহিত্যের নতুন আঙ্গিক প্রবর্তনে, সামাজিক ভাবান্দোলনের সৃষ্টিতে, রাজনৈতিক

চেতনার সঞ্চারে এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত রুচি নির্মাণে সাময়িকপত্রের দান অপরিসীম।'

পার্থ চট্টোপাধ্যায় উনিশ শতকের নবপর্যায় সংগঠনে পত্র-পত্রিকার গুরুত্ব প্রসঙ্গে 'বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ' গ্রন্থে বলেছেন যে উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস বাংলা সংবাদপত্রেরই ইতিহাস। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কথা থেকেই স্পষ্ট হয় তিনি নবজাগরণ এবং সাময়িকপত্রের ইতিহাসকে সম্পৃক্ত করে দেখতে চেয়েছেন।

১১.৯.১ সংবাদ-সাময়িকপত্রের সাধারণ পরিচয়:

প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা সাময়িকপত্র ছিল সংবাদাশ্রিত। সংবাদ-সাময়িকপত্রের কাজ ছিল সংবাদ পরিবেশন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা। উনিশ শতকের প্রথম পর্বে ধর্ম ও সমাজ প্রসঙ্গই ছিল মুখ্য আলোচ্য। একদিকে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে অপরদিকে খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধে হিন্দু বা ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ প্রচারের স্বার্থে সংবাদ-সাময়িকপত্র পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসেই সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন দেখা যায়। উনিশ শতকে নব্য জ্ঞান আহরণ প্রসঙ্গে, পরিবর্তিত সমাজ সম্পর্কে পাঠককে ওয়াকিবহাল করার প্রশ্নে সংবাদপত্রের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এই সময় থেকেই দৈনিক, সাপ্তাহিক, অর্ধসাপ্তাহিক, মাসিক, পাক্ষিক, বার্ষিক নানা আঙ্গিকের সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হতে শুরু করে।

১১.৯.২ পত্র-পত্রিকার প্রথম যুগ:

বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠার প্রথম দশকেই সংবাদপত্র প্রকাশের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। ওলন্দাজ বণিক উইলিয়াম বোল্টস প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেন, যদিও শেষ পর্যন্ত সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। মুদ্রণের ক্ষেত্রে প্রথম বাংলা হরফ ব্যবহৃত হয় ১৭৭৮ সালে হুগলিতে নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড-এর 'A Grammar of Bengali Language' বইতে। এর প্রায় চল্লিশ বছর বাদে মিশনারিদের উদ্যোগে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ পায়। প্রাথমিক পর্বে মিশনারিদের পত্রিকা প্রকাশ সম্পর্কে কোম্পানির মনোভাব ইতিবাচক ছিল না। মিশনারিদের সমাজ সংস্কার, ধর্মপ্রচার কোম্পানির নীতির পক্ষে বাধা সৃষ্টি করছিল। জেমস হিকি পরিচালিত ১৭৮০ সালের Bengal Gazette ছিল বাংলা ভূখণ্ডের প্রথম সাময়িকপত্র। সংবাদপত্রে সরকার বিরোধী বক্তব্য প্রকাশের অপরাধে জেমস হিকিকে বহুবার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়েছিল।

১১.৯.৩ সংবাদ-সাময়িকপত্র পরিচালনার আঙ্গিক:

উনিশ শতকে বাংলা গদ্যচর্চা এবং সংবাদ সাময়িকপত্রের বিকাশ পরস্পরের পরিপূরক। উনিশ শতকের নয়া মতবাদ মতাদর্শের প্রসারে, প্রচারে গদ্যই অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। উনিশ শতকের প্রাথমিক পর্বে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্র গুলির উদ্দেশ্য ছিল সংবাদ পরিবেশন। সমাজ-সংস্কার মূলক লেখা-পত্র প্রকাশ থেকে বিভিন্ন মতাদর্শ প্রচারে, জনমত গঠনে, পরবর্তীতে সাহিত্য এবং সাহিত্যিকদের বিকাশে সাময়িকপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সম্বাদ কৌমুদী পত্রিকায় ব্রাহ্মধর্মচর্চা থেকে সমাচার দর্পন-এর খ্রিস্ট ধর্মপ্রচার, সমাচার চন্দ্রিকা-র রক্ষণশীল মতপ্রচার, জ্ঞানান্বেষণ-এর প্রগতিশীলতার চর্চা, নারী স্বাধীনতার পক্ষে-বিপক্ষে যেমন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার আবির্ভাব ঘটেছে; তেমনি নব্য বাংলা সাহিত্য চর্চায় পত্র-পত্রিকার ভূমিকাও

উল্লেখ্য। এই পর্বে সংবাদ-সাময়িকপত্র বহুমাত্রিক মতপ্রকাশের আধার হয়ে উঠেছিল। যেমন ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর-এর হাত ধরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র থেকে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের গদ্যচর্চার সূচনা হয়। বঙ্গদর্শনএর হাত ধরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিপুল সাহিত্য কীর্তি প্রকাশ পায়। ঠাকুরবাড়ির সাধনা, ভারতী, বালক যেমন রবীন্দ্রনাথ সহ সমকালের বিভিন্ন সাহিত্য প্রতিভার বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। পরবর্তীতে প্রবাসী, সবুজপত্র, কল্লোল-কালিকলম-কে কেন্দ্র করে বহু লেখক-সাহিত্যিকদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই সময় পত্রিকা নির্ভর লেখকগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে।

কেবল সাহিত্যিক সৃষ্টি নয় সংবাদ-সাময়িকপত্রের হাত ধরে বহুমাত্রিক মতামত প্রকাশ পেয়েছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রক্ষণশীল চর্চা, হিন্দু পুনর্জাগরণ চর্চার ধারা থেকে রামমোহন রায়ের একেশ্বরবাদচর্চা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র-দের প্রগতিশীল ভাবনা, পরবর্তী পর্যায়ে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের সাক্ষী হয়ে থেকেছে সংবাদ-সাময়িকপত্র।

১১.৯.৪ সংবাদ-সাময়িকপত্রের ভাষা ব্যবহার:

সংবাদ-সাময়িকপত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য মতামত প্রকাশ ও প্রচার। মানুষের কাছে নিজ মতামত পৌঁছে দেওয়ার তাগিদে সংবাদ-সাময়িকপত্রে সহজ বাক্য গঠন, সরল ভাষাব্যবহারে প্রবণতা লক্ষণীয়। সাধারণত বিষয়ের সাপেক্ষে সাধুরীতির গদ্য প্রকাশের দৃষ্টান্তই লক্ষণীয়। বেশ কিছু ক্ষেত্রে লেখকদের নিজস্ব ভঙ্গিমা বিভিন্ন সংবাদ-সাময়িকপত্রের ভাষাশৈলী হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ধর্ম ভাবনা থেকে সমাজ সংস্কার, সাহিত্য সৃষ্টি থেকে রক্ষণশীল-প্রগতিশীল মতামত প্রকাশের আধার হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে সংবাদ-সাময়িকপত্র।

বিষয় বৈচিত্র্যের সূত্রে সংবাদ-সাময়িকপত্রে ভাষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন ধর্ম বিষয়ক পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে তত্ত্বধর্মী আলোচনার প্রভাব বেশি মাত্রায় লক্ষণীয়। তত্ত্বমূলক বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে বাক্য গঠন সাধারণত খানিক জটিল। অপরদিকে রঙ্গরস ধর্মী পত্রিকায় সহজ ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষণীয়। অনেক ক্ষেত্রে ভাষা সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব মনোভাব পত্রপত্রিকা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে। আমরা যেমন দেখেছি প্যারীচাঁদ মিত্র জনসাধারণের কাছে তাঁর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য করে তোলার স্বার্থে 'আলালের ঘরের দুলাল' লেখার ক্ষেত্রেও সহজ ভাষায় ব্যবহার করেছেন। তেমনি প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত মাসিক পত্রিকার ক্ষেত্রেও সহজ ভাষা ব্যবহারের রীতি অনুসৃত হয়েছে।

আমরা উনিশ শতকের কয়েকটি নির্বাচিত পত্রিকার ভাষাশৈলী, দৃষ্টান্ত আলোচনার মাধ্যমে সমকালের ভাষারীতি, ভাষাশৈলীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করব।

১১.৯.৫ প্রথম সংবাদ-সাময়িকপত্র

দিগ্‌দর্শন:

১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর মিশনারিদের উদ্যোগে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের পরিচালনায় প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র দিগ্‌দর্শন-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। দেশবাসীর মধ্যে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কৌতূহল জাগিয়ে তোলাই ছিল

পত্রিকাটির উদ্দেশ্য। দিগ্‌দর্শন-এর আলোচনার মূল ঝোঁক ইতিহাস, এছাড়াও ভূগোল, বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনাও লক্ষণীয়। ১৮২১ সালে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

দৃষ্টান্ত:

'ইঙরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা এই তিনভাগ এক মহাদ্বীপে আছে। ইহারা কোন সমুদ্র দ্বারা বিভক্ত নয় কিন্তু আমেরিকা পৃথক এক দ্বীপ, প্রথম দ্বীপ হইতে সে দুই হাজার ক্রোশ অন্তর। অনুমান হয় তিন শত ছাব্বিশ বছর হইল আটশত আটানব্বই শ্যালে আমেরিকা প্রথম জানা গেল তাহার পূব্বে আমেরিকা কোন লোক কর্তৃক জানা ছিল না।'

এই অংশে প্রথম যুগের বাংলা গদ্যচর্চার স্বরূপই প্রকাশ পেয়েছে। দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার রীতি, যতিচিহ্ন ব্যবহারের দুর্বলতা, প্রথম যুগের বানানের নিদর্শন লক্ষণীয়। যেমন 'শ্যালে- সালে', 'ইঙরোপ- ইউয়োপ', 'আসিয়া-এশিয়া' ইত্যাদি।

বাঙ্গাল গেজেটি

পত্রিকাটির প্রকাশকাল এবং সম্পাদক সম্পর্কে মতানৈক্য থাকলেও বেশিরভাগ গবেষকদের মতে এই পত্রিকাটি বাঙালি সম্পাদিত প্রথম সংবাদ-সাময়িকপত্র। বাঙ্গাল গেজেটি-র কোন সংখ্যা আবিষ্কৃত না হওয়ায় এই পত্রিকার ভাষা সম্পর্কে সম্যখ ধারণা পাওয়ার কোন উপায় নেই। অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ, বিজ্ঞাপন থেকে পত্রিকাটির প্রকাশকাল, বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তৈরি হয়। গবেষকদের মতে এই পত্রিকাটির প্রকাশকাল ১৮১৮ সালের জুলাই মাস। আইন সংক্রান্ত সংবাদ, সরকারি বিজ্ঞাপন, সরল বাংলায় স্থানীয় লোকেদের জীবনের ঘটনা প্রকাশ পেত।

১১.৯.৬ বহুমাত্রিক ধারার পত্র-পত্রিকা:

ক) ধর্মপ্রচারমূলক পত্রিকা:

ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে সংবাদ-সাময়িকপত্র ব্যাপক জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। খ্রিস্টান মিশনারিদের খ্রিস্ট ধর্মপ্রচারের পক্ষে, ধর্মান্তরিতকরণের বিপক্ষে, হিন্দু আচার-সংস্কারের বিরুদ্ধে, হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষার্থে, ব্রাহ্মধর্মের পক্ষে-বিপক্ষে, মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচারে সমস্ত ক্ষেত্রেই সংবাদ-সাময়িকপত্রের অবস্থান উল্লেখযোগ্য।

প্রাথমিক পর্বে মিশনারিদের উদ্যোগে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পত্রিকা প্রকাশ পায়। খ্রিস্টান মিশনারিদের হিন্দু ধর্মের ওপর আক্রমণের ফলে শিক্ষিত হিন্দু বাঙালি আপন ঐতিহ্য রক্ষায় সক্রিয় হয়। একেশ্বরবাদ থেকে ব্রাহ্ম দর্শন, স্মৃতি সংহিতার শাস্ত্র বাক্যকে সমাজ সংস্কারের উপযোগী হিসেবে উপস্থাপন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনচর্চা উনিশ-বিশ শতক জুড়ে এমত বিভিন্ন মতের আলোচনা পত্র-পত্রিকায় লক্ষণীয়।

খ্রিস্টধর্ম প্রচারমূলক:

খ্রিস্টধর্ম প্রচার বিষয়ক পত্রিকাগুলিতে খ্রিস্টধর্মের প্রচার, মহানুভবতা, খৃস্টের জীবন- দর্শনের ছবি প্রকাশ পেয়েছে। এই পত্রিকাগুলির মধ্যে গসপেল ম্যাগাজিন (১৮১৯), মঙ্গলোপাখ্যান (১৮৪৩), সত্যার্ণব (১৮৫০), বঙ্গমিহির (১৮৭৩), খ্রীষ্টীয় বান্ধব (১৮৭৯), কৃপাবার্তা (১৮৯০) উল্লেখ্য। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের পাশাপাশি মিশনারিদের দ্বারা প্রচারিত পত্রিকাগুলি এদেশে প্রচলিত ধর্মমতের (বিশেষত হিন্দু ও মুসলিম) বিরুদ্ধে মতামত প্রচার করত। এর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম রুখে দাঁড়ান রাজা রামমোহন রায়, ১৮১৯ সালে প্রকাশ করেন ব্রাহ্মণ সেবধি। উনিশ শতকের সমাজ পরিচালনায়, নতুন ধর্মভাবনার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল ব্রাহ্মধর্ম।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারমূলক:

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক সভা-সমিতিতে আলোচিত বিষয়গুলি সদস্য এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সংবাদ-সাময়িকপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আদি ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র হিসেবে ১৮৪৩ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হিসেবেধর্মতত্ত্ব (১৮৬৪) সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র হিসেবে তত্ত্বকৌমুদী (১৮৭৮) প্রকাশিত হয়। এছাড়াও, ১৮৬৩ সালে ঢাকাপ্রকাশ, ১৮৬৪ সালে ধর্মপ্রচারিণী ইত্যাদি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

হিন্দুধর্ম প্রচারমূলক:

হিন্দু রক্ষণশীল সমাজ ব্রাহ্ম ও খ্রিস্টানদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে নিজধর্ম প্রচারে অংশগ্রহণ করে। হিন্দুশাস্ত্রবাক্য পালন, হিন্দুধর্ম রক্ষা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের মতো সামাজিক অনুষ্ঠান পালনে, বিধবাবিবাহ-সতীদাহের মতো আইনের বিরোধিতায় কিছু পত্র-পত্রিকাগুলি রক্ষণশীল সমাজের মুখপত্রের ভূমিকা পালন করেছিল। এ প্রসঙ্গে ভবানীচরন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাচার চন্দ্রিকা (১৮২২), হিন্দু ধর্মানুরঞ্জিকা (১৮৪৬), হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভার মুখপত্র হিসেবে হিন্দু হিতৈষিণী (১৮৬৫), কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের ধর্মপ্রচারক (১৮৭৭), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচার (১৮৮৪), অক্ষয়চন্দ্র সরকারের নবজীবন (১৮৮৪), ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাসদেব (১৮৮৬), যদুনাথ মজুমদারের হিন্দু পত্রিকা (১৮৯৪) ইত্যাদির ভূমিকা অবশ্য উল্লেখ্য।

সমাচার দর্পন (খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারমূলক)

দিগ্‌দর্শন-এর সাফল্যের পর ক্লার্ক মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড বাংলায় প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। এই পত্রিকার মূল আলোচ্য দেশীয় সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, আইন-কানুন, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের খবর প্রকাশ, সতীদাহ প্রথা রদ বিষয়ক তর্ক সংগঠনে, স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল সমাচার দর্পণ। সমাচার দর্পন খ্রিষ্ট ধর্মপ্রচার এবং সেই স্বার্থে হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা প্রকাশে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল।

প্রথম সংখ্যা প্রকাশ পায় ১৮২৮ সালে ২৩ শে মে। প্রথম সম্পাদক ছিলেন জেসি মার্শম্যান। পত্রিকাটির প্রথম পর্যায়ে ১৮১৮ সাল থেকে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত পরিচালিত হয়। পত্রিকাটি দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৮৪২ সাল থেকে ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত প্রকাশ পায়। তৃতীয় পর্যায় পত্রিকাটি ১৮৫১ সাল থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত প্রকাশ পায়।

প্রতি শনিবার পত্রিকার প্রকাশ পেত। প্রথম তিন সপ্তাহ বিনামূল্যে এই সংবাদপত্র বিতরণ করা হয়। মার্শম্যান পত্রিকাটির সম্পাদক হলও দেশিয় পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে এ পত্রিকাটি পরিচালিত হত। পত্রিকাটির প্রথম অবস্থায় জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সম্পাদকীয় বিভাগের কাজে যুক্ত ছিলেন। বাংলা ভাষা না জানা লোকেদের জন্য 'আখবারে শ্রীরামপুর' নামে ফারসিতে সংস্করণ প্রকাশ পেত। ১৮২৯ সাল থেকে বাংলা, ইংরেজি দু ভাষায় পত্রিকার সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৮৩২ সাল থেকে জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখে সপ্তাহে দুদিন করে পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দৃষ্টান্ত:

'...পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যাদি শাস্ত্র অতিশয় ব্যুৎপন্ন এবং ইঙ্গরেজী ও হিন্দী ও বাঙ্গলা ও নানাদেশীয় ভাষা ও লিপিতে বিদ্বান ছিলেন। গত চারি বৎসরের মধ্যে আমাদের সমাচার দর্পণ কি ছাপাখানার অন্য২ পুস্তকে যে সকল শব্দ বিন্যাসের রীতি ও ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা লিখনের পরিপাট্য তাহা কেবল তৎকতৃ ক প্রকাশিত হইয়াছে।'

'কএক দিবস হইল অষ্টাদশ বর্ষীয়া এক স্ত্রী কলিকাতার নিমতলার ঘাটে স্নানার্থে আসিয়াছিল তাহাতে ক্রীড়াচ্ছলে কুতূহলে সন্তরণদ্বারা অবলীলাক্রমে গঙ্গা পার হইয়া গেল ইহা অনেকেই চমৎকৃত হইয়াছে।'

সমাচার দর্পন উনিশ শতকের প্রথম পর্বের ভাষাশৈলীর দৃষ্টান্তই বহন করছে।

ব্রাহ্মণ সেবধি- (মিশনারিদের ঘৃণা প্রচারের বিরুদ্ধে, একেশ্বরবাদ প্রচারের পক্ষে)

'শিবনাথ শর্মা' নামে লেখা প্রকাশ পেলেও এই পত্রিকার মুখ্য লেখক রামমোহন রায়। সমাচার দর্পণ-এ মিশনারিদের উদ্যোগে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে মতামত প্রচারিত হলে মিশনারিদের ঘৃণা ছড়ানোর বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ সেবধি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন রামমোহন।

দৃষ্টান্ত:

'কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কত ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনারি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্ত রূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রিষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধমর্রে নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়' রামমোহন রায়ের গদ্যবৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পেয়েছে এই অংশে। যতিচিহ্নের অভাব, দীর্ঘ বাক্য গঠন, আন্বয়িক জটিলতা, তৎসম শব্দের ব্যবহার, সাধুরীতির গদ্য রচনার দৃষ্টান্তই লক্ষণীয়।

খ) সমাজ-সংস্কার মূলক ভাবনা প্রকাশক:

সম্বাদ কৌমুদী-

সমাচার দর্পণ খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি পরধর্মের হীনতা প্রমাণে প্রবৃত্ত হলে বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের

অভাব অনুভূত হয়। লোকহিত সাধনের উদ্দেশ্যে তাঁরাচার দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বাদ কৌমুদী নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রতি মঙ্গলবারে পত্রিকাটি প্রকাশ পেত।

রামমোহন সহমরণের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেই পত্রিকাটি। রামমোহনের মতামতের বিরোধিতায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকার সংসর্গ ত্যাগ করেন। এবং পরবর্তীতে সম্বাদ কৌমুদী এর বিপরীতে সনাতন দলের প্রতিভূ হিসেবে সমাচার চন্দ্রিকা প্রকাশ করেন।

পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের নমুনা-বিদেশি ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি মাতৃভাষা শিক্ষার দাবি, বাবু সংস্কৃতির বিরোধিতা, বিকৃত রুচির যাত্রা, নাটক যা যুব সমাজের চিন্তায় বিরূপ প্রভাব ফেলে তা বন্ধের আবেদন করা, সরকারি অর্থশালী স্কুল খোলার দাবি ইত্যাদি। এই দাবিগুলি প্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল এবং পরিচ্ছন্ন। রামমোহন পরিচালিত এই পত্রিকা দুটি খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্ম প্রচার, ভারতীয় ধর্মবিরোধিতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।

গ) রক্ষণশীল ধারার পত্রিকা:

সমাচার চন্দ্রিকা

সতীদাহ প্রথা রোধ করার উদ্দেশ্যে রামমোহন রায় আন্দোলনে সামিল হলে রক্ষণশীল সমাজ প্রচলিত সংস্কার রক্ষার দাবিতে রাস্তায় নামে একাংশ। হিন্দু ধর্ম প্রচলিত নিয়ম, রক্ষণশীল প্রথা সংরক্ষণের নিমিত্ত একটি প্রচারমূলক পত্রিকার প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনের সাপেক্ষে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে সাপ্তাহিক সমাচার চন্দ্রিকা প্রকাশ পায়। খ্রিস্টধর্ম প্রচার, হিন্দু ধর্মের অবমাননার বিরুদ্ধে রামমোহন ব্রাহ্মণ সেবধি, সম্বাদ কৌমুদী প্রকাশ করেন অন্যদিকে রামমোহনের সমাজ-সংস্কার মূলক ভাবনার বিপরীতে প্রকাশ পায় সমাচার চন্দ্রিকা।

প্রাচীনপন্থী ধারার এই পত্রিকাটি প্রকাশ পায় ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তীতে দ্বি-সাপ্তাহিক রূপে এবং ১৮২৪ সাল থেকে দৈনিক সংবাদপত্র হিসেবে প্রকাশ পায়। রক্ষণশীল মতের সমর্থক হওয়ায় হিন্দু পত্রিকা হিসেবে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এই পত্রিকাটি। রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনের বিপক্ষে হিন্দু রক্ষণশীল মত প্রচারের উদ্দেশ্যে বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চন্দ্রিকা প্রকাশ পায়। পার্থ চট্টোপাধ্যায় 'বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ' বইতে চন্দ্রিকা সম্পর্কে বলেন

'উনিশ শতকের প্রগতিমুখী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার প্রবল দ্বন্দ্ব হিসাবে চিহ্নিত হলেও চন্দ্রিকার সামাজিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। সামাজিক আন্দোলনের গোঁড়ামির দিকটি বাদ দিলে পত্রিকাটির অর্থনৈতিক চিন্তা এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিদেশি রাজশক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীকার চিন্তা এবং দেশীয় শিক্ষা প্রসারে আগ্রহ সৃষ্টি প্রভৃতি অবদানের কথা অস্বীকার করা যায় না।'

দৃষ্টান্ত:

'সমাচার চন্দ্রিকা পত্র এ প্রদেশে প্রায় সচিত্র বিখ্যাত হইয়াছে এদন্নগরের প্রায় যাবতীয় শিষত বর্দ্ধিঞ্চু লোকে

গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং কাশী কটক, ঢাকা রংপুর মুরশিদাবাদ, যশোহর নদীয়া বর্দমান হুগলী প্রভৃতি জেলায় গয়া থাকে এ পত্রের গ্রাহক এক্ষণে প্রায় পাঁচশত জন হইয়াছেন যদ্যপি কোন মহাজনাদির কোন বস্তুর ক্রয় বিক্রয়াদির সংবাদ প্রকাশাবশ্যক হয় চন্দ্রিকা পত্রে সংবাদ দিলেও অনায়াসে এ দেশের সর্বত্র রাষ্ট্র হইতে পারে...।' (বিজ্ঞাপনের উদাহরণ)

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নকশা রচনায় সহজ, সাবলীল গদ্য রচনার নজির দেখা গেলেও পত্রিকার গদ্য খানিক জটিল। দীর্ঘবাক্য পাঠকের ক্ষেত্রে সহজসাধ্য নয়।

ঘ) সভা-সমিতির উদ্দেশ্য প্রচারমূলক:

তত্ত্ববোধিনী

তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র হিসেবে এই পত্রিকাটি প্রকাশ পায়। ১৮৩৯ সালে তত্ত্ববোধিনী সভা এবং ১৮৪৩ সালে ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র রূপে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ পায়। অক্ষয় কুমার দত্ত এবং টাকির প্রসন্নকুমার ঠাকুর পরিচালিত বিদ্যাদর্শন থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে একটি পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্ত। ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত এক দীর্ঘ সময় তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮৫৬), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৫৯ — ৬০), আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ (১৮৬২), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০, ১৮৮৪ ১৯০১ ১৯০৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১১-১৯১৪) সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর ১৯৩১ সালে পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়। পত্রিকাটি দীর্ঘ ৮৯ বছর ধরে পরিচালিত হয়েছে।

পত্রিকার উদ্দেশ্য:

তত্ত্ববোধিনী সভার সংবাদ, আলোচিত বিষয় ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী, ব্রাহ্ম ধর্মচর্চাকারী সদস্যদের কাছে সহজে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ধর্মতত্ত্ব আলোচনা মূল উদ্দেশ্য হলেও অক্ষয়কুমার দত্ত বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা পত্র পত্রিকার পাতায় সংযুক্ত করেছিলেন। ব্রাহ্মমতের প্রচার এবং প্রসার, রামমোহন রায়ের জীবদ্দশায় ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারার্থে রচিত বইগুলি প্রচারের উদ্দেশ্যে, মূলত লোকের জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ, চরিত্র শোধনের ইচ্ছা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশ পায়।

দৃষ্টান্ত:

'স্বদেশানুরাগ না থাকলে স্বদেশের হিত সাধন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আনন্দের বিষয় এই যে এক্ষণে আমাদিগের দেশীয় লোকের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ ক্রমশ উদ্দীপ্ত হইতে দেখা যাইতেছে। স্বদেশানুরাগ যতই বৃদ্ধি হইবে ততই তাহাদের দ্বারা স্বদেশের উপকার সাধন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। ভারতের উদ্ধার কেবল এই স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধির প্রতি নির্ভর করেতেছে।'

'তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য পরস্পর দূর দূর স্থায়ী প্রযুক্ত সভার সমুদয় উপস্থিত কার্য্য সর্বদা জ্ঞাত হইতে

পারেন না, সুতরাং ব্রহ্ম জ্ঞানের অনুশীলন এবং উন্নতি কি প্রকার হইবেক?'

'কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্ম জ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।'

সাধুরীতির গদ্যশৈলী অনুসৃত হয়েছে পত্রিকায়। তত্ত্বমূলক আলোচনায় গুরুগম্ভীর শব্দচয়ন, জটিল যৌক্তিক গদ্য রচনার শৈলী লক্ষ করা যায়।

বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা

এ পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র হিসেবে এই মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ পায় ১৮৫৫ সালে। সভ্যতার বিষয় বাল্যবিবাহ, জাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা এগুলি ছিল পত্রিকার মূল আলোচ্য বিষয়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত 'সভ্যতার বিষয়' প্রবন্ধটির একটি উদাহরণ

'কোন কোন স্থানে বারয়ারি পূজোপলক্ষে বৎসর বৎসর যাহা ব্যয় করিয়া থাকেন, তদ্বারা অনায়াসে পাঠশালা সংস্থাপিত করিয়া বালকবৃন্দের জ্ঞানানুশীলন, লোকদিগের গমনাগমনোযোগী বর্ত, দুর্দান্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পীড়া শান্তির নিমিত্ত ঔষধালয়, পিপাসাতুর ব্যক্তিদিগের তৃষ্ণা শান্তির নিমিত্ত পুষ্করিণী খনন ইত্যাদি পরমোপকারজনক সৎকর্মানুষ্ঠান করিয়া দেশোজ্জ্বল করিতে পারে এই সমস্ত সামান্য বিষয়ে অস্মদ্দেশীয় লোকেরা বিস্মিত হইয়া রহিয়াছেন।'

ঙ) উনিশ শতকের প্রগতিশীল চর্চা:

উনিশ শতকের পাশচাত্য শিক্ষার প্রসারে মধ্যবিত্তের অংশগ্রহণ পর্বটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আধুনিক শিক্ষা প্রসারের সূত্রেই উনিশ শতকের বাঙালি জনজীবনে, চিন্তায়-চেতনায় আধুনিকতা, প্রগতিশীলচর্চার আমদানি ঘটে। এই পর্বে শিক্ষিত বাঙালি আধুনিক চিন্তন-মনন সম্পন্ন সমাজ গঠন, হিত সাধনের লক্ষ্যে, সমাজ-সংস্কারের লক্ষ্যে সাহিত্যকে হাতিয়ার করেছিলেন। এই পর্বে সংবাদ-সাময়িকপত্রই মত প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হয়ে ওঠে।

জ্ঞানান্বেষণ — (ইয়ংবেঙ্গলগোষ্ঠীর মুখপত্র)

ইংরেজি শিক্ষিত উদারবাদী বাঙালি যুবক শ্রেণির দ্বারা পরিচালিত এই পত্রিকাটি সমকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ১৮৩১ সালে ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র রূপে সাপ্তাহিক এই পত্রিকাটি প্রকাশ পায়। পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সকলেই ছিলেন ডিরোজিও ছাত্র এবং ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর সদস্য। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় পরবর্তীতে রসিককৃষ্ণ মল্লিক, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীশংকর ভট্টাচার্য প্রমুখরা পত্রিকা পরিচালনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পত্রিকাটির গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন '...ত্রিশের দশকে ইয়ংবেঙ্গল দলের সমাজ চিন্তার

প্রতিফলন এই কাগজে পাওয়া যাবে। ত্রিশের দশকের প্রগতিপন্থী জনমত গড়ে তোলার জন্য যে চেষ্টা রামমোহন, প্রসন্নকুমার, দ্বারকনাথ প্রমুখেরা করেছিলেন জ্ঞানান্বেষণে এসে তা আর একটি মোড় নেয়।'

পত্রিকার উদ্দেশ্য:

মানুষের জীবনযাপন সম্পর্কে মতামত প্রকাশ, আধুনিক জীবন সংগঠন, হিত সাধনের চেষ্টা, স্কুল পাঠ্য বিভিন্ন বিষয় বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা এই ছিল মুখ্যত পত্রিকার উদ্দেশ্য। তৎকালে সম্বাদ তিমিরনাশক, সম্বাদ ভাস্কর প্রকৃতি পত্রিকার বিরোধীতার সামিল হয় এই পত্রিকাটি।

ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী পত্রিকার মাধ্যমে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করতে চেয়েছিল। জাতিকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা সংকীর্ণ চেতনা মুক্ত এবং উদার, সুস্থ, আধুনিক প্রগতিপন্থী কুসংস্কার বর্জিত সমাজ বা জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে পত্রিকাটি প্রকাশ পায়। স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে, বিজ্ঞানশিক্ষা, আধুনিক পাশচাত্য দর্শন শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিল পত্রিকাটি। ফলে রক্ষণশীল সমাজের দ্বারা সমালোচিত হতে হয় পরিচালকমণ্ডলীকে।

দৃষ্টান্ত:

'কাজলা পাড়াতেও দুই ব্রাহ্মণ ঘটকের কথা এখানে কন্যা কিনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু বহুকালের পর সন্তানাদি উৎপত্তি করিয়া শেষে টের পাইলেন ঘটকেরা প্রতারণাপূর্বক মালাকারের কন্যা বিবাহ দিয়াছেন। ভাটপাড়াতেও এক ব্রাহ্মণ ক্রীত কন্যা বিবাহ করেন এবং বহুকাল সহবাস করিয়া শেষে জানিলেন পোদ-জাতীয় বৈষ্ণবের কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা শহরের মধ্যে এইরূপ স্ত্রী অনেক আছে।'

জ্ঞানান্বেষণের একটি বিজ্ঞাপনের উদাহরণ দেখে নেব

'আপনকারদিগের আনুকুল্যে জ্ঞানান্বেষণপত্র আরম্ভাবধি এ পর্য্যন্ত যে কেবল গৌড়ীয় ভাষায় চলিতেছি এইক্ষণে আমাদের বোধ হয় যে তাহার পরিবর্ত করিয়া আগামী সপ্তাহাবধি কেবল গৌড়ীয় এবং ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায় প্রকাশ করিব কেন না যদিও বঙ্গভাষাজ্ঞ মহাশয়দিগের কেবল গৌড়ীয় ভাষাপাঠে তৃপ্তি হইতে পারে তথাপি জ্ঞানান্বেষণগ্রাহক ইউরোপীয় মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকের গৌড়ীয় ভাষাভ্যাসে তাদৃক মনোযোগ না থাকাতে তাঁহারদের উত্তমানুরক্তি হওয়ার ব্যাঘাত হয়'

প্রথম যুগের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য গঠন রীতির জটিলতা এই অংশ লক্ষণীয়। পুরাতন বানান রীতি, দীর্ঘবাক্যের প্রকাশ এই অংশে লক্ষণীয়। পরবর্তীতে সময় এবং অর্থের অভাবে পত্রিকাটি দশ বছর চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একে বাঙালি সাংবাদিকতার ইতিহাসে দুর্ঘটনা বলে চিহ্নিত করেছেন।

চ) নারী স্বাধীনতার পক্ষে পত্রিকার ভূমিকা:

আধুনিক সমাজ সংগঠন, প্রগতিশীল সমাজ গঠনের লক্ষ্যে, সমাজ-সংস্কারমূলক আলোচনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় ছিল স্ত্রীশিক্ষা, নারী-স্বাধীনতা। প্রশ্ন জাগে উনিশ শতকে নারীপ্রগতি, নারীশিক্ষা এতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল কেন? পাশচাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নব্যযুবক, চাকুরীজীবী, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী যুবক এই

সময় যোগ্যসঙ্গিনীর সন্ধান এবং নির্মাণ করতে চেয়েছে। সঙ্গিনীকে আধুনিকতার আদর্শে পুষ্ট করার জন্যই নারীশিক্ষা, নারীস্বাধীনতা, নারী-প্রগতি আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠল।

মাসিক (প্রগতিপন্থী, স্ত্রীশিক্ষা প্রচারক)

১৮৫৪ সালে অগাস্ট মাসে মাসিক পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশ পায়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র এবং রাধানাথ শিকদার। সম্পাদকদের দুজনেই ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই পত্রিকার প্রথম বর্ষ সপ্তম সংখ্যা থেকে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরে দুলাল' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পায়। সহজ, সরল ভাষায় বাংলা গদ্য রচনা এবং তার বিকাশই ছিল প্যারীচাঁদ মিত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। গদ্য রচনার এই শৈলী মাসিক পত্রিকা রচনার ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছিলেন সম্পাদকদ্বয়। মাসিক পত্রিকার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে সম্পাদক বলেন 'এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয় তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।'

এই বক্তব্য থেকেই পত্রিকার ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়।

গদ্যরীতির নিদর্শন:

'ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুলিনে মেয়ে দিলে যেমন বাপ মার মুখ উজ্জ্বল হয়, সেই রূপ স্পাটবাসিদের মধ্যে ছেলে লড়াইয়ে মরিলে বাপ মার মুখ উজ্জ্বল হয়। এই নিমিত্তে ছেলে যখন লড়াইয়ে যাইত, মা আপনি তাহার হাতে ঢাল তলবার দিতেন।'

'লোকে কি শ্রাদ্ধের জোরে স্বর্গে যায়? তাহা হইলে কেবল বড় মানুষেরা স্বর্গে যাইত, কারণ তাহাদিগেরই শ্রাদ্ধ বড় ঘটায় হইয়া থাকে। গরীবদিগের শ্রাদ্ধ কখন হয়, কখন বা না হয়, যখন হয় তখন অতি কষ্টেই হয়, ...।'

'ধন কিম্বা শ্রাদ্ধের জোরে লোকে স্বর্গ গমন করে না। মানবেরা ধনী লোককে সম্মান করিয়া থাকে বটে কিন্তু ঈশ্বরের সম্মুখে যেমন বড় মানুষ তেমনি গরীব, উভয়ই সমান। ধনী হউক বা নির্ধন হউক, তিনি পাপীকে দণ্ড করেন, কেবল পুণ্যবানকে স্বর্গে যাইতে দেন।"

সাধারণের বিশেষত অন্তঃপুরবাসিনীদের শিক্ষা দেওয়া, সাহিত্যে পাঠে আগ্রহী করে তোলা, সহজ সরল ভাষায় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান বিতরণই ছিল এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। পত্রিকায় মূলত সাধুরীতি ব্যবহৃত হলেও সহজ ভাষার, সাধারণের উপভোগ্য গদ্যরচনার রীতি অনুসৃত হয়েছে। ভাষায় একপ্রকার সংমিশ্রণ রীতি ছিল মাসিক পত্রিকার বিশেষত্ব।

বামাবোধিনী পত্রিকা:

বামাবোধিনী মহিলাদের পাঠ উপযোগী একটি মাসিক পত্রিকা হিসেবে এই পত্রিকাটি প্রকাশ পায়। উমেশ চন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় এই পত্রিকাটি ১৮৬৩ সালে প্রকাশ পায়। ভাষাজ্ঞান,ভূগোল, খগোল ইতিহাস জীবনচরিত,

বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য রক্ষা নীতি ও ধর্ম, গৃহ চিকিৎসা, শিশুপালন গৃহকার্য্য সংক্রান্ত বিষয় পত্রিকাটির অন্যতম উপজীব্য।

মূলত মেয়েদের শিক্ষাদানের দাবিতে সরব হয়েছিল পত্রিকাটি। মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা হলেও অন্তঃপুরের মধ্যে বিদ্যা-শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়াই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। ভ্রম কুসংস্কার দূরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রকৃত জ্ঞান প্রদান এই ছিল পত্রিকাটির উদ্দেশ্য। '...যাহাতে তাহাদের উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকল উপযুক্ত বিষয়ে পরিচালিত হয় এবং যাহাতে তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল লাভ করিতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে।'

পত্রিকার উদ্দেশ্যে আলোচনার সাপেক্ষে পত্রিকার ভাষা ধরন সম্পর্কেও বোধ তৈরি হয় 'বামাগণের বোধ সুলভ জন্য বামাবোধিনীর বিষয়গুলি যত কোমল ও সরল সাধুভাষায় লেখা যায় আমরা তাহার চেষ্টা ক্রটি করিব না। কথাবার্তা এবং উপন্যাস বা উদাহরণচ্ছলে অনেক বিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া যায়, অতএব অনেক স্থলে সে উপায়ও অবলম্বিত হইবে।'

সংস্কৃত শ্লোকের পাশাপাশি বাংলায় শ্লোক লেখা থাকতো 'কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।' উমেশচন্দ্র দত্ত, সুকুমার দত্ত, উষাপ্রভা দত্ত, সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়-রা ভিন্ন সময় পত্রিকার দায়িত্ব সামলেছেন।

পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য নারী-পুরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা

'স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই লইয়াই জনসমাজ হইয়াছে। অতএব স্ত্রীদের পরিত্যাগ করে কেবল পুরুষদের উন্নতি করিলে- তাহাতে জনসমাজের উন্নতি হইবে নাস্ত্রীগণ সকলে বিদ্যাবতী না হইলে এ দেশের কখনোই প্রকৃত মঙ্গল হইবে না ইহা কয়জন ব্যক্তির মনে বিশ্বাস হইয়াছে।

'কিন্তু আক্ষেপের বিষয়ে এই যে, বালকদিগের বিদ্যোৎসাহ বর্দনার্থ যেরূপ মধ্যে মধ্যে পুরস্কারাদি প্রদত্ত হইয়া থাকে, বামাগণের শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ দানার্থ তাদৃশ্য কিছুই দেখা যায় না; কেবল বিদ্যালয়স্থ বালিকাগণ মধ্যে মধ্যে পুস্তকাদি পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া কিছু পরিমাণে উৎসাহিত হয়।'

ছ) পত্র-পত্রিকায় সাহিত্য চর্চা:

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, স্কুল বুক সোসাইটি, হিন্দু কলেজের দিনগুলি ছিল বাংলা ভাষা-গদ্য চর্চার প্রাথমিক পর্ব। ইংরেজ রাজকর্মচারীদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলা পাঠ্যপুস্তক নির্মাণের প্রকল্প গৃহীত হয়। এই সময় সংস্কৃত পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় আধুনিক বাংলা ভাষা সংগঠিত হয়। এই নবগঠিত বাংলা ভাষার গঠন সম্পর্কে অনেকে অভিযোগ করেন, তবে একথা অবশ্যস্বীকার্য্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই বাংলা ভাষা সাবলীল হয়ে উঠেছে। দিগ্দর্শন থেকে আজকের হাল আমলে সংবাদ-সাময়িকপত্র বাংলা গদ্যের বিবর্তনের স্মারক বহনকারী উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। আমরা উনিশ শতকের বহুল আলোচ্য কতকগুলি পত্রিকার নিদর্শন আলোচনার ভিত্তিতে ভাষাশৈলীর পাঠ নেওয়ার চেষ্টা করব।

সংবাদ প্রভাকর:

বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। বহু আলোচক, গবেষক একথা স্বীকার করেছেন যে প্রভাকর ঈশ্বর গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্তি। প্রথমে এটি সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে প্রতি সপ্তাহে শুক্রবারে প্রকাশ পেত। সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে পথ চলা শুরু হয় ১৮৩১ সালে। ১৮৩৬ সাল থেকে পত্রিকাটি বারত্রয়িক রূপে (অর্থাৎ সপ্তাহে তিন দিন করে), ১৬৩৯ সাল থেকে প্রভাকর দৈনিক সংবাদপত্র হিসেবে প্রকাশ পায়।

সংবাদ প্রভাকর পরিচালনার কাজে গুপ্ত কবির সঙ্গে সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছিলেন পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুর। এই পত্রিকাটি প্রথমে চোর বাগানের একটি মুদ্রাযন্ত্র থেকে প্রকাশ পেত। পরবর্তীতে ঠাকুরবাড়িতে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। সংবাদ প্রভাকর সে যুগের উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র হিসেবে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। দেশ-বিদেশের সংবাদ ছাড়াও ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য নানা বিষয়ে আলোচনা প্রকাশ পেত। সংবাদ প্রভাকর-এর হাত ধরে সমকালের বহু সাহিত্যিকদের বিকাশ ঘটেছিল। রাধাকান্ত দেব, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ সাহিত্যিকদের বিকাশে সংবাদ প্রভাকর-এর ভূমিকা অবশ্য আলোচ্য। সংবাদ প্রভাকর-এর পাতা প্রাচীনপন্থী এবং নবীনপন্থী দুই ধারা সাহিত্যিকদের রচনায় পুষ্ট হয়েছে। প্রাচীনপন্থী লেখকদের মধ্যে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, গৌরীশংকর তর্কবাগীশ, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, প্রগতিপন্থীদের মধ্যে নীলরত্ন হালদার, গোপালকৃষ্ণ মিত্র, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, হরিমোহন সেন-দের নাম উল্লেখযোগ্য।

সংবাদ প্রভাকর এর উদাহরণ আলোচনার মাধ্যমে সংবাদপত্রের ভাষাশৈলী সম্পর্কে যেমন ধারনা তৈরি হবে তেমনি তৎকালে বঙ্গভাষা গঠন সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতের স্বরূপ প্রকাশ পাবে। সম্পাদক বলেন

'অধুনা বঙ্গভাষায় গদ্য রচনার যদ্রুপ সুপদ্ধতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, ইহা ৪০ বৎসর পূর্বে এতদ্রুপ ছিল না, কেবল মৃত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয় রচনার এক নতুন সূচনা করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, ইহার পূর্বে সাধু ভাষায় কিরূপ শব্দ সংযোজন করিতে হয় তাহা বড় বড় পণ্ডিতেরাও জানিতেন না...।'

পত্রিকাটি সাহিত্যরস পরিবেশনে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তেমনি ভারতচন্দ্র থেকে হরু ঠাকুর, ভোলা ময়রা, অ্যান্টনি কবিয়াল সহ বহু কবি এবং কবিয়ালদের জীবনী ও রচনা প্রকাশেও গুরুত্ব প্রদান করেছে। এগুলি সংরক্ষণের জন্য ঈশ্বর গুপ্ত বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে কারণ এগুলি সংরক্ষণ না হলে বাংলা সাহিত্য থেকে এই সাহিত্য কীর্তি গুলি বিলুপ্ত হয়ে যেত।

দৃষ্টান্ত :

'এইখানে ঘুড়ির লক দাবার ছক পাশার পাষ্টি, ইয়ারের ফষ্টি, তবলার ধিড়িং, সেতারের পিড়িং, গেরাবুর ছক্কা, লোটন লক্কা ইত্যাদি শুদ্ধ প্রাচীনদিগের আমোদের অলঙ্কার হইয়াছে। যুবকেরা বেকনের এসে, সেক্সপিয়ারের প্লে, কালিদাসের কাব্য, গীতার শ্লোক, শ্রুতির অর্থ এবং বস্তু নির্ণয় প্রভৃতি সমুদয় সদ্বিষয়ের আলোচনা করিতেছে।'

'ইদানীন্তন বঙ্গভাষা নব যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছে, এই সময় যাঁহারা অনুশীলন কল্পে অনুরাগি হইতেছেন তাঁহারা অনায়াসেই অভিপ্রেত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, তাহাতে দেশেরও অশেষ প্রকার উপকারের সম্ভবনা'

সাধুরীতির গদ্য নিদর্শন মূলত প্রকাশ পেয়েছে, তবে চলিত বা কথ্য গদ্যরীতির কিছু নিদর্শনও লক্ষণীয়। যেমন- ঘুড়ির লক দাবার ছক পাশার পাষ্টি, ইয়ারের ফষ্টি, তবলার ধিড়িং, সেতারের পিড়িং, গেরাবুর ছক্কাইত্যাদি।

বঙ্গদর্শন:

প্রথম প্রকাশ-১৮৭২ সালে বা ১২৭৯ বঙ্গাব্দ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনায় শেষ সংখ্যা প্রকাশ পায় ১৮৭৫ সালে বা ১২৮২ বঙ্গাব্দ। পরবর্তীকালে কিছু বছর (১২৮৪ বঙ্গাব্দ থেকে ১২৮৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত) সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন প্রকাশ পায়। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী পর্যায়ে পত্রিকার প্রকাশ অনিয়মিত হয়। চন্দ্রনাথ বসুর উদ্যোগে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় ১২৯০ বঙ্গাব্দের কার্তিক থেকে মাঘ সংখ্যা পর্যন্ত বঙ্গদর্শন প্রকাশ পায়। এর পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ১৩০৮ থেকে ১৩১২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত নবপর্যায় বঙ্গদর্শন প্রকাশ পায়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বেশিরভাগ প্রবন্ধ, উপন্যাস এই পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। যেমন- প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকেই 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশ পায়। এছাড়াও 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১২৮০ বৈশাখ সংখ্যা), 'রজনী' (১২৮১-১২৮২) 'চন্দ্রশেখর' (১২৮০- ১২৮১), 'রাধারানী' (১২৮২), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১২৮২), পরবর্তীতে 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ'-ও এই পত্রিকায় প্রকাশ পায়। 'বন্দেমাতরম্' গানও এখানেই প্রকাশ পায়। বঙ্কিমের 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল', 'আমরা বড়লোক', 'ভারত কলঙ্ক' প্রবন্ধ, অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'উদ্দীপনা' (প্রবন্ধ) , হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'ভারতমহিলা', দীনবন্ধু মিত্রের 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' প্রকাশ পায়। বঙ্কিম ছাড়াও কৃষ্ণচন্দ্র ভটাচার্য্য, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, প্রাণনাথ পণ্ডিত, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখের লেখায় বঙ্গদর্শন সমৃদ্ধ হয়েছে।

বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত লেখার উদাহরণ:

'আমাদিগের হিন্দুধর্মকে সনাতন ধর্ম বলিবার কারণ এই যে, এই ধর্ম বেদমূলক। যাহা বেদে নাই, তাহা হিন্দুধর্মরে অন্তর্গত কিনা সন্দেহ। যদি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কোন গুরুতর কথা বেদে না থাকে, তবে হয় বেদ অসম্পূর্ণ, না হয় সেই কথা হিন্দুধর্মান্তর্গত নহে।'

'কাব্যের লক্ষণ যাহাই হউক না কেন, আমাদিগের বিবেচনায় অনেকগুলিন গ্রন্থ, যাহার প্রতি সচরাচর কাব্যনাম প্রযুক্ত হয় না, তাহাও কাব্য। মহাভারত রামায়ণ ইতিহাস বলিয়া খ্যাত হইলেও, তাহা কাব্য; শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা কাব্য; স্কটের উপন্যাসগুলিকে আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া স্বীকার করি; নাটককে আমরা কাব্য মধ্যে গণ্য করি তাহা বলা বাহুল্য।'

বঙ্গদর্শন সাহিত্যিক-সম্পাদক-সমালোচক বঙ্কিমের প্রকাশক্ষেত্র। এই পত্রিকায় বঙ্কিমের গদ্যভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। সাধুরীতির গদ্যই বঙ্কিমের গদ্যরীতি হলেও বঙ্কিমের হাত ধরে বাক্যগঠন প্রাথমিক স্তরের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে সাবলীল, পাঠ উপযোগী হয়ে ওঠে। উপযুক্তস্থলে যতিচিহ্নের ব্যবহারের ফলে বাংলা গদ্য আন্বয়িক জটিলতা থেকে মুক্ত হয়।

ভারতী (১৮৭৭):

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে পরিচালিত হওয়ায় পত্রিকাটির একটি নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-রা বিভিন্ন সময় পত্রিকার দায়িত্ব সামলেছেন। ঠাকুরবাড়ির এই পত্রিকাটি রবীন্দ্র-প্রতিভা বিকাশের অন্যতম আধার হয়ে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলেন যে বাণী বিদ্যা ও ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই তিনজনের সেবাই ছিল পত্রিকার উদ্দেশ্য। তবে রবীন্দ্রনাথের লেখা কেবল ঠাকুরবাড়ির পত্রিকাতেই প্রকাশ পায়নি নবজীবন, প্রচার, জ্ঞানাঙ্কুর, হিতবাদী পরবর্তীতে প্রবাসী, সবুজপত্র-এ রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু লেখা পত্র প্রকাশ পায়।

ভারতীর পাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহু কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রকাশ পেয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'কবি কাহিনী', 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'জুতা আবিষ্কার', 'নববর্ষা', 'ভানুসিংহের পদাবলী', 'অতিথি' 'ডিটেকটিভ', 'দেনা পাওনা', 'দৃষ্টিদান', 'নষ্টনীড়' প্রভৃতি ছোট গল্প, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', 'কাব্যের উপেক্ষিতা', 'গ্রাম্য সাহিত্য', 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা বিনোদ, অক্ষয় কুমার বড়াল, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, কালিদাস রায়, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নজরুল ইসলাম, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণভাবনী দাস, গিরিবালা দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী প্রমুখ লেখক-লেখিকাদের লেখা প্রকাশ পায়।

রবীন্দ্রনাথের লেখায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ পেয়েছ। সবুজপত্র-এ রবীন্দ্রনাথ চলিত গদ্য রীতি ব্যবহার করেন, তারপূর্বে মূলত সাধুরীতির গদ্যচর্চার নিদর্শনই লক্ষণীয়।

দৃষ্টান্ত:

'দূরব্যাপী, নিস্তরঙ্গ সরসী, লাজুক উষার রক্তরাগে, সূর্য্যের হেমময় কিরণে, সন্ধ্যার স্তর-বিন্যস্ত মেঘ-মালার প্রতিবিম্বে, পূর্ণিমার বিগলিত জ্যোৎস্না ধারায় বিভাসিত হইয়া শৈল-লক্ষ্মীর বিমল দর্পণের ন্যায় সমস্ত দিনরাত্রি হাস্য করিতেছে। ঘন-বৃক্ষ বেষ্টিত অন্ধকার গ্রামটি শৈলমালার বিজন ক্রোড়ে আঁধারের অবগুণ্ঠন পরিয়া পৃথিবীর কোলাহল হইতে একাকী লুকাইয়া আছে!' (ভিখারিণী)

'যখন দেখি যে, লোকে স্বদেশীয় ভাষা অপেক্ষা বিদেশীয় ভাষা অনুশীলনের প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদান করিতেছে, ঐ ভাষা আয়ত্ত করিবার মানসে অনেক বৎসর ক্ষেপণ করিতেছে, তথাপি প্রকৃত রূপে আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না; ...'

জ) অন্যধারার পত্রিকা:

বিবিধার্থ সংগ্রহ

বিবিধার্থ সংগ্রহ সাধারণ এর কাছে সহজ সরল ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে যাবতীয় বিষয় পৌঁছে দিতে চেয়েছিল। বিবিধার্থ সংগ্রহ-কে কেন্দ্র করে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। বাংলায় তৎকালে প্রকাশিত বিভিন্ন

গল্প কবিতার বইয়ের সমালোচনা প্রকাশ পায় যার ভিত্তিতে সমালোচনা সাহিত্যচর্চা বিকাশ পায়। পত্রিকার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলা হয় 'যাহাতে বঙ্গদেশস্থ জনগণের জ্ঞান বৃদ্ধি হয় এমৎ সৎ ও আনন্দ-জনক প্রস্তাব সকল প্রচার করা উক্ত সমাজের মুখ্য কল্প...।'

বিবিধার্থসংগ্রহ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সচিত্র মাসিক পত্র। ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটির অর্থানুকূল্যে ১৮৫১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এই পত্রিকাটি। ইংরেজি Penny Magazine এই পত্রিকাটির আদর্শ। এই পত্রিকার সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রসঙ্গে সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক বলেন 'পুরাবৃত্তেতিহাস প্রাণিবিদ্যা শিল্প সাহিত্যাদি দ্যোতক মাসিক পত্ররূপে'

পত্রিকাটির মূল আলোচ্য বিষয় পুরাবৃত্ত, ইতিহাস, প্রাণিবিদ্যা, শিল্প-সাহিত্য-নীতিকথামূলকরচনা, রহস্য কাহিনি, বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনবৃত্তান্ত ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে রচনায়। বিভিন্ন নতুন ধারার সংবাদ প্রকাশের কারণে পত্রিকাটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'-তে বিবিধার্থে সংগ্রহ পাঠের অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেন 'সেই বড়ো চৌকো বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরে তক্তপোশের উপর চিত হইয়া পড়িয়া নইল তিমি মৎসের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুক জনক গল্প, কৃষ্ণকুমারী উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।' পথের পাঁচালীর অপুর কল্পনার জগতের অন্যতম আধার ছিল এই পত্রিকাটি। অপু বিবিধার্থে সংগ্রহ করেই জানতে পেরেছিল যে শকুনের ডিমের সঙ্গে পারদ মিশিয়ে মুখে রাখলে উঠতে পারা যায়। এই প্রসঙ্গগুলি থেকে পত্রিকাটি জনপ্রিয়তার স্বরূপ বুঝতে পারা যায়।

পত্রিকার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে সম্পাদক নিজেই বলেছেন, 'ব্রহ্মদেশস্থ জনগণের জ্ঞান বৃদ্ধি'র উদ্দেশ্যে আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলের পাঠযোগ্য রচনা প্রকাশের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই কারণে তিনি কোমল ভাষায় নিবন্ধন প্রকাশের কথা বলেন। লেখকের কথা থেকেই জানা যায় প্রস্তাবিত বস্তু সকলের মনোগ্রাহী করে তোলার স্বার্থে নানাবিধ ছবি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পর কিছুদিন কালীপ্রসন্ন সিংহ এই পত্রিকা সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকায় দেশ বিদেশের নানা কাহিনি, অনুবাদ কাহিনি প্রকাশ পেয়েছে। যেমন- গলিবারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, কুকি জাতির বিবরণ, হস্তির বিবরণ, উড্ডীয়মান মৎস, পারসী জাতির বিবরণ, সঙ্গিত মর্ম, হ্রদের বিবরণ, বায়ুর বিবরণ, উৎকলদেশের বিবরণ ইত্যাদি নানান সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে।

দৃষ্টান্ত:

সমকালের গদ্যচর্চার ধারাতেই বহুমুখী সংবাদ প্রকাশ পেয়েছিল এই পত্রিকায়।

'এই দেশে সর্বশুদ্ধ প্রায় ১২,৯৬,৩০০ লোক বসতি করে। তাঁহাদের চরিত্র আপাততঃ একপ্রকার বিদিতই আছে। তাঁহারা নির্বীর্য্য, বুদ্ধিহীন, এবং ধূর্ত; স্বদেশে কোন বিশ্বস্ত উচ্চপদ পায় না, ভিন দেশীয় লোকদিগ দ্বারাই সেই সকল পদ গৃহীত হয়। হিন্দুদের মধ্যে এমত অপরিষ্কৃত জাতি অতি অল্পই দেখা যায়;...'

'বাঙ্গালা কবিদিগের মধ্যে ভারতচন্দ্র রায় প্রণীত কাব্যের বিচার বিশেষ সার্থক বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহা অতি দূরহ ব্যাপার। রায়-গুণাকরের প্রতি লোকের যে প্রকার অনুরাগ ও শ্রদ্ধা, তাঁহার প্রতি প্রতিবাদ প্রকাশ করিলে লোকে সহজেই বিপক্ষ হইবেন;...'

ঝ) রাজনৈতিক পত্রিকা:

সোমপ্রকাশ

১৮৫৮ সালে প্রকাশিত এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। এই পত্রিকা পরিচালনার পরিকল্পনা করেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে, ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে পত্রিকাটি প্রকাশ পায়। দ্বারকানাথের অবসরের পর মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ সম্পাদনার ভাগ গ্রহণ করেন। জানা যায় ১৮৭৮ সালে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টে পত্রিকাটি রাজরোষে পড়ে সাময়িকভাবে বন্ধ হয়। নবকলবরে ১৮৮০ সালে পূর্ণ প্রকাশিত হয়। সাবলীল বাংলায় সরল ভাষায় সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান সমাজতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে পত্রিকায়।

'হিন্দু সমাজ বহুদিন হইতে ব্রাহ্ম সমাজে ভাবগতিক উন্নতি ও অবনতি অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। পূর্বে ব্রাহ্মসমাজের উপর লোকের যে বিদ্বেষ ভাবছিল ক্রমে তা অন্তর্হিত হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ হইতে হিন্দু সমাজ যে কোন উপকার লাভ করেন নাই এ কথা বলিলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। ক্রমে ব্রাহ্ম হিন্দুকে আদর করিতে শিখিয়াছেন'

বহুমাত্রিক চিন্তন চর্চার আধার পত্রিকার উদাহরণগুলি পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা সংবাদ-সাময়িকপত্রের ভাষাশৈলীর ধারাটি বোঝার চেষ্টা করেছি। সংবাদ-সাময়িকপত্র মূলত সমকালীন ভাষার বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পেয়েছে।

কিছুক্ষেত্রে লেখকদের নিজস্ব গদ্যশৈলী, ভাষারীতি অনুসৃত হয়েছে পত্রিকার পাতায়।

১১.১০ বিশ শতকের বাংলা ভাষাচর্চা:

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই বাংলা গদ্যচর্চার নিদর্শন পাওয়া যায়, তবে সাহিত্যিক গদ্য ব্যবহারের নিদর্শন উনিশ শতকের প্রাপ্ত হয়। প্রাথমিক পর্বে ধর্মচর্চার স্বার্থে, বিদেশি রাজর্মচারীদের ভাষাশিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে যে বাংলা গদ্যের চর্চা শুরু হয়েছিল কয়েক শতক পেরিয়ে তার ধারা আজও বহমান। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ-দের যুগ অতিক্রম করে বিশ শতকের এক দীর্ঘ সময়কাল অতিক্রান্ত করে বাংলা ভাশা-সাহিত্য চর্চার ধারা স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে চলেছে। তবে এই গতিশীল ধারাটি নানান পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জনার মধ্যে দিয়ে এগিইয়ে চলেছে।

উনিশ-বিশ শতকের এক দীর্ঘ সময়পর্ব জুড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যচর্চা করেছেন। আমরা রবীন্দ্রনাথের

ভাষাচর্চা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখতে পেয়েছি বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি সংরূপ রচনাতেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক জীবনে দীর্ঘ সময় সাধু ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন; পরবর্তীতে প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র পত্রিকার হাত ধরে চলিত গদ্যচর্চা করেন রবীন্দ্রনাথ। এই চলিত গদ্য গুরুগম্ভীর, মার্জিত। বিশ শতকের রবীন্দ্র সমসাময়িক কালেই কল্লোল-কালিকলম-এর মতো পত্রিকাগুলির হাত ধরে কথ্য, চলিত রীতিতে গদ্যচর্চার সূত্রপাত ঘটে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বনফুল, সুবোধ ঘোষ থেকে পরবর্তীতে সমরেশ বসু, মতি নন্দী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ প্রায় সকলেই চলিত গদ্যে সাহিত্য রচনা করেছেন। এই চলিত গদ্য আমাদের মৌখিক কথ্যরীতির অনুরূপ। এই গদ্য রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য বহন করে; যাকে আমরা আজ মান্য বাংলা হিসেবে জানি। কিছু ক্ষেত্রে চরিত্রের ভৌগোলিক, সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে আঞ্চলিক কথ্যরীতি ব্যবহৃত হলেও গদ্য সাহিত্যে মূলত মান্য বাংলাই প্রসার লাভ করে। বিশ শতক থেকেই লেখার ভাষা এবং মুখের ভাষার পার্থক্য ধীরেধীরে সংকুচিত হয়।

১১.১১ একুশ শতকের বাংলা ভাষাচর্চা:

ভাষা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। বিশ শতক থেকে চলিত গদ্যই আমাদের সাহিত্যের ভাষা, নিত্য ব্যবহারের ভাষা। তবে এই চলিত রীতিও নানান বাঁকবদলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। বাংলা ভাষায় শব্দভাণ্ডার আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন দেশি-বিদেশি শব্দের আগমন, ঋণগ্রহণ সম্পর্কে পড়েছি। ইংরেজ আগমন সূত্রে বহু ইংরেজি শব্দ, তার পূর্বে আরবি-ফারসি শব্দ, ওলন্দাজ, চীনা, জাপানি শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। আমরা আজ কথা বলার ক্ষেত্রে সাধারণত বহু মিশ্র-সংকর শব্দ ব্যবহার করি। সম্পূর্ণ একটি বাংলা বাক্য এখন প্রায় শোনা যায় না বললেই চলে।

এক সময় 'চেয়ার', 'টেবিল', 'অফিস', 'পেন' ইত্যাদি শব্দগুলি বাংলায় স্বাভাবিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি আজ দেখা যায় আমরা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতে করতে, তার বাংলা প্রতিশব্দ প্রায় ভুলতে বসেছি। যেমন- ব্যবহারের বদলে ডব্দন্ত্র, সাধারণের স্থলে General, আমি পারব না/ পারব না-এর বদলে I Can't, হয়তোর বদলে May be, আশা করির বদলে I hope so ইত্যাদি শব্দ আজ খুব সাবলীলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আজকাল বিভিন্ন কথার উত্তরে আমরা ইংরেজি, হিন্দি শব্দ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। এই প্রভাব সাহিত্যেও লক্ষণীয়। এই সময়কার জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের রচনায় প্রচুর ইংরেজি শব্দের ব্যবহার, চরিত্রের কথনে হিন্দি-ইংরেজি শব্দের স্বাভাবিক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন 'বাড়িতে দিদিই ছিল সেন্টার অফ অ্যাটেনশন।' বা 'হয়তো সারাজীবনই এরকম একটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগত ও...'

বাঙালির কথার চলন যে বদলে যাচ্ছে তা এই সাহিত্যিক উদাহরণ আরো স্পষ্ট করে। এছাড়াও 'কারণ' এর বদলে 'কেন কি', 'সামনে'-র বদলে 'আগে' শব্দের ব্যবহারে হিন্দি শব্দের ব্যাপক প্রভাবের দিকটি নজরে পড়ে।

একুশ শতকে বিশ্বায়নের প্রভাব, যন্ত্রের প্রভাব, প্রযুক্তির প্রভাব কেবল আমাদের দৈনন্দিন যাপন, চলনকেই বদলে দিচ্ছে না; তার সঙ্গে বদলে যাচ্ছে আমাদের প্রকাশ, আমাদের ভাষা। আজ তাই একটি স্মাইলি, বা ইমোজির মাধ্যমেও মনের ভাব প্রকাশ পায়। আর যা মনের ভাব প্রকাশ করে তাই তো ভাষা। আজ আর ভাব প্রকাশের মাধ্যম কেবল শব্দ নয়; হাসির ইমোজি, দুঃখের ইমোজি, ভয়ের ইমোজি-র মাধ্যমে ভাব প্রকাশের নজিরই ব্যাপক পরিমাণে লক্ষণীয়।

১১.১২ সারসংক্ষেপ:

রামমোহনের গদ্যে হয়তো সাহিত্য রস ছিল না, খানিক ক্ষেত্রে আন্বয়িক জটিলতা বাক্যের স্বাভাবিক চলনকে খানিক ব্যাহত করেছিল তবে তার ভাষা ছিল প্রাঞ্জল। বিদ্যাসাগরের হাতে পড়ে বাংলা গদ্য সাহিত্যিক রসে জারিত হয়। প্যারীচাঁদ মিত্র এক অন্য ধরনের গদ্যের ব্যবহার করেছেন যেখানে সাধু ভাষায় ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের বদলে চলিত ধাতুর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কালীপ্রসন্নের কথ্যভাষা বাংলা গদ্যসাহিত্যে গতি সঞ্চারিত করে। বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে পরবর্তীকালে বাংলা গদ্যে এক নবপর্যায়ের সূচনা হয়। ভাব-রসের সমন্বয়ে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস নামে এক নব ধারার শুভারম্ভ হয়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে বাংলা গদ্য পরিচালিত হয় এবং বৈচিত্র্য লাভ করে। বাংলা গদ্যচর্চায় সাধুভাষার স্থলে চলিত রীতির প্রচলন ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ থেকে পরবর্তী পর্যায়ে বিশ শতকের লেখক-সাহিত্যিকদের গদ্যশৈলী থেকে আজকের একুশ শতকের ভাষার ধারা, বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমরা। শিক্ষার্থীরা এই একক পাঠের মাধ্যমে আধুনিক বাংলা ভাষার বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে জানতে পারবে। এই সূত্রেই পরবর্তীতে নিত্য পরিবর্তনশীল, গতিশীল বাংলা ভাষার স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার উৎসাহ তৈরি হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে।

বিশ শতকের আধুনিক মনন-চিন্তন, পাশ্চাত্যের ভাবধারা সাহিত্যিকদের চিন্তনে, প্রকাশের, গদ্যশৈলীতে পরিবর্তন সংগঠিত করেছিল। এই একক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী আধুনিক বাংলা সাহিত্যচর্চা, মূলত গদ্যচর্চার ধারা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১১.১৩ অনুশীলনী:

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. প্রাক্ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্বে রচিত দুটি বাংলা গদ্যের উল্লেখ করুন।

২. বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের নিদর্শন কোনগুলি?

৩. শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত অন্তত দুটি বাংলা বই এর নাম উল্লেখ করুন।

৪. 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' কে রচনা করেন?

৫. কর্ণওয়ালীসী কোড-এর অনুবাদ কে করেন?

৬. হ্যালহেড রচিত বইটির নাম কী? এই বইটি রচনার উদ্দেশ্য কী ছিল?

৭. অষ্টাদশ শতাব্দীতে পর্তুগিজ মিশনারি রচিত দুটি বিখ্যাত বইয়ের নাম লিখুন।

৮. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত দুজন লেখকের রচনার নাম লিখুন।

৯. 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' কার লেখা?

১০. 'লিপিমালা' গ্রন্থে প্রকাশিত দুটি কাহিনির নাম লিখুন।

১১. 'বত্রিশ সিংহাসন' কার লেখা?

১২. বিদ্যাসাগর রচিত দুটি অনুবাদ গ্রন্থের নাম লিখুন।

১৩. রামমোহনের অনূদিত দুটি উপনিষদের নাম লিখুন।

১৪. রামমোহন রায়ের ধর্ম বিষয়ক দুটি আলোচনার নাম লিখুন।

১৫. রামমোহন রায় রচিত ব্যাকরণ বইটির নাম কী?

১৬. প্রথম বাংলা নক্‌শাকারের নাম লিখুন। তাঁর রচিত দুটি নক্‌শার নাম লিখুন।

১৭. প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলালের গদ্যরীতি কীরূপ?

১৮. হুতোম প্যাঁচা কার ছদ্মনাম? হুতোম প্যাঁচার নক্‌শার পূর্বের নাম কী ছিল?

১৯. বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরীতি কীরূপ?

২০. রবীন্দ্রনাথ কোন রীতিতে সাহিত্য রচনা করতেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. প্রাক্ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্বের গদ্যচর্চার উদাহরণ দিন।

২. মিশনারিদের রচিত গদ্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. হুতোম প্যাঁচার নক্‌শার রচনাবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪. বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বাংলা ভাষার স্বরূপ কেমন হওয়া উচিত?

৫. বঙ্কিমচন্দ্র লেখার ভাষা ও কথনের ভাষার মধ্যে কি পার্থক্য নিরূপণ করেছিলেন? তাঁর ভাবনার স্বরূপটি আলোচনা করুন।

৬. হুতোম প্যাঁচা নামের কারণ কী?

৭. নক্‌শা রচনার উদ্দেশ্য কী?

৮. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গদ্যে কোন গদ্যরীতি লক্ষণীয়? তার স্বরূপ আলোচনা করুন।

৯. রামরাম বসুর রচনায় রচনাশৈলী কি সাধুরীতির নাকি কথ্যরীতির? আপনার মতামত কী?

১০. মাসিক পত্রিকায় কেন সহজ গদ্যরীতি ব্যবহার করা হয়?

১১. জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার ভাষাশৈলী সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১২. সংবাদ-সাময়িকপত্রের ভাষা ব্যবহারের বহুমাত্রিকতা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

১৩. বামাবোধিনী পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১৪. প্রথম সংবাদপত্র প্রচেষ্টা কোনটি? বাংলা ভূখণ্ডের প্রথম সংবাদপত্রের নাম কী?

১৫. রবীন্দ্রনাথের গল্পের গদ্যশৈলী সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১৬. রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সাধু ও চলিত রূপের সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। একে কি গুরুচণ্ডালী দোষ বলা যায়?

রচনাধর্মী প্রশ্ন:

১. শ্রীরামপুর মিশন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে যে বাংলা বইগুলি রচিত হয় তার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

২. উনিশ শতকে বাংলা গদ্যচর্চার প্রয়োজনীয়তা কেন তৈরি হল?

৩. উনিশ শতকের পূর্বের বাংলা গদ্যচর্চার ধারা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪. প্রাক্ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্বের বাংলা গদ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৫. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা গদ্যচর্চার ধারা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৭. বাংলা গদ্যচর্চার ধারায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

৮. বাংলা গদ্যচর্চার ধারার পুষ্টি সাধনে রামরাম বসু ও উইলিয়াম কেরীর ভূমিকা আলোচনা করুন।

৯. বাংলা গদ্যচর্চার বিকাশে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ভূমিকা প্রসঙ্গে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

১০. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের তিনজন বিশিষ্ট লেখকের গদ্যশৈলীর পার্থক্যগুলি নির্দেশ করুন।

১১. বাংলা গদ্যচর্চার ধারাটি বোঝার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভূমিকা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

১২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্যরীতি বা ভাষাশৈলী সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১৩. অনুবাদ সাহিত্যচর্চায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

১৪. বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত কয়েকটি সমাজ সংস্কারমূলক গদ্যের নামোল্লেখ করুন। সমাজ সংস্কারমূলক

গদ্যের কোন নিজস্ব শৈলী কি রয়েছে? আপনার মতামতটি ব্যক্ত করুন।

১৫. উনিশ শতকের সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারাটি বোঝার জন্য রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে কেন চর্চার প্রয়োজন?

১৬. রামমোহন ও বিদ্যাসাগরীয় গদ্য কী উনিশ শতকের সাহিত্যচর্চার প্রবাহমান ধারার স্বাক্ষর নাকি তাঁদের গদ্যশৈলী কোন স্বতন্ত্র ধারার সন্ধান দিল? নিজের ভাষায় মতামতটি ব্যক্ত করুন।

১৭. রামমোহন রায়ের গদ্যকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী? রামমোহন রায়ের সাহিত্য চর্চার ধারা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১৮. পূর্ববর্তী ধারার লেখক সাহিত্যিকদের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গদ্যশৈলীর পার্থক্যগুলি নির্দিষ্ট করুন।

১৯. বাংলা ভাষা সাহিত্যের ধারাকে নক্‌শাজাতীয় সাহিত্য কীভাবে পুষ্ট করেছে।

২০. প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যরীতির পার্থক্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২১. নক্‌শাজাতীয় গদ্য কাকে বলে? নক্‌শায় আলোচিত বিষয় বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২২. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য প্রকরণ, গদ্যরীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২৩. প্যারীচাঁদ মিত্রের সাহিত্য প্রকরণ, গদ্যরীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২৪. কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আপনার ভাবনা ব্যক্ত করুন।

২৫. প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের গদ্যরীতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাবনা ব্যক্ত করুন।

২৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত প্রবন্ধ সাহিত্যের গদ্যশৈলী সম্পর্কে আপনার মতামতটি আলোচনা করুন।

২৭. তুলনামূলক গদ্যচর্চার রীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গদ্যশৈলী সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২৯. বাংলা ভাষা গঠন সম্পর্কে বঙ্কিমের মতামত আলোচনা করুন।

৩০. লেখার ভাষা ও কথনের ভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমের বক্তব্যটি তুলে ধরুন।

৩১. বঙ্কিমের পূর্ববর্তী ধারার গদ্যচর্চা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩২. বাংলা সাহিত্য সংরূপগুলি আলোচনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের রচনাশৈলী আলোচনা করুন।

৩৩. বিষয়বৈচিত্র্য অনুসারে রবীন্দ্রনাথের রচনাশৈলীতে কি কোন পার্থক্য সূচিত হয়েছে? আপনার মতামতটি ব্যক্ত করুন।

৩৪. প্রবন্ধ সাহিত্যের রচনা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আপনার মতামতটি ব্যক্ত করুন।

৩৫. কালগত পার্থক্য রবীন্দ্রসাহিত্যে কতখানি প্রভাব ফেলেছে? আপনার মতামতটি ব্যাখ্যা করুন।

৩৬. বাংলা সংবাদ সাময়িকপত্রের বহুমাত্রিক ধারা সম্পর্কে আলোচনা করুন। বিষয় বৈচিত্র্য কি সংবাদ-সাময়িকপত্রের ভাষা ব্যবহারে প্রভাব ফেলে? আপনার মতামত ব্যক্ত করুন

৩৭. সাহিত্য পত্রিকার আলোচ্য বিষয়, ভাষাবৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩৮. প্রথম বাংলা পত্রিকা সম্পর্কিত তর্ক সম্বন্ধে আপনার মতামতটি ব্যক্ত করুন। প্রথম বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের ভাষা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩৯. প্রথম যুগের সংবাদ-সাময়িকপত্রের বিষয়ে আলোচনা করুন।

৪০. সাময়িকপত্রের ভাষা ব্যবহার, ভাষাশৈলী সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪১. ধর্মপ্রচারক পত্রিকাগুলির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, ভাষা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪২. মাসিক পত্রিকার ভাষা বৈশিষ্ট্য, সংবাদপত্র পরিচালনার নীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪৩. সাহিত্য পত্রিকাগুলির মধ্যে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন। এই সূত্রে পত্রিকাটির ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

মডিউল : ৪

বাংলা উপভাষা, বাংলা উপভাষার পরিচয় (ক), বাংলা উপভাষার পরিচয় (খ), বাংলা উপভাষার পরিচয় (গ), সাধু ও চলিত ভাষা, বাংলা শব্দভাণ্ডার

একক ১২ ❑ বাংলা উপভাষা

গঠন

১২.১ উদ্দেশ্য

১২.২ প্রস্তাবনা

১২.৩ সমাজভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা

১২.৪ উপভাষা কাকে বলে?

১২.৫ ভাষা ও উপভাষার পার্থক্য

১২.৬ উপভাষার বিবিধ অঞ্চল

১২.৭ সামাজিক উপভাষা ও আঞ্চলিক উপভাষা

১২.৮ বাংলা উপভাষা

১২.৯ সারসংক্ষেপ

১২.১০ অনুশীলনী

১২.১ উদ্দেশ্য

জ্ঞান বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝতে শিখেছি দৈনন্দিন ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে ভাষার প্রয়োজন কতটা। জন্মাবধি আমরা ভাষা সম্পর্কে কতকথা শুনছি, জ্ঞানত অথবা অজ্ঞানত আমরা ভাষা শিখেছি, এখনও শিখছি। কিন্তু বর্তমান কোর্সে আমরা বিদ্যায়তনিক পরিসরে বা বলা ভালো Academics-এর দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাষা বা language-এর নানান পরত সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। পূর্ববর্তী এককগুলিতে আমরা পর্যায়ক্রমে পৃথিবী ভাষাবংশের গতিবিধি, বাংলা ভাষার উদ্ভব, ক্রমবিকাশ, তার বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে জেনেছি। আমরা জানি প্রতিটি ভাষায় অন্দরে বিভিন্ন কারণে ভাষা বৈচিত্র্য তৈরি হয়। বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক কথনভঙ্গির পার্থক্যের সূত্রে উপভাষা গঠিত হয়। আমরা এই এককে বাংলা ভাষা চর্চার ধারায় উপভাষার বিভিন্ন স্তর, উপভাষা গড়ে ওঠার কারণ, তার বিবিধ মাত্রা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব।

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা ভাষা ও উপভাষা সম্পর্কে জানতে পারবে। ভাষা ও উপভাষার পার্থক্য, বিভিন্ন অঞ্চলভেদে উপভাষার বিভাজন, সামাজিক এবং আঞ্চলিক উপভাষা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানলাভ করতে পারবে।

১২.২ প্রস্তাবনা

ভাষা ও উপভাষা পৃথক হলেও কেন সেই পার্থক্যটি আপেক্ষিক, কোন্ কোন্ মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি অঞ্চলভেদে উপভাষা আলাদা হয়ে যায়, সামাজিক উপভাষার বিবিধ মাত্রাগুলি কী কী এবং জেলা-ভিত্তিক বাংলা উপভাষার বিভাজন—মূলত এই বিষয়গুলির ভিত্তিতেই বর্তমান এককটি গড়ে উঠেছে।

১২.৩ সমাজভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা

মানুষ সামাজিক জীব। সভ্যতার বিকাশ পর্বে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে মানুষ খাদ্য সংগ্রহ করেছে, বাসস্থান তৈরি করেছে, নিজের জন্য পোশাক তৈরি করেছে। এই গঠন পর্বে মানুষ বুঝতে পেরেছিল সমাজের টিকে থাকার জন্য পরস্পরের মধ্যে সংযোগ রক্ষার প্রয়োজন। এই সূত্রেই সংযোগরক্ষাকারী একটি মাধ্যমের প্রয়োজন দেখা দিল। এই সংযোগ রক্ষার ভাবনা থেকেই নিজেদের মধ্যে চিন্তাভাবনা আদান-প্রদান সূত্রে ভাষার জন্ম হয়। আমরা আজ ভাষাকে যে রূপে দেখছি প্রথম থেকেই ভাষার রূপ তেমন ছিল না। গুহাচিত্র, আকার-ইঙ্গিত থেকে ধীরে ধীরে আওয়াজ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে নানান বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজকের সমাজে প্রচলিত ভাষার জন্ম হয়। ভাষার মূলত দুটি দিক প্রকাশ বা Expression এবং সংযোগ বা Communication। আমরা বর্তমান কোর্সের প্রথম পর্যায়ে পৃথিবীর ভাষা বংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম, বিবর্তনের ধারা, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মূলত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ে বাংলা ভাষার বিভিন্ন স্তর, তাদের ধ্বনিতাত্ত্বি, রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই পর্যায়ে বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপভাষার গঠন এবং বৈশিষ্ট্য আমাদের আলোচ্য।

ভাষা-উপভাষার বিভিন্ন স্তর, উপভাষা গড়ে ওঠার কারণ, সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভাষার গুরুত্ব আলোচনার জন্য সমাজভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা থাকা প্রয়োজন। সমাজভাষাবিজ্ঞানের এলাকাতেই ভাষার বহুমাত্রিক রূপ ও বৈচিত্র্য, উপভাষা গঠনের কারণ, সামাজিক বৈচিত্র্যের সাপেক্ষে ভাষা গঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনাকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—কেন্দ্রীয় ভাষা বিজ্ঞান এবং বহিরঙ্গ ভাষাবিজ্ঞান। কেন্দ্রীয় ভাষাবিজ্ঞানের মূলত কোন একটি ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব, অন্বয়তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশ পায়। অন্যদিকে বহিরঙ্গ ভাষাবিজ্ঞানে অন্যান্য বিভিন্ন তত্ত্ব, বিজ্ঞান বা দর্শনের সঙ্গে ভাষাকে মিলিয়ে পড়া হয়। যেমন সমাজের সঙ্গে ভাষাকে মিলিয়ে পড়লে তাকে বলে সমাজভাষাবিজ্ঞান। আবার নৃতত্ত্বের সঙ্গে ভাষাকে মিলিয়ে পড়লে তাকে বলব নৃভাষাবিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে ভাষাকে মিলিয়ে পড়লে তাকে বলব মনোভাষাবিজ্ঞান। আমরা এই পর্বে মূলত সমাজভাষাবিজ্ঞানের সাধারণ পরিচয় শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

সমাজে ভাষার ভূমিকা এবং ভাষা গঠনে সমাজের ভূমিকা সম্পর্কিত আলোচনা সমাজভাষাবিজ্ঞানের

মুখ্য আলোচ্য। কোন ব্যক্তির ভাষা ব্যবহার সূত্রে তার সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক গঠন সম্পর্কে জানতে পারা যায়। এই সূত্রে বোঝা যায় কোন নির্দিষ্ট সামাজিক প্রেক্ষিত কিভাবে মানুষের ভাষা গঠনকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্ম, বর্ণ, অর্থনৈতিক অবস্থান, লিঙ্গগত পরিচয়ের ভিত্তিতে মানুষের ভাষা ব্যবহারের ভিন্নতা লক্ষণীয়। ভাষা বৈচিত্র্যের বিভিন্ন সূত্র, কেন ভাষা বৈচিত্র্য তৈরি হয় এই আলোচনা সমাজভাষাবিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দিষ্ট।

এখন প্রশ্ন হতে পারে সমাজভাষাবিজ্ঞানের চর্চা কবে থেকে শুরু হল। এই সম্বন্ধীয় আলোচনা বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিভিন্ন আলোচনায় লক্ষ করা যায়। কিন্তু বিশ শতকে বিদ্যায়তনিক পরিসরে সমাজভাষাবিজ্ঞান বা Sociolinguistics-এর চর্চা শুরু হয়। পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলের মানুষের ভাষা এক নয়, তেমনি একই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থানকারী মানুষের কথনরীতিতেও স্বাভাবিক ভিন্নতা লক্ষণীয়। প্রাচীন ঈশ্বরতত্ত্ব অনুযায়ী পূর্বে মানুষের ভাষা একই ছিল, পরবর্তী দেবতারা মানুষের ভাষা বদলে দেন। এই অলৌকিক কাহিনিকে বিশ্বাস করা বা না করা একান্তভাবেই ব্যক্তিগত ইচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার পণ্ডিত গণ বহু আগেই ভাষাবৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যেমন যাস্ক তাঁর 'নিরুক্তমে', 'পতঞ্জলি', 'মহাভায্যে', 'পাণিনি', 'অষ্টাধ্যায়ী'-তে, ভরত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে' ভাষা বৈচিত্র্য, ভাষাগঠন সম্পর্কিত নানান পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

১৮৯৬ সালে আব্রাহাম গ্রিয়ারসন 'ল্যাংগুয়েজ সার্ভে অফ ইন্ডিয়া' (language Survey of India) গ্রন্থের কাজ শুরু করেন। এই বইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার স্বরূপ তুলে ধরেছিলেন লেখক। আমাদের দেশে নরেন্দ্র চক্রবর্তী খুলনা জেলার মাঝিদের ভাষা নিয়ে কাজ করেন ১৯২৪ সালে। পরবর্তীতে সুকুমার সেন ১৯২৬ সালে মেয়েদের মুখের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেন। এই একই সালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের Origin and Development of Bengali language বইটি প্রকাশ পায়। যাকে মুখ্যত আমরা ODBL নামেই চিনি। তবে সমাজভাষাবিজ্ঞান নিয়ে চর্চা পাশ্চাত্যেই প্রথম শুরু হয়। সমাজভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত পড়াশুনা করার সুযোগ পাব। তবে এখন খুব সংক্ষিপ্ত আকারে সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চার দিকটি বোঝবার চেষ্টা করব। জানা যায় ১৯৫২ সালে হ্যাভার সি কুরি Sociolinguistics কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন। তবে ফার্দিনান্দ দ্যা স্যাসুর প্রথম ভাষাকে সামাজিক প্রেক্ষিতে দেখার কথা বলেছিলেন। সমাজের নানা নাঙ্গিক কাজকর্মের সঙ্গে ভাষাকে মিলিয়ে পড়াই সমাজভাষাবিজ্ঞানের চর্চার দিক। এছাড়াও গাম্পার্য, ব্রাইট, ফিশম্যান, লেবভ, ট্রাডজিল প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীরা সমাজভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কেউ আলোচনা করেছেন কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভাষার দ্বিমাত্রিকতা নিয়ে, কেউ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের ভাষাবৈচিত্র্য অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন; মূলত ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমাজ প্রেক্ষিত কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে এই আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছিল সমাজভাষাবিজ্ঞানীদের আলোচনায়।

কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষায় বিভিন্ন মাত্রা লক্ষ্য করা যায় যেমন—দ্বিবাচন, দ্বিমাত্রিকতা, বক্তা-শ্রোতা-উপলক্ষ্য, সামাজিক অবস্থান প্রভৃতি। সমাজভাষাবিজ্ঞানের কাজ মূলত তথ্য সমীক্ষা বা Data

collection, Field Work-এর ওপর ভিত্তি করেই পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে মানুষের মুখের কথা থেকেই তার সামাজিক-মানসিক গঠন সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়। যেমন—'তোমাগো বাড়ি কোনখানে' —বুঝতে অসুবিধা হয় না এটি কোন একজন পূর্ববঙ্গের মানুষের কথ্যভাষা। আবার যদি শুনতে পান একজন বলছে—'প্রথমে স্কুল থেকে ফিরে শাড়ি পড়ে মায়ের সঙ্গে নাচ শিখতে যাব'। —বাক্য থেকে বুঝতে অসুবিধা হবে না কথক একজন স্কুল ছাত্রী। এখানে তার পোশাকের ধরন, কথা বলার ভঙ্গিমা থেকেই আমরা বুঝতে পারলাম কথক একজন মেয়ে এবং স্কুলে পাঠরতা।

সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-বয়স এর প্রেক্ষিতে ভাষা বৈচিত্র্য তৈরি হয়। যেমন— নারী-পুরুষের ভাষায় কিছু পার্থক্য লক্ষণীয়, তেমনি ৮ থেকে ৮০ সকলের মুখের ভাষা, কথনশৈলী এক রূপ নয়। আবার কে বলছে, কাকে বলছে, কি প্রসঙ্গে বলছে—এই বহুরৈখিক মাত্রার ভিত্তিতে ভাষা বৈচিত্র্য তৈরি হয়। একে সমাজভাষাবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'বক্তা-শ্রোতা-উপলক্ষ্য'। যেমন— 'চুপ করে পড়তে বসো' —এই কথা থেকে বোঝা যায় কোন একজন ছাত্রকে তার অভিভাবক বা শিক্ষক একটি নির্দেশ দিচ্ছেন। আবার যদি কখনো শুনতে পাই একজন বলছেন 'এবার জোরে জোরে শ্বাস নিন' —তাহলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে কথাটি কোন ডাক্তার তার রোগীর উদ্দেশ্যে বলছেন। সামাজিক বিভিন্ন অবস্থানের ভিত্তিতে ভাষাগত কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়।

উপভাষার আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে আমাদের কয়েকটি কথা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। মানুষের ভাষা ব্যবহারকে কতগুলি পর্বে ভাগ করা যায়।

- প্রতিটি মানুষের নিজস্ব ভাষা থাকে, নিজস্ব কথন শৈলী থাকে তাকে আমরা বলি নি-ভাষা।
- কতগুলি নিজস্ব ভাষা জুড়ে যদি একটি বড় ভাষাগোষ্ঠী তৈরি হয় তখন তাকে আমরা বলি বি-ভাষা বা বিশেষ ভাষা।
- নির্দিষ্ট শ্রেণির মধ্যে নিজস্ব কথন ভঙ্গিমা তৈরি হলে তাকে আমরা বলি শ্রেণিভাষা। যেমন কুলির ভাষা, ডাক্তারদের ভাষা।
- বিভিন্ন শ্রেণির বা বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষের ভাষা ব্যবহারের উপর ভিত্তি করেই একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে একটি ভাষা ছাদ তৈরি হয় একেই আমরা বলি উপভাষা। সাধারণত বলা হয় ভাষার বিচ্যুত রূপই উপভাষা। কিন্তু আজ ভাবনার ভাষার কি সত্যিই কোন নির্দিষ্ট একটি মাত্র আদর্শ রূপ থাকতে পারে বিষয়। যেমন বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে মূলত পাঁচটি উপভাষার কথাই আমরা জানি। একটি উপভাষা বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কারণে মান্যরূপে স্বীকৃত হয়েছে। মনে রাখার বিষয় সেটিও একটি উপভাষা (যেমন—রাঢ়ী উপভাষা)।

১২.৪ উপভাষা কাকে বলে?

ভাষা হল কতকগুলি অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধরূপ যার মাধ্যমে একটি বিশেষ সমাজের মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে।

যে জনসমষ্টি একই ধরনের ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপের দ্বারা নিজেদের মধ্যে এইভাবে ভাব বিনিময় করে, ভাষাবিজ্ঞানীরা তাকে একটি ভাষা-সম্প্রদায় বা speech community বলেন। Leonard Bloomfield তাঁর 'Language' গ্রন্থে লিখছেন— 'A group of people who use the same system of speech signals is a **speech community**.'

ধরা যাক একটি ধ্বনিসমষ্টির কথা— 'আমরা বই পড়ি'। এখানে যে নির্দিষ্ট ধ্বনিসমষ্টি দিয়ে একটি বিশেষ ভাব প্রকাশ করা হল, সেই ধ্বনিসমষ্টি এই নির্দিষ্ট ক্রমে বিন্যস্ত করে শুধু বাঙালিরাই ব্যবহার করে এবং এর মাধ্যমে যে-ভাব প্রকাশিত হয়, তা শুধু বাঙালিরাই বুঝতে পারে। সুতরাং বাঙালিদের একটি ভাষা-সম্প্রদায় বা 'speech community' বলা যায়। এই একই ভাব প্রকাশের জন্যে ইংরেজরা অন্য ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহার করে বলবেন, 'We read book'। জার্মানরা বলবেন 'Wir lesen Bücher'। ফরাসিরা বলবেন 'Nous lisons des livres'।

অর্থাৎ, একইধরনের ধ্বনিসমষ্টি দিয়ে সব মানুষের ভাবপ্রকাশ সম্ভব নয়। এক-এক ধরনের ধ্বনিসমষ্টি ও ধ্বনিসমাবেশ-বিধিতে এক-একটি জনগোষ্ঠী অভ্যস্ত। এক-একটি ভাষা আসলে এক-একটি জনসমষ্টির নিজস্ব প্রকাশ-মাধ্যম। এক-একটি বিশিষ্ট ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধরূপের ব্যবহারকারী জনসমষ্টিই হল এক-একটি ভাষা-সম্প্রদায়।

কিন্তু এক-একটি ভাষা-সম্প্রদায় যে-ভাষার মাধ্যমে ভাববিনিময় করে, সেই ভাষারও রূপ সর্বত্র সম্পূর্ণ একরকম নয়। যেমন, পূর্ব বাংলা বা বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলায় বাংলা ভাষাই প্রচলিত। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উচ্চারণ ও ভাষারীতি পুরোপুরি একরকম নয়। একই ভাষার মধ্যে এই যে আঞ্চলিক পার্থক্য, একেই বলে উপভাষা।

উপভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 'A Dictionary of linguistics' গ্রন্থে (Pei, Merio A. and Gaynor, Frank) বলা হয়েছে, 'A specific form of a given language, spoken in a certain locality or geographic area, showing sufficient differences from the standard or literary form of that language, as to pronunciation, grammatical construction and idiomatic usage of words, to be considered a distinct entity, yet not sufficiently distinct from other dialects of the language to be regarded as a different language.'

অর্থাৎ, উপভাষা হল একটি ভাষার অন্তর্গত এমন এক-বিশেষ রূপ যা এক-একটি বিশেষ অঞ্চলে

প্রচলিত, যার সঙ্গে আদর্শ ভাষা বা standard language বা সাহিত্যিক ভাষা বা literary language-এর ধ্বনিগত, রূপগত ও বিশিষ্ট বাগ্‌ধারাগত পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য এমন সুস্পষ্ট যে, ওইসব বিশেষ-বিশেষ অঞ্চলের রূপগুলিকে স্বতন্ত্র বলে ধরা যাবে; অথচ পার্থক্যটা সেই পরিমাণেও বেশি হবে না যাতে আঞ্চলিক রূপগুলিই এক-একটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা হয়ে ওঠে।

১২.৫ ভাষা ও উপভাষার পার্থক্য

ভাষা ও উপভাষার পার্থক্যটি চূড়ান্ত নয়—আপেক্ষিক। তা শ্রেণিগত নয়—মাত্রাগত। একই ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক পৃথক রূপকে উপভাষা বলে। কিন্তু এই আঞ্চলিক পার্থক্য বেড়ে চরমে পৌঁছলেই একই ভাষা থেকে একাধিক ভাষার জন্ম হয়। অর্থাৎ আঞ্চলিক রূপগুলোকে তখন আর একই ভাষার উপভাষারূপে চিহ্নিতকরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন সেগুলিই এক-একটি স্বতন্ত্র ভাষার জন্ম দেয়।

যেমন, বাংলা ও অসমিয়া ভাষা প্রথমে একই ভাষার দুটি উপভাষা ছিল। পরে ক্রমে বঙ্গদেশ ও আসামের ভাষার আঞ্চলিক পার্থক্য বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন জায়গায় এসে পৌঁছল, তখন বাংলা ও আসামের ভাষার আঞ্চলিক রূপদুটিকে পৃথক ভাষারূপে চিহ্নিত করা হল— বাংলা ভাষা ও অসমিয়া ভাষা।

এখানে যে-প্রশ্নটির মুখোমুখি আমাদের দাঁড়াতে হয়, সেটি হল এই যে, একই ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক রূপের পার্থক্যকে কোন্ স্তর পর্যন্ত উপভাষার সীমানায় রাখা যাবে; আর সেই পার্থক্য বাড়তে বাড়তে কোন্ স্তরে উপনীত হলে সেগুলিকে আর উপভাষা বলা যাবে না, সেগুলি এক স্বতন্ত্র ভাষার জন্ম দেবে—এর সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডটি ঠিক কী?

বস্তুত, এই বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই।

কোনো কোনো ভাষাতাত্ত্বিকের মতে, ভাষার আঞ্চলিক রূপ যখন স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীর ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠবে, তখন সেগুলিকে আর উপভাষা না বলে ভাষার মর্যাদা দেওয়া উচিত। যেমন— বাংলা ও আসামের ভাষা। কিন্তু এই মানদণ্ড অনুসরণ করলে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার উপভাষাকে দুটি স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা দিতে হয়। অথচ পূর্ববাংলা ও পশ্চিম বাংলার ভাষাকে তো আমরা স্বতন্ত্র ভাষা বলি না— একই ভাষার দু'টি উপভাষা বলি। তাহলে বলা উচিত, দুটি জনগোষ্ঠী যখন সংস্কৃতির দিক থেকে পৃথক হবে, তখন তাদের আঞ্চলিক ভাষা স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদা পাবে। যেমন— আসাম ও বাংলার জনগোষ্ঠী সংস্কৃতির দিক থেকে পৃথক; কিন্তু পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার জনগোষ্ঠী সংস্কৃতির দিক থেকে পৃথক নয়। তাদের একটিই সংস্কৃতি এবং সেটি হল বাঙালি সংস্কৃতি।

এখানে মনে রাখতে হবে, সাংস্কৃতিক পার্থক্যের ব্যাপারটাও অনেকাংশেই আপেক্ষিক। কারণ, বাংলা ও আসামের সংস্কৃতির মধ্যেও কিছুটা ঐক্যসূত্র আছে; অন্যদিকে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতিতেও

কিছুটা পার্থক্য আছে। কাজেই বলা যেতে পারে, ভাষা ও উপভাষার পার্থক্যটি চূড়ান্ত নয়—আপেক্ষিকমাত্র।

এই আপেক্ষিকতার ভিত্তিতেই বলা চলে যে, একই ভাষাভাষী এলাকার অন্তর্গত একাধিক অঞ্চলের ভাষার আঞ্চলিক রূপের মধ্যে যতদিন পর্যন্ত পারস্পরিক বোধগম্যতা থাকে, ততদিন ঐ আঞ্চলিক রূপগুলোকে বলা হবে উপভাষা বা dialect। আর যখন এই আঞ্চলিক রূপগুলোই পৃথক হতে হতে পারস্পরিক বোধগম্যতার সীমা অতিক্রম করে যায়, তখন তাদের স্বতন্ত্র ভাষা বলা যায়।

কিন্তু এই মানদণ্ডও যে সর্বত্র প্রযোজ্য, একথা বলা যায় না। বাংলা ভাষারই দুটি উপভাষা, ধরা যাক—কলকাতা জেলার ভাষা এবং চট্টগ্রামের ভাষার মধ্যে পারস্পরিক বোধগম্যতা প্রায় নেই বললেই চলে। চট্টগ্রামের বাঙালি দ্রুত কথা বলে গেলে পশ্চিম বাংলার বাঙালি কিছুই বুঝতে পারবে না।

সেদিক থেকে আবার আদর্শ বাংলা ও আদর্শ অসমিয়ার মধ্যে পারস্পরিক বোধগম্যতা বেশি। অসমিয়া ও বাংলা দুটি পৃথক ভাষা। কিন্তু রাঢ়ী ও চট্টগ্রামী—একই ভাষার দুটি উপভাষা।

সাধারণত দেখা যায়, ভাষা একটি বৃহৎ অঞ্চলে প্রচলিত। কিন্তু উপভাষা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অঞ্চলে প্রচলিত।

ভাষার একটি সর্বজনীন আদর্শরূপ থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা নিজের-নিজের অঞ্চলে ঘরোয়া কথায় বা informal discourse-এ আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু সাহিত্যে, শিক্ষায়, আইন-আদালতে, বক্তৃতায়, বেতার-সংবাদপত্রে আদর্শ ভাষা ব্যবহার করে।

সেকারণেই দেখা যায়, একটি আদর্শ ভাষা বা standard language-এর এলাকার মধ্যে একাধিক উপভাষা প্রচলিত। উপভাষায় সাধারণত লোকসাহিত্য রচিত হয়। শিষ্টসাহিত্য রচিত হয় আদর্শ বা মান্য ভাষাতেই। তবে শিষ্টসাহিত্যে যদি উপভাষার ব্যবহার ঘটে থাকে, তবে তা নিশ্চিতভাবেই আঞ্চলিক লোকজীবনকে, লোকসমাজকে জীবন্তরূপে প্রতিভাত করার লক্ষ্যেই লেখক ব্যবহার করে থাকেন।

১২.৬ উপভাষার বিবিধ অঞ্চল

১) কেন্দ্রীয় অঞ্চল : উপভাষা নিরীক্ষার সময় দেখা যায় যে, একটা অঞ্চলে বিভিন্ন উপভাষা প্রচলিত থাকলেও সব অঞ্চলের উপভাষার সামাজিক বা সাংস্কৃতিক মর্যাদা সমশ্রেণির নয়। একটি অঞ্চলের উপভাষার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব অন্যান্য অঞ্চলের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, একটি অঞ্চলের উপভাষা যখন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে, তখন যেখান থেকেই সেই পরিবর্তন শুরু হয়, সেই অঞ্চলকে কেন্দ্রীয় অঞ্চল বা Focal area হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উপভাষার মানচিত্রে রেখার সাহায্যে এই অঞ্চল নির্দেশিত হয়ে থাকে।

২) পুরানিদর্শন অঞ্চল : পুরানিদর্শন অঞ্চল উপভাষার সেই অঞ্চলকে বলা হয়, যে-অঞ্চলের উপভাষাগত মর্যাদার অভাবের জন্যে সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ যদি কোনো 'উপভাষাভাষীয় অঞ্চল' উপভাষার মর্যাদার অভাবের কারণে অন্যান্য উপভাষী অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে এবং সেই বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থানের কারণে সেই অঞ্চলে উপভাষার প্রাচীন রূপ সংরক্ষিত থাকে অথবা কোনো ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান সেই অঞ্চলের সর্বত্র সমানভাবে বিস্তার লাভে অক্ষম হয়, তখন সেই অঞ্চলকে পুরানিদর্শন অঞ্চল বা Relic area বলে। অনেক সময় এই অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধ ও সংরক্ষণশীল ভাষাভাষী কর্তৃক প্রাচীন উচ্চারণ সযত্নে রক্ষিত হয়ে থাকে।

৩) সমরূপমূলীয় অঞ্চল : উপভাষার মানচিত্রে বিভিন্ন উপভাষীয় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য নির্দেশের জন্যে একটি অঞ্চলের থেকে অন্য অঞ্চলের পার্থক্য দেখানো হয়। এই পার্থক্য নির্দেশ করার সময় একই ধরনের রূপমূল প্রচলিত আছে— সেই সমস্ত অঞ্চলকে একটি বৃত্ত দিয়ে বেষ্টন করা হয়। সেই অঞ্চলটিকেই বলা হয় সমরূপমূলীয় অঞ্চল।

৪) সমক্রমবিন্যাস অঞ্চল : উপভাষা বিশ্লেষণকারী একটি উপভাষীয় অঞ্চলে কোনো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে কিনা, তা পর্যালোচনা করে থাকেন। কোনো উপভাষা অঞ্চলের সমরূপমূলীয় রেখা-সহ সেই অঞ্চলের সংস্কৃতি, লোকগাথা, আধিভৌতিক বিশ্বাস, কৃষিজীবীর বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিভিন্ন মাত্রায় চিহ্নিত হয়। উপভাষাবিদরা তাঁদের নিরীক্ষার ফলাফল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত করে সমশ্রেণির আপেক্ষিকতার সাহায্যে বিন্দুগুলো সংযুক্ত করেন। রেখার সাহায্যে নির্দেশিত সহনিমিত্তই সমক্রমবিন্যাস নামে পরিচিত। অর্থাৎ সমক্রমবিন্যাস হল সংস্কৃতির বিভিন্ন মাত্রার নিরিখে চতুর্দিক বেষ্টনকারী একটি রেখাঙ্কিত অঞ্চল— যেখানে ভাষার ওপর সমশ্রেণির আরোপিত প্রভাব বিদ্যমান।

৫) সন্ধি অঞ্চল : অনেকসময় পূর্ণ সংজ্ঞাকৃত উপভাষা অঞ্চল থাকলেও পাশাপাশি অবস্থিত দুই বা তার বেশি উপভাষীয় অঞ্চলের উপভাষাগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই শ্রেণির উপভাষীয় অঞ্চলকে সন্ধি অঞ্চল বা Transition Area হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি সীমান্তবর্তী মীরেশ্বরাই অঞ্চলকে সন্ধি অঞ্চলরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কারণ, এই অঞ্চল চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর সীমান্তে অবস্থিত হওয়ায় উভয় অঞ্চলের ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে।

৬) সংমিশ্রণ : অনেক সময় দুটি উপভাষীয় অঞ্চলে একই বস্তু নির্দেশক প্রচলিত দুটি রূপমূল একত্রিত হয়ে নতুন একটি রূপমূল গঠন করে, তখন তাকে সংমিশ্রণ বা blend বলা হয়। যেমন, ধরা যাক 'পটল' শব্দ। এর রূপমূলের অর্থবাচক রূপমূল 'ক' অঞ্চলে 'মাটা' রূপে এবং 'খ' অঞ্চলে 'আলসা' রূপে প্রচলিত। 'মাটা' ও 'আলসা'—এই দুটি স্বাধীন রূপমূল একত্রিত হয়ে 'আসাটা' রূপমূল গঠন করলে তাকে সংমিশ্রণরূপে চিহ্নিত করা যায়। পশ্চিম জার্মানীতে 'আলু' নির্দেশক ভিন্নতর দুটি রূপমূল 'Erdapfel' ও 'Grandbirne' একত্রিত হয়ে গঠিত হয়েছে— 'Erdbirne'।

১২.৭ সামাজিক উপভাষা ও আঞ্চলিক উপভাষা

সামাজিক স্তরভেদে একই ভাষাভাষী লোকেদের কথোপকথনে পার্থক্য ঘটে থাকে। একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, একজন অধ্যাপক, একজন উকিল, একজন রাজনৈতিক নেতা, একজন শ্রমজীবী বা একজন দাগি অপরাধীর ভাষাব্যবহারে পার্থক্য থাকাটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই সামাজিক উপভাষার বিভিন্ন মাত্রা। যেমন— শ্রেণিগত, পেশাগত, লিঙ্গগত ইত্যাদি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় নিষিদ্ধ জগতের ভাষাও।

শ্রেণিগত ভাষা : শ্রেণিভেদে বিভিন্ন মানুষের ভাষায় পার্থক্য ঘটে। যেমন, 'মহিলা', 'নারী', 'রমণী'— এই তিনটি শব্দের অর্থ একই হলেও সামাজিক শ্রেণিগত স্তর অনুসারে এগুলির ব্যবহারের পার্থক্য লক্ষণীয়। এই শ্রেণির রূপমূল ব্যবহারে উপভাষা ও চলিত ভাষাভাষীদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। চলিত ভাষায় 'মহিলা', 'নারী', 'রমণী'-র পরিবর্তে উপভাষা অঞ্চলবিশেষে 'বেটি', 'মাগী', 'ছেড়ি', 'মেয়ে' এমনকি কখনও কখনও 'মেয়েছেলে'-ও ব্যবহৃত হয়। 'ছেড়ি'-র মার্জিত রূপমূল 'ছুঁড়ি' চলিত ভাষায় অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ বা অবজ্ঞার সঙ্গে ব্যবহৃত।

বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মানুষের ভাষা ব্যবহারে বিভিন্ন আদবকায়দার প্রতিফলন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। শ্রেণিগত ভাষার মধ্যেও তাই অনেক রূপান্তর ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উচ্চবিত্ত পরিবারের একজন তরুণ সদস্য নামী স্কুলে অধ্যয়ন করলে অনেকসময় তার মধ্যে স্বতন্ত্র বিশেষার্থক শব্দ গড়ে উঠতে পারে—যা অন্য শ্রেণির মানুষের পক্ষে প্রায় অসাধ্য। বস্তিবাসী কোনো ছেলে বা মেয়ের পক্ষে সেই ভাষা ব্যবহার প্রায় অসম্ভব।

পেশাগত ভাষা : পেশাগত কারণেও ভাষা ব্যবহারে পার্থক্য চোখে পড়ার মতো। পেশাগত ভাষায় বৈষম্যের ক্ষেত্রে মানুষের নিজস্ব শিক্ষা, রুচি ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। একজন অধ্যাপক শ্রেণিকক্ষে যে-ভাষায় শিক্ষাদান করেন, একজন শ্রমিক বা মজুর যে-ভাষায় তাঁদের দাবি-দাওয়া জানান, শ্লোগান দেন— দুটিই বাংলা ভাষা হলেও, ভাষাপ্রয়োগের পার্থক্যটি আমাদের চিহ্নিত করতে অসুবিধে হয় না।

লিঙ্গগত বিভাজন : নারী ও পুরুষের ভাষার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করে সামাজিক বিভাজন করা হয়ে থাকে। এই পার্থক্যের কারণ হল উভয়ের জীবনাচরণ ও সামাজিক জীবনপ্রণালী এক নয়। কোনো কোনো জাতির সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের জন্য নারী ও পুরুষের ভাষার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীনকালে পুরুষরা নিয়োজিত থাকতেন শিকারে। নারীদের কৃষিক্ষেত্রে দেখা যেত। ফলে উভয়শ্রেণীর কথোপকথনের ক্ষেত্রে বিষয়গত পার্থক্য সুস্পষ্ট। এমন এক সময় ছিল যখন নারীদের পক্ষে বিশেষ কতকগুলো শব্দ উচ্চারণ নিষিদ্ধ ছিল। যেমন, হিন্দু সমাজে নারীরা একসময় শ্বশুর, ভাসুর, স্বামী বা গুরুজনদের নামোচ্চারণ না করে অন্য শব্দের প্রয়োগে তা বুঝিয়ে দিতেন। নারীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় সাঙ্কেতিক

ভাষাও ব্যবহার করেন। তবে নারী ও পুরুষ—উভয়ের ভাষার ব্যবহারেই নিষিদ্ধ যৌন শব্দের পৃথক প্রয়োগ প্রচলিত।

অঞ্চল-ভেদে বিভক্ত উপভাষাই হল আঞ্চলিক উপভাষা। এই আঞ্চলিক রূপভেদ প্রাচীনকাল থেকেই দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীক ভাষার Attic-Ionic, Arcadian-Cyprian, Aeolic, Doric প্রভৃতি আঞ্চলিক উপভাষা ছিল। হোমারের মহাকাব্যেও Ionic ও Aeolic উপভাষার পরিচয় আছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষাতেও আঞ্চলিক পার্থক্য গড়ে উঠেছিল। তখনকার তিনটি প্রধান উপভাষা ছিল— উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত 'উদীচ্য', মধ্য ভারতে 'মধ্যদেশীয়' এবং পূর্ব ভারতে 'প্রাচ্য'। সম্ভবত 'দাক্ষিণাত্য' নামে আরো একটি উপভাষা ছিল। মধ্যভারতীয় আর্যভাষাতেও চারটি প্রধান উপভাষা ছিল—উত্তর-পশ্চিমা, দক্ষিণ-পশ্চিমা, মধ্যপ্রাচ্যা এবং প্রাচ্যা। পৃথিবীর আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যেও আঞ্চলিক রূপভেদের প্রমাণ অসংখ্য। আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজীর দুই প্রধানরূপ— ব্রিটিশ ও আমেরিকান। ব্রিটিশ ইংরেজীও সর্বত্র সমান নয়। উত্তর ও দক্ষিণের বিভাজনে সেখানেও দুটি রূপভেদ— Northern English ও Southern English।

অপভাষা : সমাজের ইতরশ্রেণি ও অপরাধীদের মধ্যে গোপন সাঙ্কেতিক ইঙ্গিতপূর্ণ যে-ভাষা প্রচলিত থাকে, তাকে অপভাষা বা সঙ্কেতভাষা বলে। যেমন—মাল খাওয়া (মদ্য পান), খোকা (বন্দুক) ইত্যাদি।

১২.৮ বাংলা উপভাষা

আমরা সকলেই সাধারণভাবে জানি, বাংলা উপভাষা অঞ্চলভেদে পাঁচ প্রকার— রাঢ়ী, বঙ্গালী, বরেন্দ্রী, কামরূপী ও ঝাড়খণ্ডী। তবে মহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলাভাষার উপভাষাগুলিকে দুটি প্রধানভাগে ভাগ করেছেন— প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। এই বর্গীকরণ যদিও রাষ্ট্রিক নয়, ভৌগোলিক। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ— এই রাজনৈতিক বিভাজনের পরিবর্তে ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক সীমানাই এখানের মানদণ্ড। শহীদুল্লাহ প্রাচ্য উপভাষাগুলিকে কিছুটা নতুনভাবে বিন্যস্ত করতে চেয়েছেন। একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে সেটি দেখানো হল।

১২.৯ সারসংক্ষেপ

ভাষার সাহায্যে মানুষ ভাববিনিময় করে। আর, উপভাষা হল একটি ভাষার অন্তর্গত এমন বিশেষ রূপ যা এক-একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত। অর্থাৎ একই ভাষার মধ্যে আঞ্চলিক পৃথক রূপকে উপভাষা বলে। উপভাষার বিবিধ আঞ্চলিক মাত্রা আছে। যেমন, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, পুরানিদর্শন অঞ্চল, সমরূপমূলীয় অঞ্চল, সমক্রমবিন্যাস, সন্ধি অঞ্চল, সংমিশ্রণ। সামাজিক উপভাষার বিবিধ মাত্রা— শ্রেণিগত, পেশাগত, লিঙ্গগত ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে অপভাষা বা সঙ্কেত ভাষা। ভৌগোলিক ভিত্তিতে বাংলা উপভাষার বিভাজনটি বোঝার জন্য অন্তিম বৃক্ষচিত্রটি দ্রষ্টব্য।

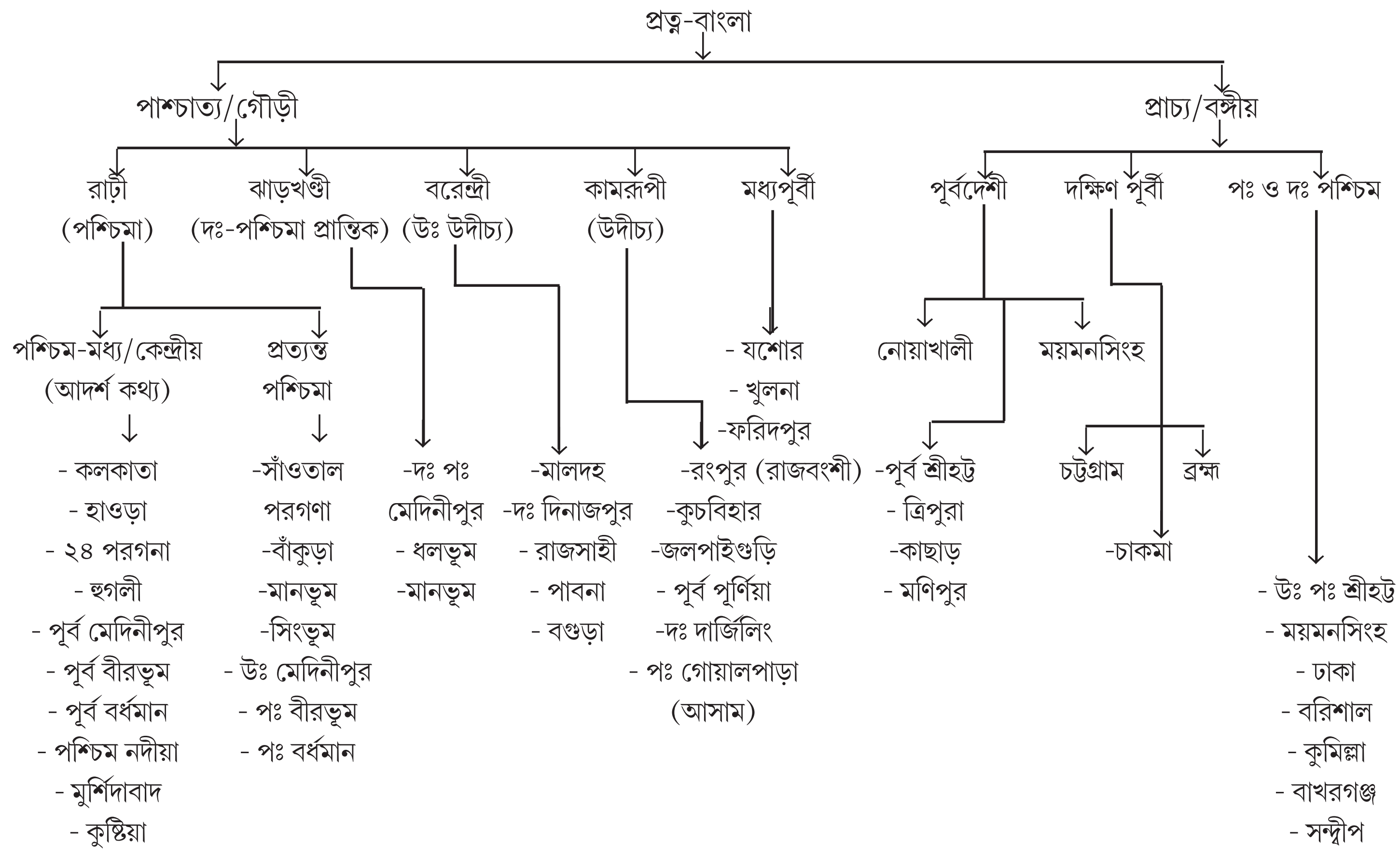

বাংলা ভাষার উপভাষা-চিত্র

১২.১০ অনুশীলনী

(ক) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. ভাষা কাকে বলে?

২. উপভাষা কাকে বলে?

৩. অপভাষার দুটি উদাহরণ দিন।

৪. বাংলা ভাষার কোন্ উপভাষাটি কলকাতায় প্রচলিত?

৫. ভাষা-সম্প্রদায় কাকে বলে?

৬. পাশ্চাত্যের দুজন সমাজভাষাবিজ্ঞানীর নাম লিখুন।

৭. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত ভাষাবিজ্ঞানের বইটির নাম ও প্রকাশকাল উল্লেখ করুন।

৮. নি-ভাষা কাকে বলে?

৯. বঙ্গালী উপভাষা কোনকোনঅঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়?

১০. প্রাচ্যবিদ্যা চর্চায় কোন কোন পণ্ডিতগণ ভাষাবৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন?

১১. বাংলা ভাষার একটি উপভাষা আসামে ব্যবহৃত হয়—এই উপভাষাটির নাম লিখুন।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. টীকা লিখুন : কেন্দ্রীয় অঞ্চল, অপভাষা।

২. উপভাষার সন্ধি অঞ্চল সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. পেশাগত দিক থেকে সামাজিক উপভাষার ভিন্নতা কীভাবে লক্ষ করা যায়?

৪. আঞ্চলিক উপভাষা কী?

৫. মধ্যভারতীয় আর্য ভাষায় কটি উপভাষা ছিল? সেগুলি কী কী?

৬. সমাজভাষাবিজ্ঞান কাকে বলে? সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চার বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৭. ভাষাবিজ্ঞানচর্চাকে কতগুলি ভাগে ভাগ করা যায় ও কীকী?

৮. একটি ভাষা কি আদর্শ ভাষা হতে পারে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

(গ) রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. ভাষা-উপভাষার পার্থক্যটি উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।

২. উপভাষার বিবিধ অঞ্চল সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. সামাজিক উপভাষা কাকে বলে? সামাজিক উপভাষার মাত্রাগুলি কী কী? সেগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

একক ১৩ ❑ বাংলা উপভাষার পরিচয় (ক)

গঠন

১৩.১ উদ্দেশ্য

১৩.২ প্রস্তাবনা

১৩.৩ রাঢ়ী উপভাষা

ক) রাঢ়ী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

খ) রাঢ়ী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১৩.৪ ঝাড়খণ্ডী উপভাষা

ক) ঝাড়খণ্ডী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

খ) ঝাড়খণ্ডী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১৩.৫ সারসংক্ষেপ

১৩.৬ অনুশীলনী

১৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষার দুটি উপভাষা—রাঢ়ী ও ঝাড়খণ্ডী উপভাষা সম্পর্কে জানতে পারবে। দুটি উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে তারা অবহিত হতে পারবে।

১৩.২ প্রস্তাবনা

ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক এবং অন্বয়তাত্ত্বিক দিক থেকে রাঢ়ী ও ঝাড়খণ্ডী উপভাষাদুটি আলোচিত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা ওই দুটি উপভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি জানার পাশাপাশি উপভাষা দুটির ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্য করতেও সমর্থ হবে।

১৩.৩ রাঢ়ী উপভাষা

(ক) রাঢ়ী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. 'অ' ধ্বনির 'ও' ধ্বনিরূপে উচ্চারণ প্রবণতা। যেমন— অতুল > ওতুল, সতী > সোতী, কথ্য > কোথ্যো, যক্ষ > যোক্‌খো, মন > মোন ইত্যাদি। ব্যতিক্রম— 'জল', কখনো 'জোল' উচ্চারণ হয় না।

২. ‘এ’ ধ্বনির ‘অ্যা’ ধ্বনিরূপে উচ্চারণ প্রবণতা। যেমন— এক > অ্যাক, কেন > ক্যান। তবে অনেকস্থানে ‘এ’ অবিকৃতরূপেই উচ্চারিত হয়। যেমন, ‘তেল’, ‘দেশ’ ইত্যাদি।

৩. ‘ই’ ও ‘উ’ যথাক্রমে ‘এ’ ও ‘ও’ রূপে অনেকক্ষেত্রে উচ্চারিত হয়। যেমন— শিকল > শেকল, চিতল > চেতল, উঠা > ওঠা, কিনা > কেনা, লিখা > লেখা ইত্যাদি।

৪. প্রত্যন্ত পশ্চিমা রাঢ়ী উপভাষায় কখনো কখনো ‘ও’ উচ্চারিত হয় ‘উ’রূপে। যেমন— পুরনো > পুরুনো, কোন্‌টা > কুনটা ইত্যাদি।

৫. পদান্ত ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণতা লোপ পায়। অর্থাৎ বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ যথাক্রমে বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণে পরিণত হয়। যেমন— গাছ > গাচ, মাথা > মাতা, গাধা > গাদা, ঝাঁঝ > ঝাঁজ, মধু > মদু, দুধ >দুদ ইত্যাদি।

৬. কখনো অঘোষ ধ্বনি, ঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়। অর্থাৎ ঘোষীভবন ঘটে। তখন, বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ যথাক্রমে বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণে পরিণত হয়। যেমন— কাক > কাগ, ছাত > ছাদ, বক > বগ, চাটনি > চাডনি ইত্যাদি।

৭. অপিনিহিতি : ‘ই’-কার জনিত — করিয়া > কইর‍্যা
‘য’-ফলা জনিত — সত্য > সইত্য, কন্যা > কইন্যা
‘উ’-কার জনিত — জলুয়া > জউলয়া ইত্যাদি

৮. অভিশ্রুতি : ই-কার জনিত — আসিয়া > আইস্যা > এস্যা > এস্যে > এসে
‘য’-ফলা জনিত — কন্যা > কইন্ন্যা > কন্ন্যা > কন্যে > কনে
‘ঋ’-কার জনিত — মাতৃকা > মাইয়া > মাইআ > মেয়া > মেয়ে

৯. নাসিক্যীভবন : যেমন— বন্ধ > বাঁধ, চন্দ্র > চাঁদ।

কখনো কখনো স্বতঃনাসিক্যীভবনও লক্ষ করা যায়। যেমন— হাসি > হাঁসি, হাসপাতাল > হাঁসপাতাল।

১০. ‘ল’ ও ‘ন’ ধ্বনির বিপর্যয় : যেমন— লাল > নাল, গুলো > গুনো, লুচি > নুচি, লোহা > নোয়া।

১১. শব্দের প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দের দ্বিমাত্রিকতা সৃষ্টি বা শব্দমধ্যগত স্বরবর্ণের লোপ। যেমন— কষটি > কষ্টি, গামোছা > গাম্‌ছা, রান্ধনা > রান্না। ব্যঞ্জনদ্বিত্ব-র উদাহরণ— সবাই > সব্বাই, বড় > বড্ড।

১২. পশ্চিমা রাঢ়ী উপভাষায় শব্দের আদিতে সুস্পষ্ট ঝোঁক বা stress-এর ফলে কখনো ‘হ’ ধ্বনির আগম ঘটে। যেমন— আমার > হামার।

(খ) রাঢ়ী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

রূপতাত্ত্বিক :

১. কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কারকের বহুবচনে '-দের' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন— কর্মকারকে : আমাদের বই দাও, করণকারকে : তোমাদের দ্বারা একাজ হবে না।

২. গৌণকর্মে '-কে' বিভক্তি যোগ। যেমন— বাবাকে বসতে বলো।

৩. অধিকরণ কারকে 'এ', 'তে' বিভক্তি যোগ। যেমন— আমি শালবনিতে থাকি, শ্যাম শ্যামনগরে যাবে।

৪. বহুবচনের প্রত্যয় অনুসর্গ যোগ : যেমন— 'গুলি', 'গুলো', 'গুনো' (গাছগুলি, কাজগুলো, কথাগুনো)। পশ্চিমা রাঢ়ীতে '-গুলাক', '-গুলান' ইত্যাদি যোগ। যেমন— ছেলেগুলান।

৫. করণকারকের অনুসর্গ 'সঙ্গে', বর্তমানে পূর্বী প্রভাবের ফলে 'সাথে' হয়ে গেছে। অপাদান কারকের অনুসর্গ 'থেকে'। বাজার থেকে সব্জি কিনে আন।

৬. বর্তমান কালের উত্তর পুরুষে ক্রিয়া বিভক্তি 'ই' যুক্ত হয়। যেমন—আমি করি, আমরা করি।

৭. সদ্য অতীতকালে প্রথম পুরুষের ক্রিয়াবিভক্তিতে '-লে' যোগ হয়। যেমন— রাম বললে। সদ্য অতীতকালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়া বিভক্তি '-লুম' (আমি করলুম), মধ্যম পুরুষে 'লে' যোগ। (তোমরা চললে)।

৮. ভবিষ্যৎকালের প্রথম পুরুষের ক্রিয়া বিভক্তি '-বে' (রাম করবে), পশ্চিমা রাঢ়ীতে '-ব্যা' (শ্যাম করব্যা), উত্তম পুরুষের ক্রিয়াবিভক্তি '-ব' (আমি যাব) যোগ।

৯. মূল ধাতুর সঙ্গে √আছ্ যোগ করে তার সঙ্গে কাল ও পুরুষের বিভক্তি যোগ করে ঘটমান বর্তমান ও ঘটমান অতীতের রূপ গঠন করা হয়। যেমন— √কর্ + ছি = করছি (আমি করছি), √কর্ + ছিল = করছিল (রাম কাজ করছিল)।

১০. মূল ক্রিয়ার অসমাপিকা রূপের সঙ্গে √আছ্ যোগ করে তার সঙ্গে ক্রিয়ার কাল ও পুরুষবাচক বিভক্তি যোগ করে পুরাঘটিত অতীত ও পুরাঘটিত বর্তমানের ক্রিয়ারূপ রচনা করা হয়। যেমন— করে + ছে = করেছে (রাম অঙ্ক করেছে), করে + ছিল = করেছিল (যদু কাজ করেছিল)।

অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

রাঢ়ী উপভাষায় নেতিবাচক বাক্যে নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে। যেমন— রমা সেখানে যাবে না। তুমি যেও না— ইত্যাদি।

১৩.৪ ঝাড়খণ্ডী উপভাষা

এই উপভাষার 'ঝাড়খণ্ডী' নামকরণ করেছেন ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেন। কিন্তু সুধীর কুমার করণের মতে, এর নাম হওয়া উচিত 'সীমান্ত রাঢ়ী'। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর নামকরণ করেছেন 'সুহ্মদেশীয়' বা 'সুহ্মক' বাংলা।

সুকুমার সেনের মতে, ঝাড়খণ্ডী অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপভাষাগুচ্ছ তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। মেদিনীপুরের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশের কথ্যভাষা রাঢ়ীর অন্তর্ভুক্ত, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম কথ্য ভাষাগুলিকে দণ্ডভুক্তীয় স্তবক বলা যায় এবং মেদিনীপুরের পশ্চিম প্রান্তের ধলভূম ও মানভূমের কথ্যভাষাগুলিকে কেন্দ্রীয় ঝাড়খণ্ডী বলা যায়।

(ক) ঝাড়খণ্ডী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. পদান্ত '-ইআ' প্রায়শই 'এ্যা' ধ্বনিতে রূপান্তরিত। যেমন—করিয়া > কর‍্যা, কোর‍্যা।

২. দ্ব্যক্ষরী বা disyllabic শব্দে আদি 'ও', পদান্ত 'আ'-কারের প্রভাবে 'অ'-কারে পরিণত। যেমন, বোকা > বকা, রোগা > রগা।

৩. অল্পপ্রাণ ধ্বনিকে মহাপ্রাণ ধ্বনিরূপে উচ্চারণের প্রবণতা দেখা যায়। যেমন— দূর > ধূর।

৪. প্রায়শই 'র' ধ্বনি 'ল' ধ্বনিতে এবং 'ন' ধ্বনি 'ল' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন— নহে > লহে, নাতি > লাতি, নিব > লিব, নাতিপুতি > লাতিপুতি, লোকেরা > লক্‌লা।

৫. আনুনাসিকতার প্রাচুর্য লক্ষণীয়। যেমন— উঁট, হাঁতি, সাঁপ ইত্যাদি।

৬. অপিনিহিতজনিত পরিবর্তনও লক্ষ করা যায়। যেমন—রাতি > রাইত, কালি > কাইল।

৭. আদিতে শ্বাসাঘাতের ফলে পদমধ্য স্বরের লোপ ও ব্যঞ্জনদ্বিত্ব পরিলক্ষিত হয়। যেমন— লোকের > লোক্কার, দুইটা > দুট্টা, দাও > দও/দ্যাও, ভিতরে > ভিত্‌রে ইত্যাদি।

(খ) ঝাড়খণ্ডী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

রূপতাত্ত্বিক :

১. কর্মকারকে '-কে' বিভক্তির প্রয়োগ। যেমন— বাবাকে কইল, জলকে চল।

২. অপাদান কারকে '-লে' অনুসর্গের ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন— ঘর লে (গৃহ থেকে)।

৩. সম্বন্ধপদ ও অধিকরণ কারকে শূন্যবিভক্তি অর্থাৎ বিভক্তিহীনতা দেখা যায়। সম্বন্ধপদে — ঘাটশিলা (ঘাটশিলার) শাড়ি মুনি (মুনির) মনে নাই লাগে। আবার অধিকরণকারকে যেমন, রাইত (রাতে) ছিলি কন?

৪. অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন হল '-নু', 'লে', 'রু' ইত্যাদি। যেমন— মায়ের লে মাউসীর দরদ (মায়ের চেয়ে মাসির দরদ)

৫. অধিকরণ কারকে কখনো '-কে' বিভক্তি লক্ষণীয়। যেমন— 'আজি রাইতকে ভারি জাড়াবে'।

৬. ক্রিয়াপদে 'ক' প্রত্যয়ের ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন— যাবেক লাই?

৭. অস্ত্যর্থক 'বঠ্' ধাতুর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন— তুমহার মিথা কথা বঠে, হামাদের ভাগে বাঁগলা বঠে।

৮. 'ল' যুক্ত বিশেষণ প্রয়োগ এই উপভাষার অন্যতম রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। যেমন— ভুক্‌লা বাঘ।

৯. বহুবচন প্রত্যয় -মন্/-মেন্-এর ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন— তারমন্‌কের, তারমেন্‌কার (তাঁদের)

১০. নামধাতুর বাহুল্য। যেমন, পুকুরের জলটা গঁধাচ্ছে, মাথাটা দুখাছে, জলটা বাসছে (< বাস 'গন্ধ')।

১১. যৌগিক ণিজন্ত পদের ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন— উঠা করালো (= উঠাইলো), আনা করাবো (= আনাইবো)।

১২. উত্তমপুরুষের সর্বনাম মুই/আমি, বহুবচনে আমরা/হামরা; মুখ্য ও গৌণ কর্মে মো-/আমা- লক্ষণীয়।

অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

নেতিবাচক বাক্যে নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে। যেমন— কেনে নাই খাবা? (কেন খাবে না?)

১৩.৫ সারসংক্ষেপ

ম

ম

১৩.৬ অনুশীলনী

(ক) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. রাঢ়ী উপভাষায় পদান্ত ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণতা লোপ পেয়েছে— এমন একটি উদাহরণ দিন।

২. হাসপাতাল > হাঁসপাতাল— এটি রাঢ়ী উপভাষার কোন্ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য?

৩. ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় যৌগিক ণিজন্ত পদব্যবহারের একটি উদাহরণ দিন।

৪. রাঢ়ী উপভাষা কোনকোন অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়?

৫. 'এসো- এখানে ধ্বনি পরিবর্তনের কোন সূত্র লক্ষণীয়? কোন উপভাষায় এই লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়?

৬. 'হামারা এর ব্যবহার কোন উপভাষায় দেখতে পাওয়া যায়?

৭. 'তুমি ওখানে যাবে না"- এটিকে ঝাড়খন্তীতে রূপান্তরিত করলে কীভাবে বলা হবে?

৮. আনুনাসিকতার প্রভাব কোন উপভাষায় লক্ষ করা যায়? উদাহরণ দিন।

৯. আজি রাইতকে ভারি জাড়াবে?- কথাটির অর্থ কী? কোন অঞ্চলের কথ্যভঙ্গি এটি?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. রাঢ়ী উপভাষার পাঁচটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উদাহরণযোগে উল্লেখ করুন।

২. ঝাড়খণ্ডী উপভাষার পাঁচটি রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উদাহরণযোগে বুঝিয়ে দিন।

৩. ঝাড়খণ্ডী উপভাষার নাম বৈচিত্র্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(গ) রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. সংক্ষেপে রাঢ়ী উপভাষা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. রাঢ়ী ও ঝাড়খণ্ডী উপভাষার পার্থক্যগুলি চিহ্নিত করুন।

৩. ঝাড়খণ্ডী উপভাষার প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করুন।

একক ১৪ ❑ বাংলা উপভাষার পরিচয় (খ)

গঠন

১৪.১ উদ্দেশ্য

১৪.২ প্রস্তাবনা

১৪.৩ বরেন্দ্রী উপভাষা

ক) বরেন্দ্রী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

খ) বরেন্দ্রী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১৪.৪ কামরূপী উপভাষা

ক) কামরূপী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

খ) কামরূপী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১৪.৫ সারসংক্ষেপ

১৪.৬ অনুশীলনী

১৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষার দুটি উপভাষা—বরেন্দ্রী ও কামরূপী উপভাষা সম্পর্কে জানতে পারবে। দুটি উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে তারা অবহিত হতে পারবে।

১৪.২ প্রস্তাবনা

ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক এবং অন্বয়তাত্ত্বিক দিক থেকে বরেন্দ্রী ও কামরূপী উপভাষাদুটি আলোচিত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা ওই দুটি উপভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি জানার পাশাপাশি উপভাষা দুটির ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্য করতেও সমর্থ হবে।

১৪.৩ বরেন্দ্রী উপভাষা

রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী মূলত একই উপভাষার অন্তর্গত ছিল। পরে একদিকে প্রাচ্য বা বঙ্গালী এবং অন্যদিকে বিহারীর প্রভাবে বরেন্দ্রী উপভাষা রাঢ়ী উপভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

(ক) বরেন্দ্রী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. 'এ' স্বরধ্বনির 'অ্যা' হিসেবে উচ্চারণ প্রবণতা। যেমন, এক > অ্যাক, যেন > য্যান।

২. পদের গোড়ায় 'র'-কারের লোপ অথবা আগম। যেমন, আমের রস > রামের অস, রাস্তা > আস্তা ইত্যাদি।

৩. জ (j) প্রায়ই জ্ (z) রূপে উচ্চারিত। যেমন, জানতি পারো না > Zanti পারো না।

৪. 'শ', 'ষ', 'স'— সব ধ্বনিই 'শ' রূপে উচ্চারিত। যেমন, বিশয় (বিষয়), শম্পৎ (সম্পদ), শে (সে) ইত্যাদি।

৫. আনুনাসিকতা লক্ষণীয়। যেমন, তাঁই (তিনি), বাঁট্যা (বাঁটিয়া)

৬. চলিত ভাষায় ড়, ঢ় ধ্বনিদ্বয় রক্ষিত। যেমন, আড়ি, আঢ়েয়া।

৭. ঘোষবৎ মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি পদান্তে অল্পপ্রাণিত। কিন্তু অন্যত্র বজায় আছে। এছাড়া আদি 'হ' ধ্বনি রক্ষিত। কিন্তু স্বরমধ্যগত 'হ' দুর্বল। যেমন, তাহাদের > তায়েদের, তাহাতে > তাহাৎ/তাৎ।

(খ) বরেন্দ্রী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. রাঢ়ীসুলভ কর্তৃকারক ব্যতীত অন্য কারকের বহুবচনে '-দের' প্রত্যয় যোগ। যেমন, তায়েদের, মদ্ধে।

২. বহুবচনের বিভক্তি 'গুলা', 'গিলা' ইত্যাদি যোগ। যেমন, কাজগুলা।

৩. অনেকসময় কর্মকারকে 'ক' বিভক্তি এবং অধিকরণকারকে 'ত' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন, হামাক দ্যান, ঘরৎ চল ইত্যাদি।

৪. অতীতকালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়াবিভক্তি '-লাম' এবং ভবিষ্যৎকালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়াবিভক্তি 'মু' বা 'ম' যুক্ত হয়। যেমন, অতীতকালে— হামি যাইলাম, ভবিষ্যতে— হামি খামু/খাম ইত্যাদি।

৫. অসমাপিকা 'ইয়া' প্রত্যয়ের স্থানে রাঢ়ীসুলভ '-এ'-র ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন, শুনিয়া যা > শুনে যা ইত্যাদি।

১৪.৪ কামরূপী উপভাষা

কামরূপী ও বরেন্দ্রীকে একত্রে উদীচ্য উপভাষা বলা যায়। কামরূপী উপভাষা বরেন্দ্রী ও বঙ্গালী উপভাষার মাঝামাঝি। কোনো কোনো বিষয়ে কামরূপী উত্তরবঙ্গের এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা পূর্ববঙ্গের উপভাষার কাছাকাছি। তবে বরেন্দ্রীর সঙ্গে কামরূপীর সাধর্ম্য-ই বেশি। কামরূপী উপভাষার পূর্বী আঞ্চলিক বিভেদ থেকেই অসমীয়া ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ।

(ক) কামরূপী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. ‘ও’-কারের ‘উ’ রূপে উচ্চারণ প্রবণতা লক্ষণীয়। যেমন, তোমার > তুমার, কোন > কুন ইত্যাদি। তবে, কোচবিহার, গোয়ালপাড়া ইত্যাদি ব্যতিক্রমী।

২. আদি ‘র’ ধ্বনির বর্জন এবং স্বরবর্ণের সংরক্ষণ। যেমন—রাজা > আজা, রাতি > আতি, রাগ > আগ।

৩. ‘চ’, ‘ছ’, ‘জ’, ‘ঝ’ ধ্বনি যথাক্রমে ‘ৎস’, ‘স’, ‘দজ’, ‘জ’ তবে, গোয়ালপাড়া, রংপুরের উচ্চারণে চ-বর্গের মূল উচ্চারণ রক্ষিত। যেমন, ‘বাচ্চা’ প্রকৃতপক্ষে ‘বাচ্চা’ রূপেই উচ্চারিত হয়।

৪. ‘ল’ ধ্বনি প্রায়শই ‘ন’ ধ্বনি হিসেবে উচ্চারিত। যেমন, লাঙল > নাঙল, লাউ > নাউ, লাল > নাল ইত্যাদি।

৫. আবার কখনো বিষমীভবনের ফলে ‘ন’ ধ্বনিও ‘ল’ ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন, জননী > জলনী, সিনান (স্নান) > সিলান ইত্যাদি।

৬. শ, স, ষ, ধ্বনি ‘শ’-এ পরিণত হয়। যেমন, আষাঢ় মাসে জাতকে বলা হয় আশারু।

৭. ‘ড়’, ‘ঢ়’ ধ্বনি আসলে ‘র’ ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন— বড় > বর, শাড়ি > শারি, আষাঢ় > আশার ইত্যাদি।

৮. স্বরের আনুনাসিকতা এই উপভাষায় রক্ষিত হয়েছে। যেমন— ইঁয়া (ইহা), কঁরো (করো) ইত্যাদি।

৯. শব্দের আদিতে ‘অ’ ধ্বনি প্রায়শই শ্বাসাঘাতের ফলে ‘আ’ ধ্বনিতে রূপান্তরিত। যেমন— আসুখ (অসুখ), আনল (অনল), আতি (অতি), কাথা (কথা) ইত্যাদি।

(খ) কামরূপী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

১. তীর্যক কারকের বহুবচনে ‘-গুলা’ যোগ। যেমন— গাছগুলা, আমার গুলার।

২. কর্মকারকে ‘ক’ বিভক্তি যোগ। যেমন— আমাকে ভুলালি > মোক্ ভুলালু, আমার খিদে পেয়েছে > মোক্ খিদান্ লাগিছে। অপাদানকারকে ‘থাকি’ অনুসর্গীয় বিভক্তি (যেমন— ঘর থাকি = ঘর থেকে), বা করণকারকে ‘দিয়া’ অনুসর্গীয় বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষণীয়। যেমন, ঘর দিয়া = ঘর দিয়ে।

৩. মধ্যমপুরুষের অতীত বা ভবিষ্যৎকালে ‘উ’ বিভক্তি (যথা, তুই করলু, তুই করবু ইত্যাদি), উত্তমপুরুষের ভবিষ্যৎকালে ‘-ম’/‘মু’ যোগ। যেমন, করিম (একবচন), করমু (বহুবচন)। কিন্তু অন্য পুরুষে ‘ব’ বা ‘বে’ বিভক্তি যোগ। যেমন, ‘করবে’।

৪. অসমাপিকা '-ই' প্রত্যয়ের ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন— করি (করিয়া), দেখি (দেখিয়া) ইত্যাদি।

৫. 'ল'-যুক্ত ভাববচন। যেমন, আসিবার সময় > আসিল্ কালে।

৬. '-ল'/-ব যুক্ত কৃদন্ত বিশেষণ : দেখিলা মান্‌ষি (=দেখা মানুষ), আসিবা দিন (=আগামী দিন)।

৭. বিশিষ্টার্থক ধাতু হিসেবে যৌগিক ক্রিয়াপদে √খা-র প্রয়োগ (খোয়া < খাদ্) লক্ষণীয়। যেমন—আগ খোয়া (= রাগ করা), মনত্ খোয়া (= মনে লাগা), হতাশ খোয়া ইত্যাদি।

অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

নঞর্থ উপসর্গ ক্রিয়াপদের পূর্বে ব্যবহৃত। যেমন— না জাঁও, না লেখিম্ ইত্যাদি।

১৪.৫ সারসংক্ষেপ

ম

ম

১৪.৬ অনুশীলনী

(ক) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. বরেন্দ্রী উপভাষায় শব্দের গোড়ায় 'র'-কারের লোপ ঘটেছে, এমন একটি উদাহরণ দিন।

২. জননী > জলনী—এটি কামরূপী উপভাষার কোন্ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, তা উল্লেখ করুন।

৩. কামরূপী উপভাষায় '-ল' যুক্ত ভাববচন ব্যবহারের একটি উদাহরণ দিন।

৪. কোনকোনউপভাষায় তিন প্রকার 'শ' ধ্বনির (শ, স, য) উচ্চারণ 'শ' তে পরিণত হয়?

৫. মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি কোন উপভাষায় পদান্তে অল্পপ্রাণে পরিণত হয়? উদাহরণসহ উল্লেখ করুন?

৬. কামরুপি উপহাসের প্রাপ্তিস্থান উল্লেখ করুন।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. বরেন্দ্রী উপভাষার পাঁচটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উদাহরণযোগে উল্লেখ করুন।

২. কামরূপী উপভাষার পাঁচটি রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উদাহরণযোগে বুঝিয়ে দিন।

৩. উদীচ্য উপভাষা কাকে বলা হয়?

৪. ‘হামাক একখান বই দ্যান’ —এটি কোনউপভাষার উদাহরণ? এই বাক্যটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপভাষার বৈশিষ্ট্য গুলি চিহ্নিত করুন।

৫. ‘মুই একলাই কাজ করিম’ —কোন উপভাষার উদাহরণ? বাক্যটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করুন।

(গ) রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. সংক্ষেপে বরেন্দ্রী উপভাষা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. বরেন্দ্রী ও কামরূপী উপভাষার পার্থক্যগুলি চিহ্নিত করুন।

৩. সংক্ষেপে কামরূপী উপভাষার প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

একক ১৫ ❑ বাংলা উপভাষার পরিচয় (গ)

গঠন

১৫.১ উদ্দেশ্য

১৫.২ প্রস্তাবনা

১৫.৩ বঙ্গালী উপভাষা

ক) বঙ্গালী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

খ) বঙ্গালী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১৫.৪ বিভিন্ন উপভাষার নিদর্শনগত পার্থক্য

১৫.৫ সারসংক্ষেপ

১৫.৬ অনুশীলনী

১৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষার বঙ্গালী উপভাষা সম্পর্কে জানতে পারবে।

১৫.২ প্রস্তাবনা

ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক এবং অন্বয়তাত্ত্বিক দিক থেকে বঙ্গালী উপভাষাটি আলোচিত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা এই উপভাষাটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি জানার পাশাপাশি রাঢ়ী, ঝাড়খণ্ডী, বরেন্দ্রী এবং কামরূপী উপভাষার থেকে বঙ্গালী উপভাষাটির পার্থক্য করতে সমর্থ হবে। বিভিন্ন উপভাষার নিদর্শনগত পার্থক্য সম্পর্কেও তারা জানতে পারবে।

১৫.৩ বঙ্গালী উপভাষা

(ক) বঙ্গালী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. ‘এ’ ধ্বনির ‘অ্যা’ ধ্বনিরূপে উচ্চারণ প্রবণতা। যেমন— তেল > ত্যাল, দেশ > দ্যাশ, দিলেন > দিল্যান।

২. ‘ও’ ধ্বনির ‘উ’ ধ্বনিরূপে উচ্চারণ প্রবণতা। যেমন— কোন > কুন, কোদাল > কুদ্যাল, কোপ > কুপ।

৩. স্বরধ্বনির অনুনাসিকতা বজায় নেই। যেমন— চাঁদ > চাদ (tsad), পাঁচ > পাচ ইত্যাদি। ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, শ্রীহট্ট ইত্যাদি স্থানে এই ধরনের উচ্চারণ প্রবণতা লক্ষণীয়।

৪. তাড়িতধ্বনি 'ড়' বা 'ঢ়' আসলে 'র' ধ্বনিতে রূপান্তরিত। যেমন— বড় > বর, গাড়ি > গারি, তাড়া > তারা।

৫. শব্দের আদি বা মধ্যস্থ ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি অর্থাৎ বর্গের চতুর্থ ধ্বনি, সঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি অর্থাৎ বর্গের তৃতীয় ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন— ভাই > বাই, ধন > দন, সভার > সবার।

৬. 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ' যথাক্রমে 'ৎস', 'স', 'দজ্', 'জ' (ts, s, dz, z) রূপে উচ্চারিত। চাঁদ > ৎসাদ, ছাওয়াল > সাওয়াল, জানা > zana।

৭. আদি 'হ' দুর্বল হওয়ায় তা লুপ্তপ্রায় ও তার ফলে কণ্ঠনালীর স্পর্শধ্বনির উদ্ভব। যেমন— হইব > 'ঐব (oibo), হয় > 'অয়।

৮. শব্দমধ্য 'ট', 'ঠ' ধ্বনি 'ড' ধ্বনিতে পরিণত। যেমন— এটা-সেটা > ইডা-সিডা, মিঠা > মিডা, ছোটোটি > সোটোডি।

৯. অঞ্চলবিশেষে 'স' ও 'শ' ধ্বনি 'হ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন— 'সে' > 'হে', সকল > হগল, শুনিয়া > হুইন্যা ইত্যাদি।

(খ) বঙ্গালী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

রূপতাত্ত্বিক :

১. কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি। যেমন— রামে গিছে, মায়ে ডাকে।

২. কর্মকারকে 'রে' বিভক্তি। আমারে দ্যাও, কারে মারতে যাও?

৩. অধিকরণকারকে 'ত', '-তে' বিভক্তি। যেমন, ঘরের কোয়ালিত্, শহরত্ আই (শহরে আসিয়া), পানিতে ভিজাও ইত্যাদি।

৪. তির্যক কারকের বহুবচনে 'রা', 'গো' অনুসর্গীয় বিভক্তি যোগ। তাগো মৈদদে (তাদের মধ্যে)।

৫. বহুবচন প্রত্যয় 'গুলি'-র বদলে 'গুনাইন', 'গুন'-র প্রয়োগ। কাজগুলি > কাজগুন।

৬. সামান্য বর্তমান দ্বারা ঘটমান বর্তমানের অর্থপ্রকাশ। মায়ে ডাকে (মায়ে ডাকিতেছে)।

৭. সদ্য অতীতে উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি '-লাম' যোগ। যেমন—আমি খাইলাম।

৮. রাঢ়ীতে যা ঘটমান বর্তমানের বিভক্তি, বঙ্গালীতে সেটা পুরাঘটিত বর্তমানের বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন— আমি করসি (< করছি)। অর্থাৎ, আমি করেছি।

৯. মধ্যম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি হল 'বা'। যেমন— তুমি যাবা না?

১০. উত্তম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যৎকালের বিভক্তি হল '-উম' ও '-মু'। আমি যামু (আমি যাবো), আমি খেলুম না (আমি খেলব না)।

১১. অতীত কালের ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নঞর্থক অব্যয় '-নাই'। যেমন— তুমি যাও নাই? (তুমি যাও নি?)

অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

অসমাপিকা ক্রিয়ার সাহায্যে গঠিত যৌগিক ক্রিয়ার সম্পন্নকালের মূল ক্রিয়াটি আগে বসে, অসমাপিকা ক্রিয়াটি পরে বসে। যেমন— শাম গ্যাসে গিয়া (শ্যাম চলে গেছে)।

১৫.৪ বিভিন্ন উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শনগত পার্থক্য

১. **রাঢ়ী :** একজন লোকের দুটি ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে ছোটোটি বাপকে বললে, 'বাবা, আপনার বিষয়ের মধ্যে যে ভাগ আমি পাবো, তা আমাকে দিন।' তাতে তাদের বাপ তার বিষয়-আশয় তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

২. **ঝাড়খণ্ডী :** এক লোকের দুটা বেটা ছিল। তাদের মাঝে ছুটু বেটা তার বাপকে বল্লেক, 'বাপ্ হে, আমাদের দৌলতের যা হিস্বা আমি পাব তা আমাকে দাও।' এতে তার বাপ আপন দৌলৎ বাখরা করে তার হিস্বা তাকে দিলেক।

৩. **বরেন্দ্রী :** য়্যাক্ কোন্ মানুষের দুটা ব্যাটা আছ্লো। তার ঘোর বিচে ছোট্কা আপ্নার বাবাক্ কহ্লে, 'বাব ধন্-করির যে হিস্যা হামি পামু, সে হামাক দে।' তাৎ তাঁই তারঘোরকে মালমাত্তা সব ব্যাঁটা দিলে।

৪. **কামরূপী :** এক জনা মান্সির্ দুই কোনা বেটা আছিল্। তার মদ্দে ছোটজন উয়ার বাপোক্ কইল, 'বা, সম্পত্তির যে হিস্যা মুই পাইম্ তাক্ মোক্ দেন।' তাতে তাঁয় তার মালমাত্তা দোনো ব্যাটাক্ বাটিয়া-চিরিয়া দিল।

৫. **বঙ্গালী :** য়্যাক্ জনের দুইডী ছাওয়াল আছিলো। তাগো মৈদ্দে ছোটডি তার বাপেরে কৈলো, "বাবা, আমার বাগে যে বিত্তি-ব্যাসাদ্ পরে, তা আমারে দ্যাও।" তাতে তিনি তান্ বিষয়-সোম্পত্তি তাগো মৈদ্দে বাইটা দিল্যান।

১৫.৫ সারসংক্ষেপ

ম

ম

১৫.৬ অনুশীলনী

(ক) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. একটি উদাহরণ দিয়ে দেখান, বঙ্গালী উপভাষায় ‘ও’ ধ্বনির কীভাবে ‘উ’ ধ্বনিরূপে উচ্চারণ প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

২. বঙ্গালী উপভাষায় অধিকরণকারকে ‘ত্’ বিভক্তি প্রয়োগের একটি উদাহরণ দিন।

৩. ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি কাকে বলে? কোন উপভাষায় ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধরিতে পরিণত হয়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৪. ‘হামাগো বাড়িতে হগগলটি মানুষের জ্বর’ —কোন উপভাষার বৈশিষ্ট্য এই বাক্যে লক্ষ করা যায়?

৫. বঙ্গালী উপভাষায় তির্যক কারকের বহুবচনে কোন বিভক্তি ব্যবহৃত হয়?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. বঙ্গালী উপভাষার পাঁচটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উদাহরণসহ উল্লেখ করুন।

২. বঙ্গালী উপভাষার পাঁচটি রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উদাহরণযোগে বুঝিয়ে দিন।

(গ) রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. বঙ্গালী উপভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২. বঙ্গালী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য স-দৃষ্টান্ত আলোচনা করুন।

৩. বঙ্গালী উপভাষার রূপতাত্ত্বিক ও অন্বয়তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

একক ১৬ ❑ সাধু ও চলিত ভাষা

গঠন

১৬.১ উদ্দেশ্য

১৬.২ প্রস্তাবনা

১৬.৩ সাধু ও চলিত ভাষা কাকে বলে?

১৬.৪ সাধু ও চলিত ভাষা ব্যবহারের ইতিহাস

১৬.৫ সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য

১৬.৬ সাধু ও চলিত ভাষার নিদর্শন এবং রূপান্তর

১৬.৭ সারসংক্ষেপ

১৬.৮ অনুশীলনী

১৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা সাধু ও চলিত ভাষা সম্পর্কে জানতে পারবে।

১৬.২ প্রস্তাবনা

বাংলা ভাষায় সাধু ও চলিত ভাষা ব্যবহারের ইতিহাস, সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা বলতে আমরা কী বুঝি, সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য এবং সাধু ও চলিত ভাষার কিছু নিদর্শনসহ সাধু থেকে চলিত ও চলিত থেকে সাধু ভাষার রূপান্তর-ই এই এককের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

১৬.৩ সাধু ও চলিত ভাষা কাকে বলে?

পৃথিবীর সমস্ত উন্নত ভাষার মতো বাংলা গদ্যেরও দুটি রূপ—সাহিত্যিক রূপ ও মৌখিক রূপ। বাংলা ভাষার যে-রূপটির আশ্রয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বাংলা গদ্য-গ্রন্থাদি রচিত রচিত হয়েছিল, সেই সাহিত্যিক রূপটির নাম সাধু ভাষা। অন্যদিকে বাংলা ভাষার যে-রূপটি জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে মৌখিক প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে, সেই মৌখিক রূপটির নাম চলিত ভাষা। এই ভাষা মানুষের মুখের ভাষা। সাধু ভাষা হল মার্জিত, সুপরিকল্পিত ও বিন্যস্ত। আর চলিত ভাষা হল অপেক্ষাকৃত অমার্জিত, অপরিকল্পিত ও অবিন্যস্ত।

মূলত বিশুদ্ধ সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ, মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার শব্দরূপ-ক্রিয়ারূপ, বিভক্তি-অনুসর্গ-যোগে

গড়ে-ওঠা সাধু ভাষা ছিল অনেকাংশে কৃত্রিম, বিদগ্ধ, ধীর-গম্ভীর ভাষা— যার ব্যবহার শুধু সাহিত্য ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যদিকে চলিত ভাষা হল জীবন্ত ভাষা। বাংলার মানুষের মুখের জীবন্ত ভাষার যে-পাঁচটি প্রধান উপভাষা (রাঢ়ী, বঙ্গালী, বরেন্দ্রী, কামরূপী ও ঝাড়খণ্ডী), সেগুলির মধ্যে রাঢ়ীর কলকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চল যেমন— হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, উত্তর চব্বিশ পরগণা ইত্যাদি স্থানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এই সর্ববঙ্গীয় আদর্শ চলিত বাংলা (Standard Colloquial Bengali = SCB)।

এই চলিত ভাষার শব্দভাণ্ডারে কিছু বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ আছে বটে; কিন্তু এর মূল সম্পদ হল সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে-আসা বিপুল তদ্ভব শব্দভাণ্ডার এবং এদেশের আর্যপূর্ব জাতিদের ভাষা থেকে স্বাভাবিকভাবে গৃহীত দেশি শব্দসমূহ। এর শব্দরূপ, ক্রিয়ারূপ, বাক্য গঠন মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষা থেকে গৃহীত নয়; একালের মুখের জীবন্ত ভাষা থেকে গৃহীত। এই ভাষা এখন যেমন শিক্ষিতজনের মৌখিক ভাববিনিময়ের মার্জিত মাধ্যম; তেমনি এই ভাষা এখন সাহিত্যের ভাষা।

১৬.৪ সাধু ও চলিত ভাষা ব্যবহারের ইতিহাস

ঊনবিংশ শতাব্দীতে খ্রিস্টান মিশনারী ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকেরা যখন বাংলায় ধর্মগ্রন্থ ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে উদ্যোগী হন, তখন তাঁদের সামনে সাহিত্যিক গদ্যের কোনো আদর্শ ছিল না। বাঙালির মুখে গদ্য ভাষার ব্যবহার তাঁরা শুনেছিলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু এই মৌখিক ভাষা গুরুগম্ভীর বিষয়ের মাধ্যম হিসেবে হয়তো তাঁরা গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। তাই তাঁরা ভাষাকে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর করার জন্যে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ভাষা থেকে ক্রিয়ারূপ, শব্দরূপ, বিভক্তি, অনুসর্গ ইত্যাদি গ্রহণ করেন এবং মূলত তৎসম শব্দ ও কিছু আরবী, ফারসি, দেশি শব্দ নিয়ে বাংলা সাধু ভাষার মূল কাঠামোটি প্রথম রচনা করেন। এঁদের মধ্যে যাঁর হাতে বাংলা সাধু গদ্যের প্রাথমিক রূপটি বিশেষভাবে গড়ে উঠেছিল, তিনি হলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

ক্রমশ এই সাধু গদ্যের আরো যুক্তিনির্ভর দৃঢ়পিনদ্ধ রূপ রচনা করেন রামমোহন রায়। তিনিই প্রথম তাঁর 'বেদান্ত' গ্রন্থে (১৮১৫) 'সাধুভাষা' শব্দটি ব্যবহার করেন।

মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহনের গঠিত সাধু গদ্যের কাঠামোতে ছন্দঃস্পন্দন ও শিল্পগুণ সঞ্চারিত করে একে প্রথম আবেগ অনুভূতি প্রকাশের যোগ্য মাধ্যম করে তোলেন বিদ্যাসাগর। অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীদের সূত্রে এই ধারা পুষ্ট হতে থাকে। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে এসে বাংলা সাধু গদ্য পূর্ণ বিকশিত রূপ লাভ করে— একাধারে সৃজনধর্মী ও মননধর্মী সাহিত্যের যোগ্য প্রকাশমাধ্যম হয়ে ওঠে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে ক্রমে এই ধারায় একটা সরলীকরণের প্রবণতা ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে এবং সাধুগদ্য তার আভিজাত্যের সিংহাসন থেকে জনজীবনের ভাষার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। শরৎচন্দ্র তাঁর

উপন্যাসে পাত্রপাত্রীর সংলাপে চলিত গদ্য ব্যবহার করেছেন। শুধু বর্ণনায় ও বিবৃতিতে রেখেছেন সাধু গদ্য। সাধু গদ্যেও শুধু পুরোনো কাঠামোটুকুই বজায় রেখেছেন তিনি; তার শব্দসম্ভারে এনেছেন জীবন্ত ভাষার উপাদান। শরৎচন্দ্রের এই ধারাই মোটামুটিভাবে অনুসরণ করেছেন বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক। এদের মধ্যে বিশেষভাবে বিভূতিভূষণের হাতে বাংলা গদ্য সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাধর্মী প্রকাশমাধ্যমরূপে চরম বিকাশ লাভ করেছে। তারপর ক্রমে সাধুগদ্যের বাহ্য কাঠামোটুকুও খসে গেছে এবং বাংলা সাহিত্য থেকে সাধু গদ্য বিদায় গ্রহণ করেছে।

সাহিত্যে চলিত গদ্যের ব্যবহার প্রথমে ক্ষীণ ধারায় সূচিত হয় এবং ক্রমে পরিপুষ্টি লাভ করে। উইলিয়াম কেরীর 'কথোপকথন'-এ বিভিন্ন শ্রেণির সংলাপে ব্যবহৃত গদ্য যদিও সর্ববঙ্গীয় ব্যবহারের উপযোগী আদর্শ চলিত বাংলা ছিল না; তবু এখানেই মৌখিক গদ্য সাহিত্যে প্রথম প্রবেশাধিকার লাভ করে। পরে, বিদ্যাসাগরের শকুন্তলার সংলাপে ইতস্ততভাবে কিছু চলিত গদ্যের ব্যবহার দেখা যায়।

ইংরেজ শাসনের সময় কলকাতা বাংলার রাজধানী এবং আইন-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের সময়েও শিক্ষা-সাহিত্যচর্চা-সামাজিক আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল কলকাতা। ফলে, কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভাষা প্রাধান্য পায় ও শিক্ষিত ব্যক্তির ভাববিনিময়ের সার্বজনীন মাধ্যম হয়ে ওঠে। এই কলকাতা অঞ্চলের চলিত ভাষাকে, কিঞ্চিৎ সাধুভাষার মিশ্রণসহ, সাহিত্যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বলিষ্ঠ আসন দেন প্যারিচাঁদ মিত্র তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)-এ, আর, কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় (১৮৬২)।

বঙ্কিমচন্দ্র, প্যারীচাঁদ মিত্রের ব্যবহৃত কথ্য ভাষাকে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং এই ভাষাকে 'অপর ভাষা' নামে বা, 'প্রচলিত ভাষা' নামে অভিহিত করেছিলেন। হয়তো, এই 'প্রচলিত ভাষা' থেকেই পরবর্তীকালে 'চলিত ভাষা' কথাটির প্রচলন হয়। এরপর থেকেই কলকাতা অঞ্চলের কথ্য বাংলার ওপর ভিত্তি করে আদর্শ চলিত বাংলার সর্বজনীন রূপ গড়ে তোলার এবং সাহিত্যে তার ব্যাপক প্রতিষ্ঠার জন্যে আন্দোলন সূচিত হয়। বিবেকানন্দের মতো সন্ন্যাসী সংস্কারকও সেক্ষেত্রে আশচর্য দূরদৃষ্টি ও বাস্তববোধের সঙ্গে চলিত ভাষার পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। ইতিমধ্যে বাংলা নাটকের সংলাপে চলিত গদ্যের ব্যবহার হয়েই আসছিল। উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সাধারণত সাধু গদ্যের ব্যবহার করলেও সংলাপে কোথাও কোথাও চলিত গদ্যের ব্যবহার করেছিলেন।

১৯১৪ সালে যখন প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশ করে চলিত গদ্যের জন্য ব্যাপক সাহিত্য আন্দোলন শুরু করেন, তখন রবীন্দ্রনাথও তাতে উৎসাহিত হয়ে সাহিত্যে সাধু গদ্যের ব্যবহার প্রায় ছেড়েই দেন এবং পুরোপুরি চলিত গদ্যে লেখা শুরু করেন। এরপর থেকেই ক্রমে সাহিত্যে চলিত গদ্য একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

একদিকে শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টায় সাধু গদ্য ক্রমশ সরলীকৃত হয়ে মৌখিক গদ্যের

কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। অন্যদিকে চলিত গদ্য আঞ্চলিকতার গণ্ডী পেরিয়ে প্রমথ চৌধুরীর হাতে মার্জিত রূপ ধারণ করেছে। ফলে সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ কমতে থাকে।

১৬.৫ সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য

১. সাধারণত সাধু ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ বেশি। কিন্তু চলিত ভাষায় তদ্ভব ও দেশি-বিদেশি শব্দের আধিক্য দেখা যায়।

২. সমাসবদ্ধ পদের সংখ্যা সাধু ভাষায় বেশি। চলিত ভাষায় তা অপেক্ষাকৃত অনেক কম।

৩. সাধু ভাষায় সর্বনামের পূর্ণ বিস্তৃত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'যাহা', 'তাহা', 'যাহার', 'তাহার', 'যাহাদের', 'যাহাদিগের', 'তাহাদিগের', 'ইহা', 'উহা' ইত্যাদি। চলিত ভাষায় সর্বনামের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন, 'তা', 'যা', 'তার', 'যার', 'তাদের', 'যাদের', 'এ', 'ও' ইত্যাদি।

৪. ক্রিয়ারও অনেকক্ষেত্রে সাধু ভাষায় দীর্ঘরূপ প্রচলিত। চলিত ভাষায় প্রচলিত সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন, সাধু ভাষায় 'করিয়া', 'করিতেছি', 'করিয়াছি', 'করিয়াছিলাম' চলিত ভাষায় যথাক্রমে 'করে', 'করছি', 'করেছি', 'করেছিলাম' ইত্যাদি।

৫. বিভক্তির বদলে ব্যবহৃত কতকগুলি অনুসর্গেও সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন, সাধু ভাষার অনুসর্গ 'দ্বারা', 'সহিত', 'সমভিব্যাহারে', 'হইতে', 'অভ্যন্তরে' ইত্যাদি। চলিত ভাষার রূপ— 'দিয়ে', 'সঙ্গে', 'থেকে', 'ভেতরে', 'মধ্যে' ইত্যাদি।

৬. যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার সাধু ভাষায় বেশি, চলিত ভাষায় তা অপেক্ষাকৃত অনেক কম। যেমন, সাধু ভাষা— গমন করা, শয়ন করা, শ্রবণ করা, আহার করা ইত্যাদি। চলিত ভাষায়— যাওয়া, শোয়া, শোনা, খাওয়া ইত্যাদি।

৭. কথ্য ভাষায় প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন (Proverbs) ও বিশিষ্টার্থক পদগুচ্ছ (Idioms) চলিত ভাষায় সহজেই খাপ খেয়ে যায়। সাধু ভাষায় সেগুলির প্রয়োগ বিরল।

৯. সাধু ভাষার বাক্যে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া— এই বিন্যাসক্রম সাধারণত লঙ্ঘন করা হয় না। চলিত ভাষার বাক্যে পদের বিন্যাসক্রম অতখানি যান্ত্রিক নয়, অনেকখানি নমনীয়।

১৬.৬ সাধু ও চলিত ভাষার নিদর্শন ও রূপান্তর

সাধু থেকে চলিত :

সাধু : 'বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন-কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির

বলিয়া একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জালনার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ—মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই।' (রবীন্দ্রনাথ)

চলিত : বাড়ির বাইরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমনকি বাড়ির ভেতরেও আমরা সব জায়গায় যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করতে পারতাম না। সেজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল থেকে দেখতাম। বাহির বলে একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল যা আমার অতীত, অথচ যার রূপ শব্দ গন্ধ দরজা-জানলার নানা ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে এদিক-ওদিক থেকে আমাকে চকিতে ছুঁয়ে যেত। সে যেন গরাদের ফাঁক দিয়ে নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করার নানা চেষ্টা করত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ— মিলনের উপায় ছিল না, সেজন্যে প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছে গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নি। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাইরেই।

চলিত থেকে সাধু :

চলিত : 'সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন-জাগা পঙ্কস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে—সেদিন পশু নেই, পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই, চারদিকে পাথর, পাঁক আর জল। কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সূর্যের দিকে জোড় হাত তুলে বলেছে, 'আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব রৌদ্রে-বাদলে— দিনে-রাত্রে।' গাছের সেই রব আজও উঠছে বনে-বনে, পর্বতে-প্রান্তরে; তাদেরই শাখায় পত্রে ধরনীর প্রাণ ব'লে ব'লে উঠছে, 'আমি থাকব, আমি থাকব।'

(রবীন্দ্রনাথ)

সাধু : সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে যেদিন সমুদ্রের গর্ভ হইতে নব-জাগরিত পঙ্কস্তরের ভিতরে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠাইয়াছে— সেদিন পশু নাই, পাখি নাই, জীবনের কলরব নাই, চারিদিকে পাথর পঙ্ক আর জল। কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সূর্যের দিকে জোড় হাত তুলিয়া বলিয়াছে, 'আমি থাকিব, আমি বাঁচিব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়া অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করিব রৌদ্রে-বাদলে— দিনে-রাত্রে।' গাছের সেই রব আজও বনে-বনে, পর্বতে-প্রান্তরে উঠিতেছে; তাহাদেরই শাখায় পত্রে ধরনীর প্রাণ বলিয়া বলিয়া উঠিতেছে, 'আমি থাকিব, আমি থাকিব।'

১৬.৭ সারসংক্ষেপ

সাধু ভাষা হল মার্জিত, সুপরিকল্পিত এবং বিন্যস্ত। আর চলিত ভাষা হল অপেক্ষাকৃত অমার্জিত, অপরিকল্পিত ও অবিন্যস্ত। সাধু ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে তৎসম শব্দের আধিক্য। অন্যদিকে মূলত তদ্ভব এবং দেশি শব্দসমূহই চলিত ভাষার প্রাণ। প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের সূত্রে সাধু ভাষায় বাংলা গদ্য পরিপুষ্টি লাভ করে। ক্রমে সাধু-র বদলে চলিত গদ্যই হয়ে ওঠে বাংলা সাহিত্যের প্রকাশমাধ্যম। সমাসবদ্ধ পদের সংখ্যা, সর্বনাম-ক্রিয়াপদের পূর্ণরূপ ব্যবহার, যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার ইত্যাদির নিরিখে সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

১৬.৮ অনুশীলনী

(ক) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. সাধু ভাষা কাকে বলে?

২. চলিত ভাষা কাকে বলে?

৩. 'সাধুভাষা' শব্দটি প্রথম কোথায় ব্যবহৃত হয়?

৪. চলিত ভাষাকে 'অপর ভাষা' বা 'প্রচলিত ভাষা' নামে কে অভিহিত করেছিলেন?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. সাধু ভাষা বলতে কী বোঝেন, উদাহরণ যোগে বুঝিয়ে দিন।

২. চলিত ভাষা ব্যবহারের ইতিহাসটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

(গ) রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য উদাহরণযোগে বুঝিয়ে দিন।

২. সাধু ও চলিত ভাষা ব্যবহারের ইতিহাসটি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করুন।

একক ১৭,১৮ ❑ বাংলা শব্দভাণ্ডার

গঠন

১. উদ্দেশ্য

২. প্রস্তাবনা

৩. বাংলা শব্দভাণ্ডারের উৎসগত বিভাজন

৪. বিভাজনগুলির সংজ্ঞা ও উদাহরণ

৫. সারসংক্ষেপ

৬. অনুশীলনী

৭. স্নাতক বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. উদ্দেশ্য

প্রতিটি ভাষাই অপরাপর বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দঋণ গ্রহণ এবং অতিরিক্ত উপাদান বর্জনের মাধ্যমে সংগঠিত হয়। ভাষা সংগঠন প্রতিনিয়ত নানা বিবর্তনের ধারার মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হয়। কোন ভাষা যদি গ্রহণ বর্জন ব্যতিরেকে নিজেকে সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ করে তোলে তাহলে সেই ভাষার গতিও রুদ্ধ হয়। বাংলা ভাষা প্রতিনিয়ত তার জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ভাষার ভাণ্ডার থেকে ঋণগ্রহণের মাধ্যমে ঋদ্ধ হয়েছে। দেখা যায় বাংলা শব্দ ভাণ্ডার আরবি, ফারসি, ইংরেজি, চিনা, জাপানি, পর্তুগিজ, সাঁওতালি, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় প্রকৃতি বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর ঋণগ্রহণ করে সমৃদ্ধ হয়েছে।

এই একক দু'টি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা বাংলা শব্দভাণ্ডার সম্পর্কে জানতে পারবে।

২. প্রস্তাবনা

বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে কী ধরনের শব্দ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেই শব্দগুলিকে কোন্ কোন্ শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়, প্রত্যেকটি বিভাজনের সংজ্ঞা-সহ উদাহরণের ভিত্তিতেই এই একক দু'টি গঠন করা হয়েছে।

৩. বাংলা শব্দভাণ্ডারের উৎসগত বিভাজন

বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে উৎসগত বিচারে মোট তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়— (১) মৌলিক বা নিজস্ব, (২) আগন্তুক বা কৃতঋণ এবং (৩) নবগঠিত।

মৌলিক বা নিজস্ব শব্দের তিনটি বিভাজন— তৎসম, অর্ধতৎসম এবং তদ্ভব। তৎসম শব্দের আবার দু'টি ভাগ— সিদ্ধ তৎসম ও অসিদ্ধ তৎসম। তদ্ভব শব্দকেও দু'ভাগে ভাগ করা যায়— নিজস্ব তদ্ভব এবং কৃতঋণ বা বিদেশি তদ্ভব দ্রাবিড়, অস্ট্রিক ইত্যাদি।

আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ মূলত দুই প্রকার— দেশি এবং বিদেশি। দেশি শব্দের দুই ভাগ— অনার্য এবং আর্য। বিদেশি শব্দের মধ্যে বিবিধ বিদেশি শব্দ যেমন—ইংরেজী, জার্মান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

নব-গঠিত শব্দেরও দুই ভাগ— অবিমিশ্র এবং মিশ্র বা সংকর। অর্থাৎ—

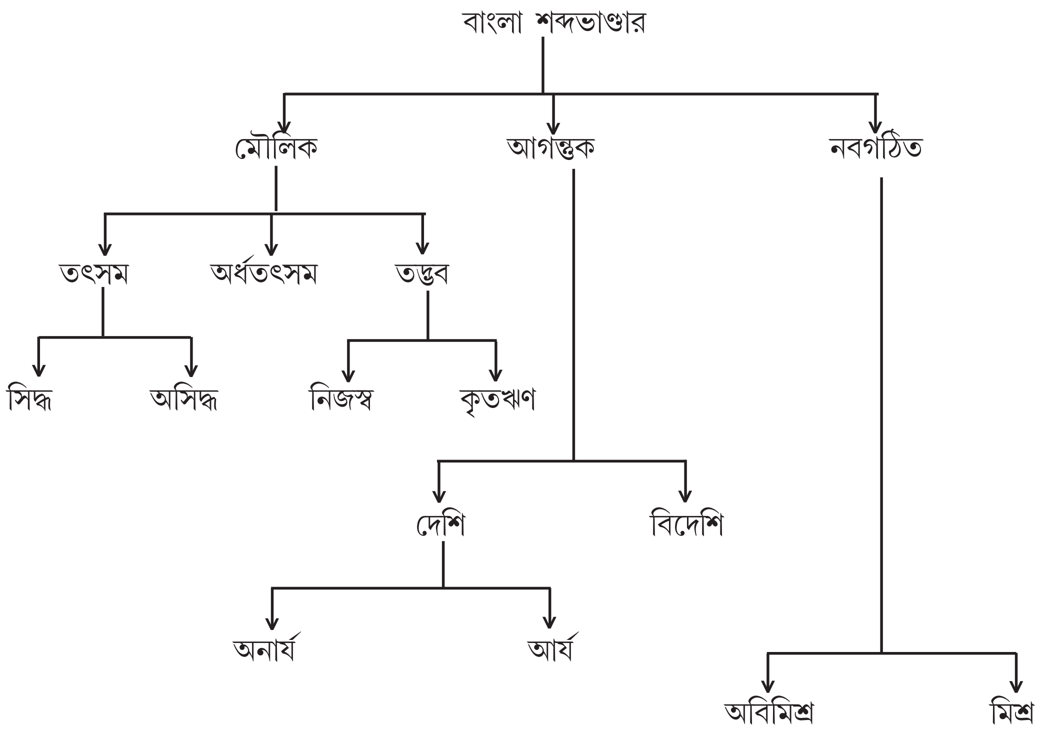

৪. বিভাজনগুলির সংজ্ঞা ও উদাহরণ

১. তৎসম শব্দ : যে-সমস্ত শব্দ সংস্কৃত থেকে সরাসরি অবিকৃতভাবে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে, তাদের তৎসম শব্দ বলে। 'তদ্' শব্দের অর্থ হল 'সংস্কৃত'। 'সম' শব্দের অর্থ হল 'সমান'। সুতরাং, 'তৎসম' শব্দটির প্রকৃত অর্থ 'সংস্কৃতের সমান'। অর্থাৎ, সংস্কৃত শব্দই অপরিবর্তিত আকারে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করেছে। মূল সংস্কৃত শব্দের প্রথমার একবচনের রূপটিই বাংলায় গৃহীত হয়েছে। অবশ্য অনেকক্ষেত্রে শব্দের শেষস্থ বিসর্গ (ঃ) বা ম্ (ং) বর্জিত হয়েছে। বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রায় অর্ধাংশ এই তৎসম শব্দে পুষ্ট।

যেমন—সংস্কৃত, ভাণ্ডার, শব্দ, অবিকৃত, ব্যবহৃত, তৎসম, তদ্ভব, শর, উদাহরণ, পিতা, মাতা, শিক্ষালয়, আচার্য, শিক্ষক, সকল, পদ, গজ, কৃষ্ণ, সূর্য, মিত্র, জীবন, মৃত্যু, বৃক্ষ, লতা, নারী, পুরুষ ইত্যাদি।

তৎসম শব্দগুলিকে আবার দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। সিদ্ধ তৎসম ও অসিদ্ধ তৎসম।

সিদ্ধ তৎসম : যে-সমস্ত শব্দ বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় এবং যেগুলি ব্যাকরণ সিদ্ধ, সেগুলিই হল সিদ্ধ তৎসম শব্দ। যেমন— সূর্য, মিত্র, কৃষ্ণ, নর, লতা ইত্যাদি।

অসিদ্ধ তৎসম : যে-সমস্ত শব্দ বৈদিক বা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না ও সংস্কৃত ব্যাকরণ সিদ্ধ নয়; অথচ প্রাচীনকালে মৌখিক সংস্কৃতে প্রচলিত ছিল, সেগুলিকেই সুকুমার সেন অসিদ্ধ তৎসম শব্দ বলেছেন। যেমন— কৃষাণ, ঘর, চাল, ডাল ইত্যাদি।

২. অর্ধতৎসম শব্দ : যে-সমস্ত সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতের পথ অনুসরণ না করে সরাসরি বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হতে চেয়েছে, অথচ তৎসম শব্দের মতো নিজের অকৃত্রিম রূপটি বজায় রাখতে পারেনি, তাদের সেই বিকৃত রূপকেই অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে। এই শব্দগুলিকে অনেকসময় ভগ্ন-তৎসম নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

যেমন— কৃষ্ণ > কেষ্ট, তৃষ্ণা > তেষ্টা, বৈষ্ণব > বোষ্টম, উৎসন্ন > উচ্ছন্ন, শ্রাদ্ধ > ছেরাদ্দ, নিমন্ত্রণ > নেমন্তন্ন, কীর্তন > কেত্তন, প্রসন্ন > পেসন্ন, প্রদীপ > পিদিম, প্রণাম > পেন্নাম, ভ্রম > ভেরম, বৃহস্পতি > বেস্পতি বা বিস্যুত, চন্দ্র > চন্দোর, মহোৎসব > মোচ্ছব, গৃহিণী > গিন্নী, ত্র্যহস্পর্শ > তেরস্পর্শ, ক্ষুধা > খিদে, রাত্রি > রাত্তির ইত্যাদি।

২. তদ্ভব শব্দ : যে-সমস্ত শব্দ সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার থেকে যাত্রা করে প্রাকৃতের পথে নির্দিষ্ট নিয়মে ধারাবাহিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসে নতুনরূপে বাংলা ভাষায় প্রবেশলাভ করেছে, তাদের তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দ বলে।

'তদ্' শব্দের অর্থ হল 'সংস্কৃত' এবং 'ভব' শব্দের অর্থ হল 'উৎপন্ন'। অর্থাৎ 'তদ্ভব' শব্দটির প্রকৃত অর্থ হল 'সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন'।

যেমন—

১.	সংস্কৃত	কৃষ্ণ	>	প্রাকৃত	কন্‌হ	>	তদ্ভব	কানু / কানাই
২.	,,	কর্ণ	>	,,	কনণ	>	,,	কান
৩.	,,	চন্দ্র	>	,,	চান্দ	>	,,	চাঁদ
৪.	,,	বধূ	>	,,	বহু	>	,,	বউ
৫.	,,	অদ্য	>	,,	অজ্জ	>	,,	আজ
৬.	,,	রাধিকা	>	,,	রাহিআ	>	,,	রাই
৭.	,,	সন্ধ্যা	>	,,	সঞ্ঝা	>	,,	সাঁঝ

৮.	,,	হস্ত	>	,,	হত্থ	>	,,	হাত
৯.	,,	খাদতি	>	,,	খাঅই	>	,,	খায়
১০.	,,	প্রবিশতি	>	,,	পবিসই	>	,,	পৈশে, পশে
১১.	,,	কথয়তি	>	,,	কহেই	>	,,	কহে, কয়
১২.	,,	শৃণোতি	>	,,	সুণই	>	,,	শোনে, শুনে

এছাড়া অন্যান্য তদ্ভব শব্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— অধস্তাৎ > হেঁট, অপর > আর, অপস্মরতি > পাসরে, অবিধবা > এয়ো, অলক্ত > আলতা, অশীতি > আশি, অষ্ট > আট, অষ্টপ্রহরীয় > আটপৌরে, অষ্টাদশ > আঠারো, অষ্টবিংশতি > আটাশ, অর্গলয়তি > আগলায়, অক্ষপাট > আখড়া, আত্মন > আপন, আকর্ষণী > আঁকষি, আদিত্য > আইচ (পদবী), আবিশতি > আসে, আরাত্রিক > আরতি, ইন্দ্রাগার > ইঁদারা, উপাধ্যায় > ওঝা, এতদ্ > এই, একাদশ > এগারো, কঙ্কণ > কাঁকন, কর্কট > কাঁকড়া, চন্দ্রাতপ > চাঁদোয়া, স্নেহবৃত্ত > নেওটা, হরিদ্রা > হলুদ, প্রতিবেশী > পড়শী, সপত্নী > সতিন, মণ্ডপ > মেরাপ, বন্যা > বান, সাগর > সায়র, সামন্তপাল > সাঁওতাল, নবনীত > ননী, দেবদারু > দেওদার, তন্ত্র > তাঁত, গ্রাম > গাঁও, গা, কেতক > কেয়া, গাত্র > গতর।

লক্ষণীয়, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব— উভয় শব্দেরই মূল হল সংস্কৃত এবং উভয়েই মূল সংস্কৃতের রূপটি হারিয়ে ফেলেছে। তবে, তদ্ভব শব্দের মধ্যে ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের স্বাক্ষরটি স্পষ্ট। কিন্তু অর্ধতৎসম শব্দের উদ্ভবের প্রেক্ষাপটে উচ্চারণ বিকৃতিই বড়ো কথা। মূল সংস্কৃত শব্দ 'কৃষ্ণ' ধারাবাহিক রূপান্তরের ফলে 'কানু' ('কানাই') এই তদ্ভব রূপটি পেয়েছে। আর, উচ্চারণ বিকৃতির ফলে অর্ধ-তৎসম 'কেষ্ট' রূপটি পেয়েছে। অবাঙালির মুখে এই 'কেষ্ট' শব্দটি আবার খুব তাড়াতাড়ি 'কিষ্ট' রূপলাভ করেছে। সাধু-চলিত নির্বিশেষে উভয় রীতির ভাষাতেই তদ্ভব শব্দাবলীর বিশেষ সমাদর আছে। কিন্তু সাবেকি আলাপ-পরিচয় এবং চলিত ভাষার রচনা ছাড়া সাধু ভাষায় অর্ধ-তৎসম শব্দের বড়ো একটা স্থান নেই।

তদ্ভব শব্দকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—নিজস্ব তদ্ভব ও কৃতঋণ তদ্ভব।

নিজস্ব তদ্ভব : যে-সব শব্দ যথার্থই বৈদিক বা সংস্কৃতের নিজস্ব শব্দের পরিবর্তনের ফলে এসেছে, সেগুলিকে নিজস্ব তদ্ভব শব্দ বলা যায়। যেমন— ইন্দ্রাগার > ইন্দাআর > ইঁদারা, উপাধ্যায় > উবজ্ঝাঅ > ওঝা ইত্যাদি।

কৃতঋণ তদ্ভব : যে-সব শব্দ প্রথমে বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের অন্য ভাষা থেকে বা ইন্দো-ইউরোপীয় ছাড়া অন্য বংশের ভাষা থেকে কৃতঋণ শব্দ (loan word) হিসেবে এসেছিল এবং পরে প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তন লাভ করে বাংলায় এসেছে, সেই সমস্ত শব্দকে কৃতঋণ তদ্ভব বা বিদেশি তদ্ভব শব্দ বলে। যেমন— ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অন্য ভাষা থেকে— গ্রিক দ্রাখ্‌মে

(drakhme = মুদ্রা) > সংস্কৃত দ্রম্য > প্রাকৃত দম্ম > বাংলা দাম। আর, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ ছাড়া অন্য ভাষাবংশ থেকে আগত তদ্ভব শব্দের উদাহরণ হল— দ্রাবিড় ভাষাবংশের তামিল পিল্লৈ > সংস্কৃত পিল্লিক > প্রাকৃত পিল্লিঅ > বাংলা পিলে (ছেলেপিলে), তামিল কাল্ > সংস্কৃত খল্ল > প্রাকৃত খল্ল > বাংলা খাল। অস্ট্রিক ভাষাবংশ থেকে আগত সংস্কৃত ঢক্ক > প্রাকৃত ঢক্ক > বাংলা ঢাকা। মোঙ্গল ভাষাবংশ থেকে আগত সংস্কৃত তুর্ক > প্রাকৃত তরুক্ক > বাংলা তুরুক।

(৪) **আগন্তুক শব্দ :** যে-সমস্ত শব্দ সংস্কৃতের নিজস্ব উৎস থেকে বা অন্য ভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষার পথ অবলম্বন না করে অন্য ভাষা থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হয়েছে, সেই শব্দগুলোকে আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ বলা যায়। এগুলি অন্য ভাষা থেকে সংস্কৃত-প্রাকৃত হয়ে বাংলায় আসেনি বলে এইগুলি হল কৃতঋণ শব্দ। কৃতঋণ তদ্ভব থেকে এগুলি পৃথক।

এই আগন্তুক শব্দের দুটি প্রকার—দেশি ও বিদেশি।

দেশি শব্দ—যে-সব শব্দ ভারতবর্ষেরই অন্য ভাষা থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হয়েছে, সেই শব্দগুলোকেই বলা হয় দেশি শব্দ। দেশি শব্দ দুই প্রকার—অনার্য ও আর্য।

বঙ্গদেশের প্রাচীনতম অধিবাসী কোল, ভিল প্রভৃতি অনার্য জাতির ভাষা থেকে জ্ঞাতমূল বা অজ্ঞাতমূল যে-সমস্ত শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হয়েছে, সেগুলিকে অনার্য দেশি শব্দ বলে। যেমন—অঢেল, কাঁচুমাচু, কুকুর, খোকা, ঘোড়া, চিংড়ি, ছানা, ঝাঁটা, ঝোল, টাল, ডগমগ, ডবকা, ডাব, ডিঙি, ঢেঁকি, ঢিল, দরমা, থোড়, নাদা, পেট, পাঁঠা, মুড়ি ইত্যাদি।

আর্য জাতি ব্যবহৃত যে-সমস্ত শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হয়েছে, সেই শব্দগুলিকে আর্য-দেশিয় শব্দ বলে। যেমন— হিন্দি ভাষা থেকে লগাতার, বাতাবরণ, সেলাম, দোস্ত, ওস্তাদ। ডঃ রামেশ্বর শ'-এর মতে, এই ধরনের শব্দের মধ্যে যেগুলি মূলত আরবি-ফারসি শব্দ, সেগুলো আরবি-ফারসি থেকে এদেশেরই ভাষা হিন্দির মাধ্যমে বাংলায় প্রবিষ্ট হয়েছে বলে সেগুলিকেও দেশি শব্দ রূপে গ্রহণ করা উচিত।

বিদেশি শব্দ : ভারতবর্ষের বাইরের দেশ থেকে অথবা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে যেসমস্ত শব্দ স্বরূপে বা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হয়েছে, সেই শব্দগুলিকে বিদেশি শব্দ বলে।

এই শব্দগুলির মধ্যে বহির্ভারতীয় ইংরেজী, আরবি, ফারসি, পোর্তুগীজ শব্দই সংখ্যায় বেশি। আর, অন্তর্ভারতীয় প্রতিবেশী শব্দাবলীর মধ্যে হিন্দির আধিক্য লক্ষণীয়।

ত্রয়োদশ শতকের প্রথমদিকে বঙ্গদেশ তুর্কী-কবলিত হওয়ার পর থেকেই ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হতে থাকে। আকবরের শাসনকালেই বাংলায় ফারসি শব্দের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে, এমনকি ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদেও ফারসি শব্দের অজস্র উদাহরণ আছে। ফারসির পাশাপাশি অসংখ্য আরবি

শব্দও বাংলায় প্রবিষ্ট হয়। ষোড়শ শতক থেকে ভারতে বাণিজ্যরত পোর্তুগীজ ফিরিঙ্গিদেরও বহু শব্দ বাংলায় প্রবেশ করে। আবার, দীর্ঘদিন ইংরেজ শাসনাধীন থাকার ফলে বহু ইংরেজি শব্দ স্বরূপে বা ঈষৎ বিকৃতরূপে বাংলার ভাষাভাণ্ডারে প্রবিষ্ট হয়ে এই ভাষাকে পরিপুষ্ট করে তুলেছে। বিদেশি শব্দের উদাহরণ—

আরবি : অছিলা, আকছার, আক্কেল, আদালত, আমানত, আসবাব, আলাদা, আসামী, আস্তাবল, আহাম্মক, ইজারা, ইজ্জত, ইনাম, ইমারত, ইশারা, এজলাস, ওকালতি, ওজন, ওজর, কবজা, কবুল, কলপ, কাজী, কানুন, কাবাব, কামিজ, কায়দা, কালিয়া, খালাসি, খেসারত, গোসল, গায়েব, ছবি, জবাই, জরিপ, জলসা, তছরুপ, তফাত, তামাশা, দায়রা, দেমাক, দোয়াত, দৌলত, ফতোয়া, ফকির, নেশা, ফৌজ, বায়না, বিলকুল, মকদ্দমা, মকুব, মুহুরী, মেরামত, রাজী, রায়, শখ, শরিফ, শর্ত, সফর, সাবেক, হক, হজম, হদিশ, হামলা, হামাম, হিসাব, হেপাজত ইত্যাদি।

ফারসি : আইন, উমেদ, ওস্তাদ, আওয়াজ, আঙুল, আপশোশ, আরাম, আয়না, ইরান, কম, কাগজ, কাবাব, কারখানা, কুস্তি, খানদান, খানসামা, খাম, গালচে, গঞ্জ, গোয়েন্দা, চরকা, চশমখোর, চাপরাশ, চেহারা, জমি, জানোয়ার, জামা, তছনছ, তরকারি, তরমুজ, দরকার, দরবার, দরখাস্ত, নমাজ, নমুনা, নাবালক, পনির, পয়গম্বর, পয়জার, নিমক, নাশপাতি, নালিশ, পালোয়ান, পেয়াদা, পেয়ালা, ফরিয়াদী, ফাঁস, বগল, বকশিস, বদমাস, বরফ, বরবাদ, মালিশ, মাহিনা, মিনার, রাস্তা, রাহাজানি, রিফু, লাশ, লাগাম, শামিয়ানা, শায়েস্তা, শাল, সরকার, সুপারিশ, হেস্তনেস্ত, হুঁশিয়ার ইত্যাদি।

আরবি-ফারসির মিশ্রণ : আদমশুমার, ওকালতনামা, কুচকাওয়াজ, কোহিনূর, জমাদার, জরিমানা, পোদ্দার, বকলম, বেআক্কেল, বেদখল, হকদার, পিলসুজ, বেকসুর, হুঁকাবরদার।

তুর্কী শব্দ : কলকা, কাঁচি, কামাত, কাবু, কুলি, কোর্মা, খাঁ, চকমকি, তকমা, তোপ, দারোগা, বকশী, বারুদ, বেগম, বোঁচকা, মুচলেকা।

ইংরেজি শব্দ : অক্সিজেন, অফিস, আরদালি (<orderly), আর্ট, আস্তাবল (<stable), এঞ্জিন, কনস্টেবল, কফি, কমা, কাপ্তেন (<captain), কার্নিস, কার্পেট, কেক, কেটলি, কেরোসিন, কোকেন, কোম্পানি, ক্লাব, ক্লাস, গারদ (<guard), গার্জেন (<guardian), গিনি, গ্লাস, চেক, চেন, জাঁদরেল (<general), জেল, টাইম, টেবিল, টেলিফোন, ডাক্তার (<doctor), ডিপো (<depot), তোরঙ্গ (<trunk), থিয়েটার, নম্বর, নোটিশ, পকেট, পার্লামেন্ট, পালিশ, পিয়ন, পুলিশ, ফিট, বাক্স (<box), বুরুশ (<brush), মেহগনি, মোটর, রিহার্সাল, লেবেল, সার্কাস, সিগন্যাল, সেমিকোলন, হাইকোর্ট, হোমিওপ্যাথি ইত্যাদি।

পোর্তুগীজ শব্দ : আতা, আনারস, নোনা (<এনোনা), আলকাতরা, আলমারি, কেদারা, গামলা, গির্জা, গুদাম, চাবি, জানালা, তোয়ালে, পিপা, পেয়ারা, পেরেক (<prego), বালতি, মাইরি (<Maria), মাস্তুল (<mastro), সাবান, সেঁকো ইত্যাদি।

জার্মান শব্দ : জার, কিন্ডারগার্টেন।

স্পেনীয় শব্দ : ডেঙ্গি (<dengue)।

ওলন্দাজী শব্দ : রুইতন, হরতন, ইস্কাবন

গ্রিক শব্দ : কেন্দ্র (<kentron), দাম (<drakhme)

রুশ শব্দ : ভদকা, বলশেভিক, স্পুটনিক

জাপানি শব্দ : জুজুৎসু, টাইফুন, রিকশা, হাসনুহানা।

সিংহলী শব্দ : বেরিবেরি

বর্মী শব্দ : লুঙ্গি

হিন্দি শব্দ : আলাল, ইস্তক, উতরাই, ওয়ালা, কচুরি, কাহিনি, কোরা, খাট্টা, চাপকান, চামেলি, চালু, চাহিদা, চিকনাই, ঝাড়ু, ঝাণ্ডা, টহল, ডেরা, অগড়া, তাঁবু, দাঙ্গা, ফালতু, বীমা, বেলচা।

গুজরাটী শব্দ : গরবা, তকলি, হরতাল।

মারাঠী শব্দ : চৌথ, বর্গী।

তামিল শব্দ : চুরুট

তেলেগু শব্দ : প্যান্ডেল।

(৫) নবগঠিত শব্দ : বাংলা শব্দভাণ্ডারে নবগঠিত শব্দের মধ্যে কিছু শব্দ অবিমিশ্র। যেমন— অনিকেত, অতিরেক ইত্যাদি। বাকি শব্দগুলি হল মিশ্র বা সংকর শব্দ।

মিশ্র বা সংকর শব্দ : এক শ্রেণীর শব্দের সঙ্গে অন্য শ্রেণীর উপসর্গ, প্রত্যয় ইত্যাদি যোগে অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দের পারস্পরিক সংযোগে যে-সব নতুন শব্দের সৃষ্টি হয়, সেগুলিকেই সংকর শব্দ বা hybrid words বলে। যেমন—

ক) **তৎসম শব্দ + বাংলা শব্দ :** পিতাঠাকুর, মাতাঠাকুরানী, নির্ভুল, নিশ্চুপ, কাজকর্ম, ভুলবশত, ফুলপুঞ্জ, মায়াকান্না, বজ্রআঁটুনি, শ্বেতপাথর।

খ) **তৎসম শব্দ + বিদেশি শব্দ :** হেডপণ্ডিত, বসন্তবাহার, লাটভবন, নৌবহর, ভোগদখল, আইনসম্মত, ভোটদাতা, পর্দাপ্রথা, রাজসরকার, আরামপ্রিয়, কাগজপত্র, যোগসাজশ, দিনগুজরান, পুনর্বহাল।

গ) **বিদেশি + বাংলা শব্দ :** হাটবাজার, মাস্টারমশায়, সাজসরঞ্জাম, গাড়িবারান্দা, মার্কামারা।

ঘ) **বিদেশি শব্দ + বিদেশি শব্দ :** উকিল-ব্যারিস্টার, জজসাহেব, খোদমালিক, কাগজ-পেনসিল, দরজা-জানালা, টাইমটেবিল, হেডমাস্টার।

ঙ) **তৎসম শব্দ + বাংলা প্রত্যয় :** একলা, দীপালী, লক্ষ্মীমন্ত, বারমেসে, দেশি, পুরুষালী, রোগা।

চ) **তৎসম শব্দ + বিদেশি প্রত্যয় :** দাতাগিরি, শিক্ষানবিস, প্রমাণসই, ধূপদানি, স্ফূর্তিবাজ।

ছ) **বাংলা শব্দ + তৎসম প্রত্যয় :** আমিত্ব, রানীত্ব, কাঁকরময়।

জ) **বাংলা শব্দ + বিদেশি প্রত্যয় :** ফুলদানি, ঘুষখোর, ঠিকাদার, বামুনগিরি, বাতিদান।

ঝ) **বিদেশি শব্দ + তৎসম প্রত্যয় :** নাবালকত্ব, খ্রিস্টিয়।

ঞ) **বিদেশি শব্দ + বাংলা প্রত্যয় :** শহুরে, শাগরেদি, গোলাপি, খেয়ালি, জরুরি, গোলন্দাজি, মাস্টারি।

ট) **বিদেশি শব্দ + বিদেশি প্রত্যয় :** ডাক্তারখানা, হররোজ, নকলনবিশি, সরাইখানা, সমঝদার, শামাদান, ডেপুটিগিরি।

৫. সারসংক্ষেপ

বাংলা শব্দভাণ্ডার মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত— মৌলিক, আগন্তুক এবং নবগঠিত। তৎসম, তদ্ভব এবং অর্ধ তৎসম শব্দসমূহকে নিয়ে গড়ে উঠেছে মৌলিক শব্দভাণ্ডার। আগন্তুক শব্দাবলী দু'ভাগে বিভক্ত— দেশি ও বিদেশি। অবিমিশ্র এবং মিশ্র— এই দুয়ের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে নবগঠিত বাংলা শব্দভাণ্ডার।

৬. অনুশীলনী

(ক) অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. তৎসম শব্দ কাকে বলে?

২. দু'টি তদ্ভব শব্দের উদাহরণ দিন।

৩. আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ কয় প্রকার ও কী কী?

৪. নিম্নলিখিত শব্দগুলির উৎস নির্দেশ করুন। ওঝা, মেরাপ, গাঁও, আর, ইঁদারা

৫. বাংলা শব্দভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রিক শব্দের উদাহরণ দিন।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন :

১. টীকা লিখুন : আগন্তুক শব্দ, দেশি শব্দ, কৃতঋণ তদ্ভব

২. উদাহরণসহ মিশ্র শব্দ কাকে বলে বুঝিয়ে দিন।

৩. তদ্ভব শব্দ কাকে বলে? এটি কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।

৪. সর্ব বঙ্গীয় আদর্শ চলিত ভাষা কোন অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়? বাংলা গদ্যপরিবর্তনের ধারাটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৫. উনিশ শতকের চলিত গদ্যের ব্যবহারের ধারাটি আলোচনা করুন

(গ) রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১. বৃক্ষচিত্রসহ বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

২. বাংলা সংকর শব্দের বৈচিত্র্যের পরিচয় দিন।

৩. বাংলা তদ্ভব শব্দের বৈচিত্র্য বিষয়ে দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করুন।

৪. বাংলা শব্দভাণ্ডারের গৃহীত বিদেশি শব্দের উৎসগত বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৭. স্নাতক বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা : নয়া উদ্যোগ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭।

২. ডঃ রামেশ্বর শ', 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', তৃতীয় সংস্করণ : ৮ অগ্রহায়ণ, ১৪০৩, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ: ৮ ফাল্গুন, ১৩৯৪।

৩. পরেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলা ভাষা পরিক্রমা', প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৯, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৭৭।

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলা ভাষা পরিক্রমা', দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৯, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৮০।

৫. পরেশচন্দ্র মজুমদার, 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ', সপ্তম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৭, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৭১।

৬. সুকুমার সেন, 'ভাষার ইতিবৃত্ত', প্রথম আনন্দ সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, চতুর্থ মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৩৩৯।

নোটস্

নোটস্

নোটস্

নোটস্

নোটস্